তৃতীয় অধ্যায়

এক

সাহিত্যক্ষেত্রে সুবোধ ঘোষের বিভিন্নমুখী প্রতিভা সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। সাহিত্যের প্রধান দুটি ধারা, গল্প এবং উপন্যাসই ছিল তাঁর প্রধান বিচরণক্ষেত্র। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে তাঁর সাহিত্য সাধনায় সুবোধ ঘোষ জীবনকে দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রসঙ্গক্রমে আমরা লক্ষ্য করব যে তাঁর এই জীবনদর্শন সমসাময়িক সাহিত্যিকদের তুলনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল স্বতন্ত্র।

গল্পকার সুবোধ ঘোষের অন্তরক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল তাঁরই অজান্তে তাঁর পূর্বসূরীদের দ্বারা। যা কিছু পুরোনো তাকে ত্যাগ করার উন্মাসিকতা না দেখিয়ে পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য এবং গ্রহণযোগ্য গুণাবলীকে আত্মস্থ করেছিলেন তিনি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর আধুনিক এবং সমাজ বিজ্ঞানী সুলভ দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপটে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর এবং বিভূতিভূষণ। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তিনি পেয়েছেন ভারতীয় সাহিত্যের ক্লাসিক রূপ। 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ' শীর্ষক প্রবন্ধে সুবোধ ঘোষ লিখেছেন—

> ...দেখতে পাই ভারতীয় সাধক হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে ডুবে কিসের যেন সন্ধান করেন। ভারতের গ্রাম্য বাউল দেশবিদেশে 'তার উদ্দিশে' ঘুরে বেড়ান, যে তাঁর 'মনের মানুষ'। ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর। যুগে যুগে অভিসার পাগলিনী রাধিকার ক্ষান্তিহীন সন্ধানই ভারতীয় সাহিত্যকে প্রকৃত ক্লাসিক রূপদান করেছে এবং তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রবীন্দ্রসাহিত্য। ব্রহ্মা ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার রচিত মহাভারতে আপনি কি তত্ত্ব প্রতিপাদিত করেছেন ? — ব্যাসদেবের উত্তর হলো, — যত্তু সর্বগতং বস্তু : তচ্চৈব প্রতিপাদিতম্। সমস্ত ঘটনা ও কাহিনীর ভিতর দিয়ে আমি সেই বস্তুকেই প্রতিপাদিত করেছি যে বস্তু সর্ববস্তুর মধ্যে রয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যকেও বলতে পারি ভারতের দ্বিতীয় মহাভারত। রবীন্দ্র সাহিত্যের অজস্র বৈচিত্র্যের অন্তরালে একটি মহাসঙ্গীতেরই সুর রয়েছে, অনন্তের সন্ধানী মানুষের বিশ্বৈকবোধের সুর।
>
> প্রাচীন হিন্দী কবি নিশ্চল দাস বহুতত্ত্বের আলোচনা করে শেষে নিজেকেই প্রশ্ন করেছিলেন – কাকু করু প্রণাম ? – কাকে প্রণাম করি ? শেষ পর্যন্ত তিনি প্রণাম করলেন সেই – ভারত তত্ত্বকে যে তত্ত্বে এমন বাণীও সহজে ধ্বনিত হয়েছিল — 'বিশ্ব ভরণ-পোষণ কর জোই, তাকর নাম ভারত অস হোই।' বিশ্বকে যে ভরণপোষণ করে তারই নাম ভারত।"[১]

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সুবোধবাবু চিরন্তন ভারতাত্মাকে দেখেছেন তেমনি তার প্রকৃতিকে বলেছেন ক্ষান্তিহীন সন্ধান। শরৎচন্দ্রের মধ্যে তিনি খুঁজেছেন এক প্রথাভাঙা বৈপ্লবিক মন।

> শরৎচন্দ্র মন সংস্কারক না বৈপ্লবিক ? শিল্পী হিসাবে তিনি বৈপ্লবিক ছিলেন। কতগুলি সমাজ ব্যবস্থার তিনি প্রতিবাদ করেছেন, শুধু এই জন্যই তিনি বৈপ্লবিক নন। সমাজ ব্যবস্থার রদ-বদল অনেকেই কামনা করেন, সেই কারণে তাঁরা সকলেই বৈপ্লবিক মনের মানুষ নন।
>
> শুধু সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন নয়, সামাজিক সদ্বস্তু (Values) বলতে আমরা যা বুঝি সেই সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মন কিভাবে সাড়া দিয়েছিল, আসল বিচার্য্য তাই। বর্তমান সামাজিক নীতিতে আমরা প্রেম, নিষ্ঠা মহত্ব ইত্যাদি বলতে যা

বুঝি শরৎচন্দ্র তা মানতেন কিনা ? এইসব সদ্বস্তুর একটা চিরকেলে রূপ তিনি মানতেন কি না ? যদি না মেনে থাকেন, তবেই তিনি বৈপ্লবিক।

স্বীকার করতেই হয়, তিনি তাঁর চিন্তায় ও হৃদয়ে এই বড় বিপ্লবী শক্তি লাভ করেছিলেন। নরনারীর প্রেমের এত বিভিন্ন ও বিচিত্র রূপ তিনি প্রকাশ করেছেন, যার মধ্যে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, নিঃসন্দেহ হয়ে কেউ জোর গলায় বলতে পারে না। অভয়া দিদির সিঁথির সিঁদুরের দিকে আমাদের দৃষ্টি টেনে নিয়ে গেলেন, এক মুহূর্তে দেখিয়ে দিলেন প্রেম ও প্রণয়ের এক নতুন সংজ্ঞা। যে ভূমিকার ওপর আমাদের সকলের প্রত্যয় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তিনি মাঝে মাঝে সেই স্থিরতাকে রূঢ়ভাবে চম্‌কে দিয়েছেন। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, এই স্থিরতার কোন মূল্য নেই। 'এরা যে অস্থির, তাই এরা সত্য সবই' – সমাজ ও সামাজিকতা বন্ধনের মধ্যে সার্থক নয়, প্রেম প্রণয় শোক ও কামনা, আশা আকাঙ্ক্ষা, সেবা ও নিষ্ঠার কোন একটা কথা দিয়ে বাঁধা রূপ নেই। এরা পরিবর্তনের ধর্মে দীক্ষিত। সেই পরিবর্তনকে মেনে নেওয়াই সুস্থ জীবনের নিয়ম।

শিল্পী শরৎচন্দ্রের রচনায় আমরা বার বার এই সত্যের সাক্ষাৎ পাই।"[২]

এই ভাবে রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি পেয়েছেন অবিরাম সন্ধানের প্রেরণা আর শরৎচন্দ্রকে আবিষ্কার করেছেন তাঁর পরিবর্তনধর্মী মানসিকতায়। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কাছে যে শিক্ষা তিনি লাভ করলেন তার সঙ্গে তাঁর নিজের সাহিত্যধর্মেরও পরিচয়টি যোগ করা যায়। তাতে তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে মনোভাব বোঝা যাবে। সাহিত্যের হিত নামে সুবোধ ঘোষের একটি প্রবন্ধের অংশবিশেষ উল্লেখ করা হল —

...সাহিত্য যথার্থ সাহিত্য হয় তার সৌন্দর্য, রম্যতা ও রসশীলতার গুণে। রাষ্ট্র, সরকার ও কোন আকাদমি চেষ্টা করে আর যা কিছুই করুন কিন্তু তাঁরা সাহিত্যিকের মননকর্মের ও কলাগত সৃষ্টির জন্য রম্যতা সৌন্দর্য এবং কোন প্রকার রস ও আবেদনের সম্পদকে তৈরী করে পরিবেষণ করতে পারেন না। সাহিত্যের আয়াস ও প্রয়াসের প্রধান পাথেয় হল সাহিত্যিকের অনুভবের ধর্ম। এই সম্পদটি কোন যন্ত্রে, পরিকল্পনায়, আইনে ও সংঘবদ্ধতায় তৈরী করা সম্ভব নয় এবং কোন মনীষী অথবা প্রতিষ্ঠান চেষ্টা করে এই সম্পদ শিল্পীর হাতে তুলে দিতে পারেন না।

...জাতির জীবনের ব্যাপ্তি সাহিত্যেরও প্রাণের ব্যাপ্তি আহ্বান করে, এই সত্য বহু জাতির ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায়। বৃহৎ আকাঙ্ক্ষা এবং বিপুলতার অনুভব যেখানে সত্য হয়ে ওঠে, সেখানে সাহিত্যেরও রূপের বৈচিত্র্য এবং প্রসার সত্য হয়ে ওঠে। শিল্প বিপ্লবের পর ইউরোপীয় জাতিসমূহের অনেকেরই জীবনের নূতন ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও এক নবোন্মেষের সত্যতা লক্ষ করা যায়। জাতিগত কর্মের বিস্তার ও জাতীয় প্রয়াসের কোন নূতন ব্যাপ্তির আসন্নতা লক্ষণ ও প্রকৃতি যদি জাতির শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা চিনতে ও বুঝতে না পারেন, তবে তাঁদের রচিত সাহিত্য জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তির তুলনায় পিছনের জিনিস হয়ে থাকবে। আবার এ কথাও সত্য যে জাতীয় জীবনের নূতন ব্যাপ্তি ও পরিবর্তনের লক্ষণগুলিকে উপলব্ধি করতে পারলে লিল্পী ও সাহিত্যিকদের মনীষা নূতনকে গ্রহণের ও রূপদানের যোগ্যতায় সম্পন্ন হয়ে ওঠে। জাতীয় জীবনের নূতন আত্মপ্রকাশের সংকেতগুলিকে চিনতে পারাই এক নূতন মানসিক আগ্রহের পরিবেশ রচনা করে, যার ফলে সৃষ্টি হয় নূতন

সাহিত্য। এই মানসিক আগ্রহকে নিয়তির উপহার বলে মনে করে বসে থাকার কোন যুক্তি নেই। চেষ্টার দ্বারা মানসিক আগ্রহের সৃষ্টি সম্ভব। জাতির জীবনের নূতন ব্যাপ্তির ও আত্মপ্রকাশের সঙ্কেতগুলির সাথে অনুভবের ও চিন্তার সম্বন্ধ স্থাপনই সাহিত্যের নূতন হিত সাধনার পথ মুক্ত করে দেয়।[৩]

সুবোধ ঘোষ বিশ্বাস করতেন — নিজ ভাষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য অন্যান্য দেশের সাহিত্য চর্চার সঙ্গেও অবহিত হওয়া যথেষ্ট লাভজনক। এ জন্য গবেষণারও প্রয়োজন রয়েছে। লেখক বলেছেন—

ভিন্ন দেশের বা ভিন্ন ভাষার জনসমাজের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করাই নিজ ভাষার সাহিত্যে নূতনত্ব উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্যসৃষ্টির অনুকূল যোগ্যতা অর্জনের একমাত্র পন্থা নয়, শ্রেষ্ঠ পন্থাও নয়। ভিন্ন দেশের ও সমাজের জনজীবনের রূপ এবং তার মর্মলোকের হর্ষ ও অশ্রুর বিচিত্র ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করাই ভাবনাকে সৃষ্টিশীল আগ্রহে দীক্ষিত করার সর্বোত্তম পন্থা। হ্যাঁ, ভিন্ন দেশের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় স্থাপনে বিশেষ যে একটি লাভ হয়, সেই লাভের মূল্যও অবশ্য অস্বীকার করা যাবে না, বরং সেই লাভ পূর্ণতররূপে সিদ্ধ করার জন্য গবেষণার মতই আত্যন্তিক প্রয়াসের প্রয়োজন আছে। সেই লাভ হলো, নূতন রীতি ও ভঙ্গীর সম্পদ। কবি মাইকেল মধুসূদন যদি গ্রীক লাটিন ও ইংরাজীর ক্লাসিক কাব্যের রূপ লক্ষ্য করবার সুযোগ না পেতেন, তবে নিশ্চয়ই বাংলা সাহিত্যকে তিনি 'মেঘনাদ বধ' কাব্য উপহার দিতে পারতেন না। দিলেও সে কাব্যের ছন্দ ও ভাষার গঠণ এবং রূপও ভিন্নতর হতো। পশ্চিমের ক্লাসিক কাব্যরূপের প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্টটুকু আহরণ করে তিনি বাংলার কাব্যকে এক নূতন প্রকাশরীতির সৌষ্ঠব দান করেছেন।[৪]

বাংলা ভাষার সাহিত্যের যথার্থ উন্নয়নে সাহিত্য একাডেমি এক বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। সুবোধ ঘোষ সাহিত্যের উন্নয়নের স্বার্থে একাডেমির প্রাথমিক কর্তব্য সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করেছেন।

অন্যদেশের সাহিত্যের ও ভাষার সঙ্গে পরিচিত হলে নূতন রীতির, টেকনিকের, ছন্দ:সজ্জার ও বিন্যাসভঙ্গীর ঐশ্বর্য নিজের অধিগত করা যায়, এই বাস্তব সত্য স্মরণে রাখলে আমাদের দেশের সাহিত্য আকাদমি সহজেই বুঝতে পারবেন যে, শিল্পী ও সাহিত্যিককে কি ধরণের অধ্যাবসায়ে উৎসাহিত ও সাহায্য করলে সাহিত্যের হিত হতে পারে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের সাহিত্যগত রেনেসাঁশ তথা নবোন্মেষের ঐতিহাসিক কারণগুলি লক্ষ্য করলে সাহিত্যের উন্নয়নী প্রচেষ্টার প্রধান সূত্রগুলিরও সন্ধান পাওয়া যাবে। দেখা যাবে যে, সাহিত্যের উন্নয়নও কতগুলি নিয়মে নিষ্পন্ন হয়েছে। জাতির জীবনের নূতন ব্যাপ্তি, ভিন্ন দেশের জনজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ও অভিজ্ঞতা, এবং ভিন্ন দেশের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় – নানা রাজনীতিক ও অর্থনীতিক কারণে হলেও এই ধরণের ঘটনা যখনই কোন জাতির জীবনে সত্য হয়েছে, তখনই সেই জাতির সাহিত্যই নবোন্মেষ লাভ করেছে। ইতিহাসই সাহিত্যে নবোন্মেষ সৃষ্টির হেতুরহস্য স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছে। যত্নকৃত চেষ্টার দ্বারা সাহিত্যগত উন্নয়নের সেই প্রত্যক্ষ হেতুগুলিকে সঞ্চারিত করাই আকাদমির প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।[৫]

সুবোধ ঘোষের প্রথম গল্প ১৯৪০সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৪০থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত তাঁর লেখা ছোটগল্পের সংখ্যা ১৫৭টি। ফসিল — এর পর পরশুরামের কুঠার-ও ১৯৪০ সালেই প্রকাশিত হয়। অবশ্য এই গল্পমালায় 'ভারতপ্রেমকথা'র কুড়িটি গল্প এবং পশু-প্রেম-প্রকৃতি বিষয়ক দশটি গল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই কথাশিল্পীর উপন্যাস রয়েছে তেত্রিশটি। শুধু সংখ্যায় নয় বৈচিত্র্যেও সুবোধ ঘোষের ছোটগল্প তাঁর উপন্যাসের চেয়ে অনেক এগিয়ে।

ছোটগল্প ও উপন্যাসের মূলগত পার্থক্য আজ পাঠকের কাছে অবিদিত নয়। ছোটগল্পের দায়-দায়িত্ব, আকৃতি-প্রকৃতি উপন্যাসের থেকে সম্পূর্ণই আলাদা। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে —

> জীবনের এমন একটি খন্ডাংশ বাছিয়া লইতে হইবে, যাহা ইহার স্বল্প পরিসরের মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করিবে। ইহার আরম্ভ ও উপসংহার উভয়ের মধ্যেই বিশেষরকম নাটকোচিত গুণের সন্নিবেশ থাকা চাই। উপন্যাসের মত ধীর মন্থর গতিতে ইহার আরম্ভ হইবার অবসর নাই। পাত্র-পাত্রীর দীর্ঘ পরিচয় ও বিশ্লেষণের জন্য ইহাতে স্থানাভাব। গল্পের পরিণতি ও চরিত্রবিকাশের জন্য যে স্বল্পসংখ্যক ঘটনা ইহার পক্ষে প্রয়োজনীয় সেগুলিকে সুনির্বাচিত হইতে হইবে। কোনরূপ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা ইহার পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ। গল্পের যে অংশে ইহার যবনিকাপাত হইবে, তাহার মধ্যে একটি স্বাভাবিক পরিণতি বা পরিসমাপ্তির লক্ষণ থাকা চাই। পাঠকের মন যেন তাহাকে সমস্যা সমাধানের একটি ছেদচিহ্ন বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত হয়।[৬]

ছোটগল্প এবং উপন্যাসের মাঝে, বড়গল্প কথাসাহিত্যের অন্য একটি ধারা যা আধুনিক কালের সাহিত্যিকদের হাতে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করছে। প্রকৃতপক্ষে বড়গল্পের অবস্থান ছোটগল্প এবং উপন্যাসের সমদূরত্বে নয়, বরং ছোটগল্পের কিছুটা কাছাকাছি। বড়গল্পে সাধারণত ছোটগল্পের ধরণ অবিকৃত রেখে তার কোনো কোনো উপকরণে কিছুটা ব্যাপ্তি বা বিস্তার আনা হয়।

সুবোধ ঘোষের উপন্যাসগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁর বেশ কয়টি উপন্যাসকে বড়গল্প আখ্যা দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তাঁর এ ধরনের বড়গল্পের প্রকৃষ্ট উদাহরণ, 'জিয়াভরলি' এবং 'বাসরদত্তা'। প্রকাশকালে এই বড়গল্পগুলোকে উপন্যাস বলে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল, হয়ত উপন্যাসপ্রিয় বাঙালী পাঠককে আকৃষ্ট করার জন্যই।

উপরোক্ত কথাগুলি থেকে সুবোধবাবু সাহিত্যধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারা যায়। প্রথমত তিনি এক জীবনসত্যের অনুসন্ধানী। রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি ক্ষান্তিহীন সন্ধানের দীক্ষা পেয়েছেন। আর শরৎচন্দ্রের কাছে তিনি স্থির জীবনসত্যের পরীক্ষণ এবং নবতর মূল্যচেতনার সন্ধানের দীক্ষা পেয়েছিলেন। পরিবর্তনকে মেনে নেওয়ার যে সহজ জীবনধর্ম তাই ছিল শরৎচন্দ্রের সাহিত্যধর্ম। শিল্পী সুবোধ শরৎচন্দ্রের লেখায় এই সত্যের রূপকেই দেখেছিলেন। এই দুই মহৎ লেখকের কাছে সুবোধ যা পেয়েছিলেন তাকে তিনি নিজের শিল্পীধর্মে আত্মস্যাৎ করে নতুন করে তুলেছেন। কেবল সন্ধান নয়, মূল্যচেতনার ক্রমবিবর্তনই নয়, জীবনের নব নব রূপ বৈচিত্র্যের সন্ধানই ছিল তাঁর শিল্পীমনের ধর্ম। এ জন্য তিনি জাতির জীবনের ব্যাপ্তির মধ্যে সাহিত্যের ব্যাপকতর জীবনবোধের রহস্য সন্ধান করেছেন। এ কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে সাহিত্যকার এক বিশেষ জাতীয় জীবনের পটে দাঁড়িয়ে সাহিত্যের সৃষ্টিগুলিকে বিকশিত করে তোলেন। সুতরাং সেই পটকে লেখককে জানতে হবে এবং তাঁর চিত্তধর্মকে অনুধাবন করতে হবে। কোনো জাতির জীবনের প্রবণতাগুলি সবসময় খুব স্পষ্টভাবে ধরা দেয় না। কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য সহজভাবে অনুধাবনযোগ্য হলেও তার অনেক প্রবণতা বেশ বুদ্ধির সাহায্যে কিংবা সৃজনশীল শিল্পীর

সহজ দৃষ্টির দ্বারা বুঝতে হয়। সুবোধবাবু সেই কথা লিখেছেন। জাতীয় জীবনের নতুন আত্মপ্রকাশের সংকেতগুলিকে চিনতে পারার দ্বারা নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এই প্রবণতাকে চেষ্টার দ্বারা বুঝতে হয়, মানবিক আগ্রহের দ্বারা জানতে হয়।

বিদেশী সাহিত্য সেই সৃষ্টির অভিজ্ঞতাকে হয়তো ব্যাপ্ত করে, হয়তো নূতন রীতি যোজনার রহস্য শেখায়। কিন্তু লেখক অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন অনুভব ও চিন্তার দ্বারা জাতীয় জীবনের ব্যাপ্তির ও আত্মপ্রকাশের সঙ্কেতগুলিকে বুঝতে হবে। জাতির জীবনের ইতিহাসের এই গতি ও প্রবণতা বুঝতে পারাটাই নতুন সাহিত্য সৃষ্টির মূল প্রেরণা। সুবোধবাবুর আগেই বাংলাদেশে বিদেশি সাহিত্য থেকে ভাব-ভঙ্গি ধার করে গল্প উপন্যাস লেখার প্রবণতা চলে আসছিল। এক হিসেবে তারা মধুসূদনের লেখায় যেমন বাঙালীর প্রথাবদ্ধ জীবনেই জড়তা ভেঙেছে তেমনি কল্লোলের লেখকদের লেখায় তাকে অন্তত দুটো দিক থেকে ঠিকা সাহিত্যের প্রবণতার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। তার একটা হল দরিদ্র মানুষের গল্প বলায় আগ্রহ, অন্যটা হল মানুষের অন্তরধর্ম বিশ্লেষণ করে তার জৈবসত্তার রূপ উদঘাটন। বস্তুত সুবোধবাবু যদিও এই দুই দিকেই আগ্রহী তবু বলা যায় তিনি বিদেশি গল্পের অনুকরণ করে বা নকল করে সাহিত্য ব্যাপ্তির প্রয়াস করেন নি। বরং তিনি জাতির জীবনের মূল প্রবণতা অনুসন্ধানের উপরেই জোর দেন। আর তাতেই ধরা পড়ে লেখকের দৃষ্টির সতেজতা, চিন্তার স্বচ্ছতা এবং মননবৈচিত্র্য। আর এর সঙ্গে যুক্ত করা যায় তাঁর সৌন্দর্য, রম্যতা ও রসশীলতার ধর্মটিকে। এইগুলি মনে রাখলে সুবোধবাবুর গল্প সাহিত্য বোঝার পক্ষে সুবিধে হবে বলে মনে করি।

দুই

বাংলা গল্প সাহিত্যের প্রথম উৎস রবীন্দ্রনাথ। যদিও তথ্যের বিচারে কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। তবু তাঁরই হাতে বাংলা গল্পের প্রথম প্রতিষ্ঠা। গল্পের বিষয় বিস্তার আর রূপ ও রীতির বৈচিত্র্য তাঁরই লেখায় প্রথম বিশিষ্ট চরিত্রে ফুটে উঠে। বাংলা গল্পের প্রথম সংজ্ঞাও তাঁর দেওয়া। আবার শেষ পর্বেও একটি সংজ্ঞা তিনি দিয়েছিলেন। ছোট প্রাণ ছোট কথাকে তিনি সার্থক ছোটগল্পের বিষয় হিসাবে নির্বাচন করে জটিল ও বিস্তৃত জীবন সমস্যাকে বাংলা উপন্যাসের জন্য তুলে রেখেছিলেন। আবার ছোটগল্পের শেষহীন ব্যঞ্জনাকেই তার রসপরিণাম বলে তিনি নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। এই ভাবে মানবজীবনের ছোট ছোট দুঃখ ব্যথা নিয়ে তাঁর ছোটগল্পের বিরাট জগৎ গড়ে উঠেছিল। তাঁর এই গল্প জগতের মূল বিষয় হল মানুষ ও মানবধর্ম। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলিকে প্রধানত তিনটি ভাগে শ্রেণী বিভক্ত করা হয়ে থাকে। আদি পর্ব – যখন তার গল্পের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে মাত্র মুকুল বিকাশ হয় নি। সেই ভিখারিণী ঘাটের কথা, রাজপথের কথা আর মুকুট নিয়ে এই আদি পর্ব বা প্রথম পর্ব। তারপর হিতবাদী সাধনা ভারতীর যুগ। একে প্রধানত বলা যায় শিলাইদহ পর্ব। যদিও এই পর্বে কিছু কিছু নাগরিক জীবনের কথা তাঁর গল্পে এসেছে তবু মোটের উপর পল্লী ও তার মানুষ এবং প্রকৃতি এই পর্বের গল্পের বিষয়। এরপর আসে সবুজপত্রের যুগ এবং এই সবুজপত্রের যুগে তাঁর গল্প প্রথম দুই পর্বের গল্পের তুলনায় বিষয়বস্তু এবং রচনারীতিতে অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে পড়ে। আর এরই শেষ সম্প্রসারিত রূপ তিনসঙ্গী।[১]

রবীন্দ্রনাথের গল্পের প্রথম পর্ব নিতান্তই তাঁর প্রস্তুতি পর্ব। তখনো গল্পের রূপরীতি সম্পূর্ণ তাঁর করায়ত্ত হয়নি। এরপর হিতবাদী থেকেই তাঁর গল্পের যথার্থ আরম্ভ বলা যায়। এই হিতবাদী সাধনা থেকে ভারতীর একটা যুগ পর্যন্ত এই পদ্মাপারেই তাঁর কেটেছিল। আর পদ্মাপারের জীবন থেকেই তিনি প্রথম প্রকৃত ছোটগল্পের সন্ধান পেয়েছিলেন। এই পদ্মাপারের পর্ব সম্বন্ধে ভূদেব চৌধুরী লিখেছেন— 'এই জীবনবোধের নবীনতা এবং গভীরতা থেকেই তিনি রসোত্তীর্ণ গল্প রচনা করতে পেরেছিলেন।'[২] এই সব গল্পে সমসাময়িক জীবনের সমস্যা ছিল কিন্তু সেই সমস্যা সংকুল জীবন পাথারে ভেসে বেড়াবার আগ্রহ তখনো কবির ছিল না। তখনকার গল্পে সৌন্দর্যবোধ এবং এক প্রশান্ত জীবনচেতনা ছড়িয়ে পড়েছিল রৌদ্রকরোজ্জ্বল জীবন প্রভাতের মতো। একথা অবশ্য ঠিক নয় যে তিনি জীবনসমস্যাকে তখনকার গল্পে রূপায়িত করেন নি। তাঁর 'দেনাপাওনা' থেকেই বাংলাদেশের জীবনসমস্যা উঠে আসছে। 'শাস্তি' কিংবা 'খাতা' কিংবা 'মেঘ ও রৌদ্র' – এসব গল্পে জীবনের সমস্যা আছেই। কিন্তু সে সব সমস্যাকে তিনি গুরুতর করে ভাবেননি। সমস্ত ক্ষেত্রে সমস্যাগুলির উপর শেষ পর্যন্ত একটা সৌন্দর্য গানের কলির মতো একটি সুর সংস্পর্শ দিয়ে তিনি সেগুলির এক ভাবমূলক সমাধানের দিকে গেছেন। এমনকি শাস্তির মতো গল্পেও এই রকম এক বাক্য উপসংহার গল্পের সেই অতিনিবিড় জীবন সমস্যাকে একটি অভিমানের বিন্দুতে এনে শেষ করে দেয়। সেখানে জীবন সমস্যাকে তিনি অতিশয় তীব্র করে তোলেননি। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন এই পর্বেও রবীন্দ্রনাথ শুধু জীবনের সারল্য ও সৌন্দর্য দেখেননি, জটিলতা ও রক্তাক্ত স্ববিরোধিতাও দেখেছেন। তার দৃষ্টান্ত ত্যাগ, 'শাস্তি' 'উলুখড়ের বিপদ' 'মেঘ ও রৌদ্র'। কিন্তু সেকথা স্বীকার করেও বলা যায় এ যুগের গল্প প্রধানত আমাদের সৌন্দর্যানুভূতি ও মানবধর্মের অনুভব ক্ষমতার কাছেই আবেদন করে। এমন যে জয়কালী যার দেবতা সেবার অকুন্ঠ নিষ্ঠা ও আচার ভীতিজনক সেও যখন ঐ শূকর শাবকটিকে শিকারীদের উচ্চকন্ঠ সন্ধান থেকে মুক্ত করে তখন মনে হয় কোনো এক আশ্চর্য যাদুবলে সেই নিষ্ঠাবতী রমণী এই জীবন ধর্মের তাৎপর্য অনুভব করতে পেরেছে। জয়কালী গল্পের উপসংহার কবির সেই শিল্পিত সমাপ্তি যা মানব ধর্মের উপযুক্ত একটি দৃষ্টান্ত রচনা করে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত তুচ্ছতার উপরে একটি হৃদয় ধর্মের মায়াঞ্জন লেপন করে দেয়। 'অনধিকার প্রবেশ গল্পটিতে অবশ্য সমাজ সমস্যা ও রাজনৈতিক সমস্যার ছায়া পড়েছে।'[৩] কিন্তু এই পর্বের 'সমাপ্তি'

'সুভা' 'ছুটি' 'পোষ্টমাস্টার' 'ক্ষুধিতপাষাণ' 'অতিথি' সে সব জায়গায় কিন্তু এই ধরণের জীবনসমস্যা উঠে আসতে পারে নি। প্রমথবাবু 'অনধিকার প্রবেশ' 'প্রায়শ্চিত্ত' 'বিচারক' ইত্যাদি গল্পে সামাজিক সমস্যার ছায়াপাত হতে দেখেছেন। কিন্তু এই সমস্যা এখনো সমাজ সমালোচনার পর্যায়ে উন্নীত হয় নি। প্রমথবাবু লিখেছেন— 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প অপূর্ণ অভিজ্ঞতার আভাস।'[৪] একথা স্বীকার্য। তাঁর এই শিলাইদহ পর্বের গল্পে যে সহজ জীবনপ্রীতি তা এই সময়কার কবিতাগুলির মতো গল্পেরও ধর্ম। অনধিকার প্রবেশ থেকে তাঁর গল্প কিছুটা সমস্যামূলক হয়ে এক নব মানবধর্মকে উন্মোচিত করে দিয়েছে। তখনকার বাঙালীর কাছে সেই অতিনিবিড় ও উদার জীবনাসক্তির মন্ত্র তুলে ধরে সে তার মনোজগতের সীমানা বিস্তারের দাবী করেছে। এই উদার আহ্বান ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু ক্রমে এই সৌন্দর্য ধর্মের উপরে সমাজ সমস্যার ও মানুষের জীবন সমস্যার ফল ধরতে শুরু করেছে। 'দেনাপাওনা' বা 'খাতা' গল্প থেকে আমরা ক্রমে এসে পড়েছি 'নষ্টনীড়' এর জগতে। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গল্পে নারীর জীবন সমস্যা তুলে ধরার কথা আছে। 'দেনাপাওনা' গল্পে নিরুপমা আত্মহত্যা করেছিল। 'খাতা' গল্পের উমা তার ধর্মনিষ্ঠ স্বামীর কাছে জীবনের সব স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। আবার এই সূত্রে পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নিজের মুক্তির পথে পা বাড়িয়েছিল 'স্ত্রীর পত্র'র মৃণাল। এইভাবে জীবনে এবং কাহিনীতে তিনি প্রগতি চেতনার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ভূদেব চৌধুরী লিখেছেন — 'ছোটগল্পের শিল্পী হতে হয় একইসঙ্গে গীতিপ্রান ও বস্তু সচেতন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের গল্পে বস্তুভার কম গীতিধর্ম বেশি। পরের পর্বের গল্পে গীতিপ্রবণতার জায়গা জুড়েছে বস্তুধর্ম। রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখেছেন My later storis have not got that freshness thought they have greater Psychological value and they deal with problems'[৫]

প্রথম পর্বের গল্পের কথা বলে তিনি একই প্রসঙ্গে লিখেছেন 'My earlier stories have a greater literary value because of their spontaneity'[৬] পদ্মাপার থেকে চলে আসার কাল থেকেই ভূদেববাবু রবীন্দ্রগল্পের দ্বিতীয় পর্ব গণনা করেছেন। নষ্টনীড়-কে তিনি এই সীমায় রেখেছেন। সবুজ পত্রপর্বে তাঁর গল্প রচনা অনেক বদলে গেছে। বিশেষ করে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত মূল্যচেতনা সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। এই প্রশ্নগুলি আমাদের মনকে আঘাত করে নবীন চেতনার সঞ্চার করে দিচ্ছে। প্রমথনাথ বিশী এই পর্বের গল্পের ধর্ম বলতে গিয়ে বলাকা আর পলাতকার দুই ধর্ম – 'যৌবনের আহ্বান আর নারীর মর্যাদার কথা বলেছেন। এই দুই মূল্য এই পর্বের গল্পের ধর্ম'।'[৭] এ কথা এই পর্বের 'স্ত্রীর পত্র' 'বোষ্টমী' 'হৈমন্তী' 'পয়লা নম্বর' ইত্যাদি গল্প সম্বন্ধে বলা যায়। সবুজপত্র যুগের গল্পকে প্রমথবাবু বলেছেন 'অন্যকেন্দ্রী আর পূর্বযুগের গল্পগুলিকে বলেছেন আত্মকেন্দ্রী।'[৮] অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এই পর্বের গল্পের মধ্যে দেখেছেন 'বংশ বনাম ব্যক্তির দ্বন্দ্ব', (কথাটা প্রমথবাবুর) রাজনীতি, সমাজ প্রথা ইত্যাদির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত। সবুজপত্র যুগের গল্পের বিষয়ভাবনা আগেও তাঁর গল্পে ছিল। কিন্তু 'এসব গল্পে পুরাতন জীবনের পাতায় নূতন ভাবনার ছবি এঁকেছেন কবি।'[৯]

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি বিষয় বৈচিত্র্যে অনন্য। সাধারণ জীবনের গল্প থেকে মানব জীবনের জটিল মনস্তত্ত্ব পর্যন্ত এর অঙ্গীভূত। নিরুপমার গল্প, সুভার মতো একটি বোকা মেয়ের কথা সমাপ্তির মৃণ্ময়ীর মতো একটি কিশোরীর ক্রমোদ্ভিন্ন যৌবন বিকাশ মেঘরৌদ্রের রাজনীতি এবং তদতিরিক্তি একটি নিবিড় প্রেমমনস্তত্ত্ব, শাস্তির দুখীরাম ছিদামের ও চন্দরার গল্প, বিচারকের পতিতা জীবন, ক্ষুধিতপাষাণের অলৌকিকতা, কঙ্কাল বা মণিহারার মতো গল্প আবার ব্যবধান একরাত্রি বা খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনের মতো গল্প এই বিষয় বৈচিত্র্যেরই পরিচায়ক। আবার শেষপর্বে স্ত্রীরপত্র বা বৌষ্টমী বা হালদার গোষ্ঠী ভিন্ন জীবনাভিজ্ঞতার স্বাদ আনে। রবীন্দ্রনাথের গল্পের এই বিষয় বৈচিত্র্যের পাশে তিনসঙ্গীর গল্পগুলিকে

অনেকটা বক্তব্য প্রধান বা প্রবন্ধধর্মী বলা যায়। এখানে বিষয় বৈচিত্র্য বড় নয়, একটি বিশেষ বক্তব্য বিশেষ শৈলীতে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। সে হল সেই তার পুরানো বিষয় নারীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা। রবীন্দ্র গল্পগুলিতে প্রধানত দুটি কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও একটি ভাবকে কেন্দ্র করে একটি অতিসরল ঘটনাবিস্তারহীন গল্প গড়ে উঠেছে আবার কোথাও কোথাও প্লটের কৌশলে গল্পের বিস্তার করেছেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথের গল্পে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি ভাবের বিস্তার আছে। কোথাও কোথাও আছে একটি সমাজ সমস্যার উপস্থাপনা কখনো বা আছে সমাজ সমস্যাটির তীব্র রূপ তুলে ধরে তার একটা সমালোচনা। তবে তাঁর গল্পের মানুষ সবসময়ই একটা প্রবল মানবিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। আগেই বলেছি এই মানুষ ও তার মানবধর্মই রবীন্দ্রনাথের গল্পের বিষয়। আর ব্যক্তিকে সমাজের পটভূমিতে রেখে তার যে স্বাতন্ত্র্যবোধের উন্মোচন তাই তাঁর গল্পের লক্ষ্য। এই স্বাতন্ত্র্য চেতনার উদ্দীপন তিনি সর্বদাই করেছেন কিন্তু তার ভঙ্গী কোনোদিনই প্রচারকের নয়। দেনাপাওনায় একটি সমাজ সমস্যা ছিল। তা আমাদের মনকে পণপ্রথার নিষ্ঠুরতায় ব্যথিতও করে তোলে, কিন্তু প্রবল প্রতিবাদ ও প্রতিকারের জন্য উদ্বুদ্ধ করে না। বরং মনের মধ্যে একটা অনুভূতি জাগায় যেটা মানুষের মনের ক্ষুদ্র গন্ডীকে কিছুটা বিস্তারিত করে। আবার যখন তিনি তিনসঙ্গীর সোহিনীর গল্পে পৌঁছান সে সময় ও সমাজ যথেষ্ট পরিবর্তিত, রবীন্দ্রনাথের মনও তখন অনেক পরিণত – সে গল্পে নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতাকে তিনি একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিয়ে যান। রবীন্দ্রনাথের গল্পে এই ভাবে মানবধর্ম প্রথম থেকেই গল্পের ভাববস্তু হিসেবে উত্থাপিত। সেই মানবধর্মকে ভারতী গোষ্ঠীর লেখকেরা তাঁদেরও মূল থিম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীগোষ্ঠীর লেখকদের মূল সংহতি ছিল প্রগাঢ় রবীন্দ্রানুরাগে।'[১০]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গভীর জীবনবোধকে বা তাঁর শিল্পদৃষ্টিকে আত্মস্থ করবার সামর্থ তাঁদের তেমন ছিল না। এঁরা একদিকে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী অন্যদিকে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গেও তাঁদের যোগ ছিল ঘনিষ্ট। সে সব গল্প উপন্যাসের অনুবাদও করেছেন। এঁদের লেখায় গল্পের বিষয়গত বিস্তার ঘটেছিল। 'এরা নীচু তলার গরীব মানুষের কথা, পতিতাজীবন ও সমাজনিষিদ্ধ দেহ সচেতন প্রেমের কথা তাঁদের গল্পে উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছিলেন।'[১১]

জলধর সেনের 'বিশুদাদা' 'করিম শেখ' প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'চাষার মেয়ে' উপন্যাস কিংবা 'বাজীকর' গল্প, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'ঝড়ের যাত্রী' এই নীচুতলার মানুষের জীবনচিত্রের দৃষ্টান্ত। এঁরা সেকালের সমাজবেষ্টনীকে উদার মানবধর্মের প্রেরণায় ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন। যেমন 'ঝড়ের যাত্রী' উপন্যাসে ব্রাহ্মণকন্যা মাধবীর উক্তিতে নমশূদ্রের প্রতি যে মনুষ্যত্বের টান তার প্রকাশ ঘটেছে। পতিতা নারীর জীবন ও চরিত্রের প্রতি এক ধরণের সমবেদনা বাঙলা সাহিত্যে আগেই দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথের বিচারক গল্পে কিংবা শরৎচন্দ্রের কোনো কোনো উপন্যাসে তার পরিচয় আছে। ভারতী-গোষ্ঠীর লেখকেরা এই শ্রেনীর চরিত্রের মধ্যে নারী হৃদয়ের পবিত্র প্রেমধর্মের জাগরণই দেখিয়েছেন। তাদের লেখায় পতিতা নারীর বিচার — 'সংকীর্ণ নীতি অনুশাসনের মানদন্ডে না করে মানব হৃদয়ের গভীর সহানুভূতির মাপকাঠিতে করা হয়েছে।'[১২]

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখায় 'দেহসচেতন যৌনবোধের'[১৩] কথাও বলেছিলেন। কিন্তু এসব লেখায় মানুষের অন্তর্নিহিত শুদ্ধতার কথাই বিশেষ করে বলা হয়েছে। তাই তাঁদের বলা যায় 'আদর্শবাদী রোমান্টিক লেখক। ঠিক বাস্তবপন্থী নয়।'[১৪]

কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকেরা বাংলা গল্প উপন্যাসের ধারাকে আরো বিস্তারিত করলেন। এঁদের সাহিত্যধর্মের দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। প্রথমত এঁরা হলেন ঘোষিত অর্থে রবীন্দ্রবিরোধী

সাহিত্যধারার প্রবর্তক। সে কাজ এঁরা অনেকটাই করেছেন। দ্বিতীয়ত (রবীন্দ্র বিরোধী হবার ফলে) এঁরা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বস্তুর বাইরের এলাকার প্রতি বেশী জোর দিয়েছেন। কল্লোলের লেখকেরা এ জন্য দুটি ক্ষেত্র বেছে নিয়েছিলেন। একটি হল অপজাত অবজ্ঞেয় মানুষের কথা আর অন্যটি হল মানুষের দেহচেতনা বা যৌনবোধ। এই দুটি ক্ষেত্রকে এরা খুব জোর দিয়ে দেখেছিলেন। এঁদের লেখায় এ রকম হবার কারণ ছিল। আগে বলেছি রবীন্দ্রবিরোধিতা একটি কারণ। কল্লোলের লেখকেরা কথাসাহিত্যে পুরানো ধারা অতিক্রম করে নূতন এক ধারার সূচনা করতে চেয়েছিলেন। আর সেখানে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন পথের সবচেয়ে বড় বাধা। তাই তাঁরা চেষ্টাকৃতভাবে এই রবীন্দ্র প্রভাব কাটিয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। এজন্য বলাহয় 'কল্লোল যুগের প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই হলেন রবীন্দ্রনাথ।'[১৫] রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের একটা কারণ নিজেদের পথ খুঁজে পাওয়া আর একটা কারণ রবীন্দ্রসাহিত্যে সমকালীন জীবনের ছায়াপাথ খুঁজে না পাওয়া। এঁরা রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশ্লেষণ করে বললেন তাঁর লেখায় মানবজীবনের শুদ্ধ পবিত্র রূপই ফুটে উঠেছে সেখানে তার রক্ত মাংসের পরিচয় নেই —

> তাহার সুবিচিত্র চরিত্রগুলির সকলেই যেন শুচিতায় ভরা এমন কি বিনোদিনীর মধ্যেও পঙ্কিলতা নাই। মানুষ যেখানে সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া বসিয়া আছে– হয়তো তাহার অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে সত্যের স্ফুলিঙ্গটুকু বাঁচিয়া আছে মাত্র – সেখানে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পাইনা।[১৬]

সমকালীন সমাজ ও মানবজীবন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে যুদ্ধের প্রভাবে এবং নীতিবোধের অবক্ষয়ে অনেক বদলে গিয়েছিল। তাই নব্য সাহিত্যকারেরা তাঁদের অভিজ্ঞতায় যে মানুষকে পাচ্ছিলেন তার কথা বলতে এলেন, যে মানুষকে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের লেখায় পান নি। তাঁর লেখায় মানুষের জীবনের দুটি দিকের অভাব সম্বন্ধে এরা অভিযোগ করলেন।

১। রবীন্দ্রনাথের লেখায় মানুষের রক্তমাংসের পরিচয় – অর্থাৎ যৌন মনস্তত্ত্বের চিত্র নেই।

২। দরিদ্র মানুষের কথা রবীন্দ্রনাথের লেখায় নেই।

বুদ্ধদেব বসু এই কথাই বলেছিলেন 'রবীন্দ্রনাথের পাত্র পাত্রীরা যথাযোগ্য শরীরের অভাবে পাণ্ডুর। তারা তাদের স্রষ্টার আরোপিত অসামান্যতার ভার বইতে গিয়ে ঠিক মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি।'[১৭]

সুতরাং কল্লোলপর্বের লেখকেরা নেমে এলেন এই দরিদ্র অপজাতশেণীর মানুষের জীবন বর্ণনায় আর দেহগত মানুষের সব সীমাবদ্ধতা এবং তদ্‌জনিত যে সব অনুভূতি তার প্রকাশ ক্ষেত্রে। এই সব কারণে পাশ্চাত্য সাহিত্যের জীবনসংরক্তি এই পর্বের লেখায় এলো। সজনীকান্ত দাস লিখেছেন ' বিশ্বমহাযুদ্ধের আলোড়ন শেষ হইলে দেখা গেল ইউরেপীয় সাহিত্যের উদগ্র বস্তুবাদ উগ্রমূর্তি লইয়াই বাঙলার অঙ্গনে প্রবেশ করিতেছে।'[১৮] এই পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিল ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের ধারণা। প্রথম মহাযুদ্ধ, ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব এবং দেশকালের পটে প্রচলিত নীতি ভাঙবার একটা সচেতন প্রবণতা থেকে কল্লোলের লেখকেরা বাংলা সাহিত্যে যে সব ধারণা আনলেন সেগুলিকে গোপিকানাথবাবু এইভাবে সূত্রবদ্ধ করেছেন।

১। নবীনতার সাধনা

২। প্রচলিত নীতি ধর্ম ও প্রেম সম্পর্কে আদর্শবাদী চিন্তাধারার অভাব

৩। কথাসাহিত্যের বিষয়সীমার প্রসার ও বৈচিত্র্যসাধন

৪। বস্তুনিষ্ঠা বা Realism এর দিকে ঝোঁক

৫। নগর চেতনা।[১৯]

কল্লোল যুগের লেখকেরা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের কথা নিয়ে গল্প লিখলেন তাছাড়া কয়লাকুঠি, বা বস্তিঅঞ্চল এইসব লেখায় উঠে এল। 'পটলডাঙার পাঁচালী', কয়লাকুঠির গল্প যেমন এলো তেমনি বেদেসমাজের কথা, পতিতানারীর গল্প, যাযাবর মানুষের কথাও এলো। কল্লোলের লেখকেরা যেমন বিষয়বস্তুর সীমানা বিস্তার করলেন তেমনি বাস্তবতার প্রকাশও ঘটালেন। তৃতীয়ত আর একটা জিনিস দেখা গেল। 'সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তির জীবনস্বাতন্ত্র্য এই পর্বে বড় হয়ে উঠলো। ফলে সমাজ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমানুষ তার নির্দিষ্ট স্থান হারিয়ে হয়ে উঠলো মনে মনে যাযাবর শ্রেণীর মানুষ।'[২০] গকুল নাগের 'পথিক', অচিন্ত কুমারের 'বেদে' ইত্যাদিতে তার সাক্ষ্য আছে। 'পটলডাঙার পাঁচালী', 'পাঁক', 'উপনায়ন', 'মিছিল' ইত্যাদিতে আছে নগর চেতনার পরিচয় এবং নগরের জীবনের নানা আবর্তের কথা। শৈলজানন্দের গল্পে এলো আঞ্চলিক জীবনের কথা আর সেই আঞ্চলিক মানুষের সংরক্ত জীবনের কথা। কয়লাকুঠির কুলি মজুর হল তাঁর চরিত্র। তিনি এই সাধারণ সাঁওতাল বাউরী ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষকে দেখালেন। কয়লাকুঠিতে নানকু বিলাসীর গল্প উঠে এল। নারীর মন গল্পে এক প্রেমিক দুই প্রেমিকার মনস্তত্ত্ব প্রকাশ পেলো। নারীমেধ গল্পে মানুষের পশুত্ব নির্লজ্জভাবে প্রকাশিত হল। এইসব গল্পে সাহিত্যের সীমার বিস্তার হল। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন যাদের কথা কেউ লেখে না যাদের জীবনে চোখ ধাঁধানোর ছড়াছড়ি নেই তাদের কথা লেখার তাগিদ থেকে তিনি গল্প লিখেছেন। এই শ্রেণীর মানুষকে পেলাম 'শুধু কেরানী', 'মহানগর' 'হয়তো' 'শৃঙ্খল' ইত্যাদি গল্পে। প্রেমেন্দ্র মিত্র নিরাবেগ বিশ্লেষণে এই সব মানুষের কথা এঁকে গেছেন। 'সংসার সীমান্তে' গল্পে এসেছে এক চোর আর এক পতিতার কথা। পতিতা এখানে আদর্শায়িত কোনো নারীমূর্তি নয়, সে নিতান্তই অবস্থার চাপে সীমাবদ্ধ বাস্তব মানুষ। 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে, এই শ্রেণীর মানুষের বাস্তব জীবনের গল্প। দারিদ্র্যপিষ্ট মানুষের অসহায়তা, বিকৃতি ও যন্ত্রনার চিত্র তাঁর গল্পে কঠিন শিল্প সংহতি লাভ করেছে।'[২১] অচিন্ত্য কুমারের গল্পেও এসেছে সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের কথা – তাদের জীবন সংকটের বৃত্তান্ত। এখানে জগদীশ গুপ্তের নেতিবাদী জীবনদর্শনের কথাও স্মরণযোগ্য। জগদীশ গুপ্ত মানুষের দারিদ্র্য ও অসহায়তা এবং তার নানা নীচতা যেমন মেলে ধরেছেন তেমনি দেখিয়েছেন মানুষ নিয়তি নামক এক অদৃশ্য শক্তির অমোঘ টানের কাছে কেমন অসহায়। তাঁর গল্পে এসেছে সেই টুকী নামে মেয়েটির স্বামীর কথা যে স্ত্রীকে পরপুরুষের ভোগে লাগিয়ে টাকা উপার্জন করতে চায়, সেই শ্বশুর যে ছেলের বিয়ে দিয়ে পণ নেয় আবার বৌকে বিষ দিয়ে হত্যা করে মারে এবং আবার ছেলে বিয়ে দেয়, তার কথা, – তেমনি এসেছে সেই পাঁচুর কথা যাকে 'দিবসের শেষে' গল্পে সত্যিই কুমীরের হাতে প্রাণ দিতে হল। 'মানুষের জীবনব্যাপী সকল শুভপ্রয়াস শেষ পর্যন্ত নিস্ফল হয়ে যায় – জগদীশ চন্দ্রের দৃষ্টিতে জীবনের তাৎপর্য এই।'[২২] একথা স্বীকার্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বুদ্ধদেব বলেছিলেন belated kallolean।[২৩] আর অচিন্ত্যকুমার বলেছেন 'কল্লোলের কুলবর্ধন।'[২৪] বস্তুত তিনি কোনোদিন কল্লোলে, কালি কলমে না লিখেও কল্লোলের কুলবর্ধন। এ-কথার মানে তিনি কল্লোল ধারারই উত্তরসূরী। 'জটিল জীবন সমস্যার রূপায়ণে এবং প্রথাবিরুদ্ধ বিদ্রোহী চেতনায় তিনি অনেকাংশেই এদের সমধর্মী।'[২৫] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে দুটো পর্ব অনেকে বিভাজন করে থাকেন। একটি তাঁর মার্কসবাদী দীক্ষার প্রাক্ পর্ব, অন্যটি পরবর্তী পর্ব। প্রথম পর্বের মানিক অনেক বেশি গূঢ় ও জটিল জীবনসমস্যার রূপকার। সেখানে তিনি মনস্তত্ত্বের ব্যবহারে এবং প্রতীকের প্রয়োগে মানবমনের যে বিশ্লেষণ করেন তা এক বৈজ্ঞানিকের মনোধর্ম থেকেই জন্ম নিতে পারে। তাঁর গল্পে আধুনিক মধ্যবিত্ত মানুষের কথাই বেশি আসে। মানবচরিত্রের গহণ অন্তরলোকে তাঁর পদচারণা। প্রাগৈতিহাসিকের মত গল্প আর কেউ কোনদিন লিখবেন বলে মনে হয় না। উদরের ক্ষুধা আর দেহের ক্ষুধা দুই মিলিয়ে মানুষের যে জীবন তারই গল্প 'প্রাগৈতিহাসিক'। তাঁর 'সরীসৃপ' বা 'আত্মহত্যার অধিকার, কিংবা 'টিকটিকি' মনস্তত্ত্বের

গভীর গহণ পথে মানুষের অন্তরকে উন্মোচিত করে দেয়। তাঁর পরবর্তী পর্যায়ের গল্পে মানুষের দারিদ্র্য এবং তজ্জনিত কারণে মানুষের দুরবস্থা এবং তা থেকে উত্তীর্ণ হবার সংগ্রাম বড়। কিন্তু প্রথম পর্বের গল্পে আছে মানুষের মনোগহণের অন্ধকারে বিসর্পিল পদচারণা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের বিষয়ে যুগান্তর চক্রবর্ত্তী লিখেছেন, তাঁর প্রথম পর্বের রচনায় মানুষের অবিরত আত্মখনন ও আত্মসন্ধান। শেষ পর্বের রচনায় এই মানুষই সমাজসত্যের আন্দোলনে আত্মপ্রতিষ্ঠা পায়। অতসী মামী গল্প সংকলনের 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পে নীলমণির যে মানসিকতা লেখক দেখিয়েছেন তা নিম্নমধ্যবিত্ত মনস্তত্ত্বের সার্থক রূপ। এক দিকে নীলমণি নিজেই নানাভাবে পীড়িত কিন্তু মেয়ের উপর হাত তুলতে কি আশ্রিত কুকুরটাকে মারতে তার কোনো দ্বিধা হয়না। আবার মাঝরাতে ভিজতে ভিজতে বড় লোকের বাড়িতে গিয়ে চট পেতে শোবার অনুমতি পেয়ে সে কৃতার্থ হয়ে যায়। আবার শেষ পর্যন্ত সরকার বাড়িতে আশ্রিত হাঁপানি রোগাক্রান্ত বুড়োকে দেখে সেও বাঁচবার একটা জোর পায়। দ্বিতীয় পর্বের মানিক সমাজসচেতন মাত্র নয়, সমাজ পরিবর্তনেরও কথাকার। এই পর্বের 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', 'হারানের নাতজামাই', ইত্যাদি গল্পে সেই রূপ ফুটে উঠেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে মানুষের মনের বিচিত্র রূপ যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি বহুবিচিত্র বিষয়ও তাঁর গল্পে এসেছে। যেমন এসেছে টিকটিকি গল্পে। শরীরসৃষ্ট গল্পের মানুষের যৌনচেতনা, আবার 'দু:শাসনীয়' গল্পে বস্ত্রহীন মানুষের সংকট, 'যাকে ঘুষ দিতে হয়' গল্পে মধ্যবিত্ত মানসিকতার সমস্যা – এই সব বহুবিচিত্র বিষয়ের গল্প তিনি লিখেছেন।

এই সূত্রে সুবোধ ঘোষের সঙ্গে তাঁর পূর্বসূরী জগদীশ গুপ্ত বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে আসে। এঁদেরই মতো সুবোধ ঘোষ তাঁর অনেক ছোটগল্পে প্রধানত মধ্যবিত্ত চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচন করে দেখিয়েছেন। সুবোধ ঘোষের প্রয়াস একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যয়ের সঙ্গেই তুলনীয় মধ্যবিত্তচরিত্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণে। অরুনকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁকে জগদীশ গুপ্তেরও উত্তরসূরী বলে মনে করেন। তবে জগদীশ গুপ্তের রচনার সঙ্গে সুবোধ ঘোষ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলনা করাটা যথেষ্ট বাস্তবানুগ হবে না বলে মনে হয়। এঁদের প্রত্যেকের গল্পেই মধ্যবিত্ত চরিত্রের রূপ উদ্ঘাটন করা হয়েছে। জগদীশ গুপ্ত মধ্যবিত্ত চরিত্রের তীব্র সমালোচনায় নিয়তির কাছে মানুষের আত্মসমর্পণ, মানুষের বিনাশ ও গ্লানিকর সমাপ্তিতেই তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা সুবোধ ঘোষ তাঁদের গল্পে মধ্যবিত্ত মানুষের লোভ, লালসা, মেকী আদর্শবাদ ও সুবিধাবাদী চরিত্রের মুখোশ টেনে খুলে দিলেও, একই সঙ্গে সমস্যা সংকুল মধ্যবিত্তের বাস্তব জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধানও করেছেন। জগদীশ গুপ্তের লেখায় নিয়তির সর্বাত্মক বিনষ্টির কথা এসেছে। এঁদের লেখায় তা আসেনি।

১৯৪০এ সুবোধ ঘোষের সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার আগেই, ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৯ সালের সময়সীমায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চারটি গল্প সংকলন – 'অতসী মামী', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'মিহি ও মোটা কাহিনী' এবং সরীসৃপ প্রকাশিত হয়ে গেছে। এইসব গল্পে অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ অনুসারে রোমান্টিকতা, জীবনের প্রতি মমত্ব অন্তর্গূঢ় জটিলতা এবং মানুষের অন্ত:সারশূন্যতার কথা রয়েছে। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ এ প্রকাশিত হয় তাঁর 'বৌ' 'সমুদ্রের স্বাদ', 'ভেজাল', 'হলুদপোড়া'। ১৯৪৫ – ১৯৪৮ সময়সীমায় প্রকাশিত গল্পগুলোতে পরিণত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেন জীবনের প্রতি আস্থা খুঁজে পেয়েছেন। এই পর্যায়ের অনেকগুলো গল্প সংকলিত হয়েছে 'আজকাল-পরশুর গল্প'তে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হন ১৯৫৬ সালে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত যে, সুবোধ ঘোষ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪০ – ১৯৫৬ এই ষোল বছর সাহিত্য রচনা করেছেন পাশাপাশি। এই দুজন বাস্তববাদী লেখকের যদিও জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধান, তবুও একটি মৌলিক আদর্শগত বিভেদ, জীবন সম্পর্কে দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করেছে। অরুন কুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসবাদে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে এগিয়ে গেছেন, অন্যদিকে সুবোধ ঘোষ মার্কসবাদে বিশ্বাস হারিয়ে, গান্ধীবাদে আস্থা স্থাপন করে, ভারতবর্ষের প্রবহমান শাশ্বত ও সনাতন রূপটিতে দেখতে ও দেখাতে চেয়েছেন। মানুষের অন্তরের আঁকাবাঁকা জটিল পথে দুজনেরই সচ্ছন্দ বিচরণ। এই পথ পরিক্রমায় তাঁরা কেউই অযথা ভাববিলাসী নন, বাস্তববাদী।

প্রখ্যাত সমালোচক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার বাংলা ছোটগল্পের ধারাবাহিক প্রকৃতির কথা বলে সুবোধ ঘোষের গল্পের ধর্ম দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন —

> বাংলা গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে যখন রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও গল্পগুচ্ছ অবধারিত প্রভাব ছড়িয়ে রেখেছে যখন শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র বা জগদীশ গুপ্তের মতো কথা সাহিত্যিকের কাহিনী বুনবার ক্ষমতা, নানা বিচিত্র স্বভাবের সামাজিক-অসামাজিক মানুষের ভিড়, আবেগের কিংবা নিরাবেগের ভাষা আমাদের মুগ্ধ করে রেখেছে, তখনই তারাশঙ্কর, মানিক বা বিভূতিভূষণের মতো কথা সাহিত্যিক এসে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্বে প্রমাণ করলেন – কথাশিল্প – মূর্তির মতো বিচিত্র বিভঙ্গই না তখন বাকি থেকে গিয়েছিল। পাশাপাশি এলো নাগরিক মনন প্রবাহের এক নতুন ধারা। বুদ্ধদেব, ধূর্জটি প্রসাদ, গোপাল হালদার যার প্রতিনিধি মূলক প্রমাণ। আর এলেন নাগরিক মনস্তত্ত্বের জটিল রহস্যময়তা ও গভীর মানবিকবোধ নিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র। কিন্তু কথাসাহিত্যের শিল্প মূর্তিতে বিভেদের বৈচিত্র্য ও বিস্ময়ের শেষ নেই। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি বছর গড়াতে না গড়াতেই এলেন সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মতো কথাশিল্পী। এলেন, সন্তোষ কুমার ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর বা রমাপদ চৌধুরীর মতো ঔপন্যাসিক ও গল্পকার।
>
> সুবোধ ঘোষ তাঁর পূর্বসূরীদের সবরকম ঐতিহ্যই আত্মসাৎ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের শেষ পর্বের নতুন নারী-পুরুষ উদ্দীপ্ত চরিত্র ও ভাষার শাণিত বক্রতা, শরৎচন্দ্রের চরিত্র বৈচিত্র্য, নরেশচন্দ্র-জগদীশ গুপ্তের রিরংসা ও অপরাধের প্রকাশ্য ও প্রকট চেহারা, প্রেমেন্দ্র মিত্র – অচিন্ত্য সেনগুপ্তের নাগরিক মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের অবক্ষয়িত জীবনবোধ, হাস্যকর উন্নাসিকতা ও মিথ্যে মর্যাদাবোধ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যবিত্তের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতায় নীতিহীন পদ্ধতির প্রায় অমানুষিক রূপ, শ্রমজীবী মানুষের সংহতিবোধ, এবং প্রাধান্য প্রতিপত্তি বজায় রাখতে উচ্চবিত্তের প্রকাশ্য অথবা গোপন নির্মম অমানুষিক শোষক চরিত্রের প্রকাশ – এ সমস্তই কোনো না কোনোভাবে সুবোধ ঘোষের গল্পে বিষয়বস্তু পরিবেশনের রূপরীতিতে এসেছে। কিন্তু ঐতিহ্যের এই বিচিত্র উপকরণগুলি সুবোধ ঘোষের গল্পে থাকলেও অনেকক্ষেত্রেই শেষপর্যন্ত একটা মুখোশ খুলে দেওয়ার ভঙ্গি থেকে গেছে যা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের মধ্যেও পাই।[২৬]

তিন

সুবোধ ঘোষের প্রথম গল্প রচনার কথা আগে বলা হয়েছে। তিনি প্রথম যখন গল্প লেখেন তখন বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকটা নতুন ধারার প্রচলন করেছেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে তাঁর চারটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সব গল্পগুলির পটভূমিতে দেখলে সুবোধ ঘোষের গল্পগুলির সুর বুঝতে পারা যায়। মানিকের গল্পে কাহিনী পরিবেশনের তুলনায় জীবনের নানা সমস্যাকে তুলে ধরাটাই বড় হয়ে উঠেছে। মানিক জীবনের সেই সব সমস্যাকে বেশি জোর দিয়েছেন যেখানে মানুষের রোমান্টিকতা নয় বরং তার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা এবং সমাজের সংকটই মুখ্য। প্রাগৈতিহাসিক কিংবা সরীসৃপ বা আত্মহত্যার অধিকার গল্পের মানুষগুলির সমস্যা হলো তারা মানবিকতাহীন এক পশুত্বের জগতে বিচরণ করে। মানুষের এই জৈবধর্মই তিনি এই শ্রেণীর গল্পে নিয়ে এলেন। মানিকের গল্পকে অনেকে দুটো স্তরে ভাগ করে দেখেন। প্রথম স্তর হল তাঁর এই মনস্তত্ত্ব বিচার সম্মত রচনা আর দ্বিতীয় স্তরের গল্পে এই সমাজ বদলের সংগ্রাম। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই রকম গল্পে তিনটি শেণীর পরিচয় পেয়েছেন।

১। রোমান্টিক গল্প ও জীবনের প্রতি মমতাসম্পন্ন গল্প।
২। অন্তর্গূঢ় জটিলতা ও মনোগহনের গল্প।
৩। মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তঃসারশূণ্যতার গল্প

আর এর পরবর্তী স্তরে মানুষের প্রতিবাদ প্রতিরোধের শক্তি তার গল্পে বড় হয়েছে। সুবোধ ঘোষের গল্পকে এই পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করলে দেখা যায় মানিক তার যথার্থ পূর্বসূরীর মতো বাংলা গল্পকে অনেকটাই তৈরী করে দিয়েছিলেন। মানুষের অন্তর্মনের জটিলতার চিত্র যেভাবে তিনি দেখিয়েছেন তা সুবোধের গল্প রচনার পটভূমি হতে পারে।

সুবোধ ঘোষের গল্পগুলিকে বিষয়ানুসারে বিভাজন করা সহজ নয়। তবু এগুলিকে কয়েকটি ভাগে সাজিয়ে আলোচনা করাই সুবিধেজনক হবে বলে মনে করি। সুবোধ ঘোষের গল্পের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে জনৈক সমালোচক লিখেছেন —

> কখনো তাঁর গল্পের পুরনো মোটর গাড়ি ও তার চালক, যে তার গাড়িটিকে ভালোবাসে প্রিয় বন্ধুর মতই (অযান্ত্রিক) কখনও রূপহীনা ভিখারিনী যে ভণ্ড মধ্যবিত্তের লোভের শিকার হয় (সুন্দরম), কখনও তিনি নায়ক করেন আদিবাসী খ্রীষ্টান কিশোরকে – সমাজের সর্বস্তর থেকে প্রাপ্ত অসম্মানের বোঝা ঠেলতে ঠেলতে যে হয়ে ওঠে সত্যিকারের উন্নতশির বিপ্লবী (চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ) কখনও নায়ক যে কোনও মূল্যে শ্রেণীগত অবস্থান অক্ষুন্ন রাখা বাঙালি মধ্যবিত্ত যুবক – যে প্রথমে আত্ম প্রতারক পরে শুধুই প্রতারক (গোত্রান্তর)। কত বৈচিত্র সুবোধ ঘোষের চরিত্র লিপিতে। আছে ফাঁসির আসামি – যে ফাঁসির দড়ি গলায় পরার পরিবর্তে বিষ খেতে ইচ্ছুক (মা-হিংসী), আছে অন্যের সন্তান গর্ভে ধারণ করা প্রিয়ার জন্য দুহাত বাড়িয়ে দেওয়া সমাজসেবক (শুক্লাভিসার), আছে প্রত্যাখ্যাত প্রেমের অসম্মান জয় করে হেসে ওঠার অসংখ্য তরুণী (গরল অমিয় ভেল), আছে বইএর উদ্ধৃতি মুখস্থ করা বৃদ্ধ ইনটেলেকচুয়াল (কোটেশন) আর দেশি বারুদ দিয়ে বাঁধের পিলার উড়িয়ে দিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজেশন রুখতে চাওয়া গ্রামীন গায়ক (ভাট তিলক রায়)।[৩৩]

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে সুবোধ ঘোষের গবেষণার বিষয় ও চরিত্র বৈচিত্র্য সম্বন্ধে

সকলেই সপ্রশংস উক্তি করেছেন। এরা বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের জগতে বিস্তার এনেছিলেন দুই দিক থেকে আর বৈচিত্র্য এনেছিলেন রচনা ভঙ্গীতে। যতই কঠিন হোক আপাতত তাই আমরা স্থূলভাবে সুবোধ ঘোষের গল্পকে কয়েকটি ভাগে সাজাতে চাই।

১। যন্ত্র ও তার গল্প।
২। প্রেমের গল্প।
৩। মধ্যবিত্ত সমাজের কথা।
৪। নিম্নবর্গের কথা – আদিবাসী সমাজের কথা।

সন্দেহ নেই এই বিভাজনে সব কিছু ধরা গেল না। এবং এই শেণীগুলির ভিতরেও আবার নানা রকম বিন্যাস করা যায়। তবু আপাতত এই বিন্যাসকে ভিত্তি করেই আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যায়। সুবোধ বাবুর গল্পকে কেউ কেউ নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করেছেন।[৩৪]

১। আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক গল্প।
২। সমাজ সমস্যামূলক গল্প।
৩। নরনারীর সম্পর্ক ও আদর্শমূলক গল্প।
৪। চরিত্রাত্মক গল্প।
৫। মনস্তাত্ত্বিক গল্প।

কিন্তু এই বিভাজনের মধ্যে যাকে চরিত্রাত্মক বলা হয় আর যাকে আদর্শাত্মক বলা হয়, দুয়ের মধ্যে অনেক মিল। আবার চরিত্র ও মনস্তত্ব এই দুটিও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। কাজেই এই শ্রেণীর বিভাজনে অনেকটা overlaping হয়। অবশ্য আমাদের শ্রেণীগুলিতেও overlaping হয় না এমন নয়। তবে বিষয়ানুযায়ী এই বিভাজনের মধ্যে যেখানে যার গুরুত্ব সেখানে সেইটিকেই বড় করে দেখানো হয়েছে। সুবোধ বাবুর গল্পগুলি অধিকাংশই মিশ্র প্রকৃতির। যে কোনো মহৎ শিল্পীর রচনাই এই মিশ্র রীতির রচনা। সেখানে শ্রেণীকরণের সুবিধে কম। হয়তো সমাজ বিকাশের আধুনিকতার ধর্মই এই মিশ্ররীতি। তাই বলা যায় বাংলা গল্পে সুবোধ ঘোষের বিষয়বস্তু নির্বাচনের বৈচিত্র্য অনন্য।

১০ই অক্টোবর, ১৯৪০ সালে মন্মথনাথ সান্যালের সহকারী হিসেবে আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদানের পর ঐ বছরেই প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম এবং সাড়া জাগানো ছোটগল্প – অযান্ত্রিক। আর পেছনে ফিরে তাকান নি সুবোধ ঘোষ। নয়-ই মার্চ, ১৯৮০, মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি সক্রিয় ছিলেন সাহিত্য সাধনায়। ঐ শেষদিনে তার কলম চিরতরে স্তব্ধ হয় 'ওমর খৈয়াম স্মরণে' আনন্দবাজার পত্রিকাটির জন্য সম্পাদকীয় লেখার পর। তবে মাঝখানে দীর্ঘ পাঁচ বছর কি এক অজানা কারণে কলম ধরেননি তিনি। এমনকি দেশ এবং আনন্দবাজার পূজো সংখ্যাতেও তাঁর কোন লেখা নেই এই সময়কালে। ১৯৬৮ তে 'কালকেতু' লিখে সাহিত্যের আসরে সুবোধ ঘোষের প্রত্যাবর্তন ঘটে।

'অযান্ত্রিক' লিখেই সুবোধ ঘোষ বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে সসন্মান প্রবেশাধিকার লাভ করেন। আনন্দবাজারে প্রকাশিত এই গল্পটি তিনি লিখেছিলেন অনামী সঙ্ঘের কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুদের অনুরোধে এবং চাপে। দ্বিধাগ্রস্থ সুবোধ ঘোষ গল্পটি শেষ করে যেন এক দায় থেকে বাঁচলেন। জীবনে প্রথম গল্প লিখে সুবোধ ঘোষ ভাবতেও পারেননি যে এই গল্পটিই তাঁর জীবন ও কর্মকে এক নতুন পথ নির্দেশ দিতে চলেছে। তাঁর কল্পানারও অগোচরে ছিল যে এই গল্পের পথ ধরে তাঁর পরবর্তী জীবনের সাহিত্যসৃষ্টি আগামী দিনের বাংলা কথাসাহিত্যকে এক নতুন মাত্রা দান করে সমৃদ্ধতর করবে।

গল্পটি পাঠ করে শোনানোর পর শ্রোতা সাহিত্যিক বন্ধু ক'জনের উচ্ছ্বসিত এবং নির্ভেজাল প্রশংসা সুবোধ ঘোষকে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হতে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছিল, সুবোধ ঘোষ তাঁর স্মৃতিকথায়

কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা স্বীকার করেছেন।

অযান্ত্রিক - গল্পে সুবোধ ঘোষের বিষয়-ভাবনা একান্তই মৌলিক। একটি অতি পুরোনো মোটর গাড়িকে নিয়ে যে মানবিক অনুভূতি সঞ্চারিত করে একটি যন্ত্রদানবকে যন্ত্রমানবে উন্নীত করেছেন তা সত্যি বিস্ময়কর। অযান্ত্রিক প্রসঙ্গে বিভিন্ন সমালোচকের সমালোচনায় যন্ত্রদানব শব্দটি বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এই শব্দটিতে লেখকের ঘোরতর আপত্তি ছিল। অন্তর ভাবনার প্রতিটি অলিন্দে আধুনিক সুবোধ ঘোষ 'যন্ত্র' কে 'মানুষের নিজের জ্ঞানজ সন্তান' হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যন্ত্রকে 'যন্ত্রদানব' আখ্যা না দিয়ে যন্ত্রমানব হিসেবে কল্পনা করেছেন তাঁর নিজস্ব যুক্তি ভাবনার মৌলিকত্বে।

'কালপুরুষ' ছদ্মনামে সুবোধ ঘোষ বেশ কিছু রম্যরচনা লিখেছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকায়। 'যন্ত্র দানব নয়' শীর্ষক একটি রচনায় লেখক 'যন্ত্র' সম্পর্কে তাঁর যুক্তি এবং ভাবনা তুলে ধরেছেন।

> বাংলা সাহিত্যে – যন্ত্রদানব নামে একটা কথার খুবই চলন হয়েছে। কোন মনীষী প্রথম এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন জানি না।
>
> যন্ত্র দানব হলো কিসে ? কোন কোন দার্শনিক আধুনিক সভ্যতাকে লৌহময়ী বলে গালি দেন। এই সব অভিযোগের কি সত্যই কোন ভিত্তি আছে ? সভ্যতা যে লৌহময়ী হয়েছে সেটা গর্বের বিষয়, না অপমানের বিষয় ? লৌহময়ী না হয়ে কাষ্ঠময়ী বা প্রস্তরময়ী হয়ে থাকাটাই কি মানব সভ্যতার পক্ষে শ্লাঘার বিষয় হতো ?
>
> মানুষ প্রথম যেদিন পালতোলা নৌকা গড়েছিল, সেইদিন সেটা যন্ত্রই ছিল। পাহাড়িয়া মানুষ যেদিন প্রথম হাড়ের বাঁশী তৈরী করে, সেদিন তা যন্ত্রই ছিল। মানুষ তার আবিষ্কারের আনন্দে আত্মহারা হয়েছে। কাউকে দানব বলে অবজ্ঞা ও সঙ্গে সঙ্গে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে সে চায় নি।
>
> জন্তু ও যন্ত্রের একটা তুলনামূলক আলোচনা চলতে পারে। এ দুয়ের মধ্যে গুণগরিমায় কে বেশী ? একটি সাধারণ অটোমোবিলের বৈগেশ্বর্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অশ্বটির বেগবত্তার তুলনায় কি অসুন্দর ? বিরাট একটা বয়লারের দৃপ্ত চেহারা একটা হাতীর চেহারার তুলনায় দীনতর নয়।
>
> গ্রামোফোনের একটি লোহার পিন যে সঙ্গীত সমারোহ সৃষ্টি করে সেটা কি কোকিল, শ্যামা, দোয়েলের কাকলি ঝংকারের তুলনায় ঘৃণ্য ? যে কোন চলন্ত মেসিনের সুচিক্কন নিরেট রূপের স্ফূর্তি – ভ্যালভ্, পিষ্টন, গিয়ার নাট, বোল্টের ঝকঝকে আভরণ আর স্বচ্ছন্দ বিঘূর্ণন, এর মধ্যে কি শ্রী নেই ? যন্ত্রশ্রী কথাটা কি ভুল ?
>
> যন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ যন্ত্র না কি মানুষের সংহারের কাজে খুব সাহায্য করেছে। কথাটা সত্য। কিন্তু যন্ত্রের দোষটা কোথায় ? আজ ট্যাঙ্কে চড়ে নরবাহিনী যে হত্যালীলা করে বেড়ায় হাজার হাজার বছর আগে ঘোড়ায় চড়ে মানুষ সে কাজ করেছে। কিন্তু ঘোড়াদানব কথাটা তো কাউকে বলতে শুনি নি। জ্ঞানলক্ষ্মীর সন্তান এই যন্ত্র। মানুষের হিংস্র মন তাকে অসৎ কার্যে নিয়োজিত করেছে। এর দায়িত্ব মানুষেরই। যন্ত্র কাউকে যেচে, নিজে থেকে সর্বনাশ করতে দৌড়ায় না। বারং গরু, ঘোড়া, গায়ে পড়ে মানুষকে কখনো কখনো গুঁতো লাথি মারে। যন্ত্রের মত এত বাধ্য সেবক মানুষের দ্বিতীয় কেউ নেই।
>
> কবি ও দার্শনিকেরা জন্তু জানোয়ারের মধ্যে অদ্ভুত মায়া মমতা স্নেহ ও প্রভুভক্তির প্রমাণ পেয়ে থাকেন আর তার জন্য সাহিত্যে জন্তু জানোয়ারকে

কম স্তুতি খ্যাতি করা হয়নি। বাছুরের উপর গাভীর মাতৃস্নেহ, কুকুরের প্রভুভক্তি এসবের অনেক উপাখ্যান আছে।

মানুষ সত্য সত্যই জন্তু জানোয়ারের ব্যথায় ব্যথী। সাহিত্যে এর প্রমাণ আছে। শরৎচন্দ্রের মহেশ গল্প অনেকেই পড়েছেন। হেলে বলদের দুঃখে মুসলমান চাষীর মর্মান্তিক দুঃখ একটি করুণ গল্পে খুবই সজীব হয়ে ফুটে উঠেছে। এটা হওয়া স্বাভাবিক। মানুষই হোক বা জন্তুই হোক, যেখানে সেবা ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক সেখানে এরকম আবেগময় সম্পর্ক স্থাপিত হবেই। কিন্তু এই পর্যন্তই। মানুষের মায়িকতা আজ পর্যন্ত সঙ্কীর্ণ পরিধির বাইরে যেতে পারে নি। আজীবন সাথী কোন যন্ত্রের জন্য মানুষ ঠিক 'মহেশ' গল্পের চাষার মত কাঁদে না।

কিন্তু একথাটাও সত্য নয়। আধুনিক সাহিত্যিক কাঁদে না, যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মাধুর্য আধুনিক সাহিত্যিকের অনুভবের বাইরে। যারা যন্ত্রজীবী বা যন্ত্রশ্রমিক তারা কিন্তু যন্ত্রকে এর মধ্যে ভালবাসতে আরম্ভ করেছে।

পশু পক্ষীর যতই গুণগরিমা থাক তবুও সে পর। তারা মানুষের প্রতিবেশী। মানুষ তাকে সৃষ্টি করেনি। অপর দিকে যন্ত্র মানুষের নিজের জ্ঞানজ সন্তান। বিংশ শতাব্দীতে এত বড় একটি মহান্ সৃষ্টির গৌরব একান্তভাবে মানুষের নিজস্ব। এই যন্ত্রসন্তানের সেবার মূল উপলব্ধি করে তাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে বিংশ শতাব্দীর ফিলসফি নতুন একটি মর‍্যাল সৃষ্টি করতে পারে না কি?[৩৫]

প্রকৃতপক্ষে, যন্ত্র সম্পর্কে সুবোধ ঘোষের এই ভাবনার গল্পরূপই – 'অযান্ত্রিক'। কারণ, এই গল্পের মূল বক্তব্য – মানুষ এবং যন্ত্রের নৈকট্য যা যন্ত্রের জড়ত্বকে অবলীলায় দূরে সরিয়ে রেখে, বিমলের মোটরগাড়ি, জগদ্দলকে জীবন্ত করে তুলেছে।

যন্ত্র সম্বন্ধে সুবোধ ঘোষের এই ভাবনাটাকেই বলা যায় আধুনিক ভাবনা। কেননা নগরায়নের ফলে পূর্বতন গ্রামীন সমাজ ভেঙে গিয়ে ভারবাহী পশুর বদলে যন্ত্রই হয়ে উঠেছে এ সভ্যতার বাহন। সেই অর্থে সুবোধ নাগরিক শিল্পী। নাগরিক জীবনের সব গ্লানি ও কদর্যতা তিনি দেখেছেন কিন্তু তাকে সেই রূপে পরিবেশন করেন নি। জীবনের প্রতি একটা মমত্ব তার মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন বলে তার রূপই বদলে গেছে। দৃষ্টিকটু তালিমারা হুড, তোবড়ানো বনেট এবং চাকার টায়ারে পটি লাগানো এই অদ্ভুত দর্শন ফোর্ড গাড়ির মালিক বিমলের কাছে এটি শুধুমাত্র একটি মোটরগাড়ি নয়, তার সুখ দুঃখের একান্ত সঙ্গী। এই 'জবুথবু, অদ্ভুতকর্ম্মা' ফোর্ড গাড়ি জগদ্দল যেন বিমলের সমস্ত স্বগোতক্তির, অভাব-অভিযোগের, সমস্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছার এক সংবেদনশীল বোদ্ধা। যন্ত্র জগদ্দলের সঙ্গে যন্ত্রযুগের শ্রমজীবী মানুষ বিমলের এক অবিচ্ছেদ্দ এবং মানবিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এই গল্পে।

একটানা পনের বছর ধরে বুড়ো জগদ্দলকে নিয়ে ষ্ট্যান্ডে যাত্রীর অপেক্ষায় থেকেছে, ঝরঝরে এ গাড়ির মালিক ও চালক, বিমল। এরমধ্যে ষ্ট্যান্ডে এসেছে হাল মডেলের নতুন সব গাড়ি। ফলে বিমলকে টিটকিরী শুনতে হয় – 'আর কেন, এ বিমলবাবু? এবার তোমার বুড়িকে পেনসন দাও।' বিমলের চট্‌জলদি জবাব — 'হুঁ! তারপর তোমার মত একটা চটকদার হাল আমলের বেশ্যে রাখি।'[৩৬] নতুন মডেলের চক্‌চকে গাড়িগুলোকে বিমল বারবণিতাদের সঙ্গে তুলনা করেছে যারা নগদ অর্থের বিনিময়ে কোনরূপ আন্তরিকতা ছাড়াই দেহদানে বাধ্য হয়। বিমলের কাছে হাল মডেলের গাড়িগুলোতে রূপের চটক আছে, কিন্তু চালকের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা নেই। জগদ্দলের ক্ষেত্রে চিত্রটি বিপরীত। রূপ নেই কিন্তু এ গাড়ি এবং তার মালিক তথা চালকের অন্তর এক সুরে বাঁধা।

আদ্যন্ত গল্পে নিরেট লৌহস্তূপ জগদ্দলের সঙ্গে বিমলের অন্তরঙ্গতা একেবারেই একতরফা। তবুও মাঝে মধ্যেই পাঠকের কাছে জগদ্দল জীবন্ত হয়ে ওঠে, যেন যন্ত্রমানব হয়ে কথা বলে। এ যেন একজনের টেলিফোনের কথা শুনে, অন্যপ্রান্তের মানুষটির কথা অনুধাবন করার সাধারণ অভিজ্ঞতা। যখন বিমল বলে 'কি করব জগদ্দল ! এবার তালি নিয়েই কাজ চালা। আসছে পূজোয় ভাল কটা রিজার্ভ পেলে তোকে নতুন রেক্সিনের হুড পরাবো নিশ্চই।'[৩৭] বিমলের এই উক্তিটি এমনভাবে শুরু করা হয়েছে, যার ফলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে জগদ্দলই যেন বিমলকে একটি নতুন হুডের জন্য আবদার জানিয়েছে, যা মানুষের পক্ষেই সম্ভব, যন্ত্রের পক্ষে নয়।

জগদ্দলকে কখনো প্রাণহীন জড়বস্তু ভাবেনি বিমল। তাই দেব নরসিংহের পায়ের কাছে ফুল-বাতাসা রেখে বিমলের একান্ত প্রার্থনা — 'হে বাবা জগদ্দল যেন বিকল না হয়। এ বয়সে আর আমায় সঙ্গীহীন করো না বাবা, দোহাই।'[৩৮] এ প্রার্থনা একান্ত প্রিয়জনের জন্যই সম্ভব।

জগদ্দলের গোলযোগ শুরু হল। আজ বেয়ারিং খারাপ, কাল ফ্যানবেল্ট ছেঁড়ে। কোন অসুস্থ রোগীকে রোগশয্যায় তার আপনজন যে ভাবে সুস্থতার আশ্বাস দেয়, ঠিক তেমনই বিমল জগদ্দলকে বলে — 'না, আমি আছি জগদ্দল তোকে সারিয়ে টেনে তুলবই, ভয় নেই।' – আবার আপনজনের প্রতি রাগ হওয়াটাও স্বাভাবিক যে কোন ভুল বোঝাবুঝিকে কেন্দ্র করে। জগদ্দল হাঁপিয়ে পড়লে তার প্রতি বিমলের ক্ষোভের স্বাভাবিক প্রকাশ প্রকৃতপক্ষে, জড় লৌহস্তূপে প্রাণের সঞ্চার করেছে। —'আদর বোঝে না, কথা বোঝে না শালা লোহার বাচ্চা নির্জীব ভূত বিমল সত্যি সত্যি ক্লাচের উপর সজোরে, দুটো লাথি মেরে বসল।'[৩৯]

গল্পটির ট্র্যাজিক পরিণতির ঠিক আগেই আমরা লক্ষ করি জগদ্দলের কর্ম ক্ষমতার সমাপ্তি ঘটেছে। মৃত্যুপথযাত্রীকে আপনজন যে ভাবে বিদায় জানায় ঠিক সে ভাবেই বিমল বলে — 'জগদ্দল আগেই যাবে মনে হচ্ছে। তারপর আমার পালা। যা জগদ্দল, ভাল মনেই বিদেয় দিলাম। অনেক খাইয়েছিস, পরিয়েছিস, আর কত পারবি ? আমার যা হবার হবে। —যা কোনদিন হয়নি তাই হলো। ইস্পাতের গুলির মতই শুকনো ঠান্ডা বিমলের চোখে দেখা দিল দু-ফোঁটা জল।'[৪০]

আমাদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে – অযান্ত্রিকে, যন্ত্রের সঙ্গে মানব হৃদয়ের এই অন্তরঙ্গতা এবং একাত্মতা কি সুবোধ ঘোষের শুধুই কল্পনা বিলাস ! অথবা সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন কিছু আমদানি করে, এক চমক সৃষ্টির মাধ্যমে গল্পকার হিসেবে নিজ উপস্থিতি জানান দেবার এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা ! অযান্ত্রিকের স্রষ্টা সুবোধ ঘোষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভাবনার সঙ্গে – বাস্তব জীবনের কোন সাদৃশ্যই কি নেই ? — এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের 'আমার পূর্বসূরী' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

> আমার কৈশোর কেটেছে ডুয়ার্সে। প্রায়শই লম্বা পাড়ি দিতে হত ঝরঝরে বাসে। তিস্তার চরের পক্ষীরাজ ট্যাক্সিতে। তখন সাহিত্যের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র অথবা রবীন্দ্রনাথ পড়ার সুযোগ পাইনি। কেউ বলেওনি কি ভাবে সাহিত্যের পড়াশুনা শুরু করা উচিত। বাসুদা নামের এক মধ্যবয়সী বিপত্নীক মানুষের সঙ্গে আমার খুব ভালোবাসা ছিল। এই বাসুদার একটা পক্ষীরাজ ছিল। পুরোন আমলের সেই গাড়ির সিটে গদির বদলে বস্তা চাপা দিয়ে সেখানে যাত্রীদের বসানো হত। তিস্তার বিশাল চর পেরিয়ে ...ঘাটে যাত্রী পৌঁছে দিয়ে সেই আমলে বাসুদা পেতেন মাথা পিছু চার আনা। পক্ষীরাজের হর্ন ছিলনা, দরকারও ছিল না। আধ মাইল দূর থেকে তার আগমন বোঝা যেত। চরে কখনও সেটা বন্ধ হয়ে গেলে বাসুদা খড় ছিঁড়ে

ইঞ্জিনে গুঁজে দিয়ে কি কায়দায় জানিনা আবার চালু করে ফেলতেন। বর্ষায় তিস্তা টৈটুম্বুর হয়ে গেলে পক্ষীরাজগুলো অচল থাকত কয়েক মাস। তখনও তিস্তায় ব্রিজ হয়নি।

এই বাসুদা এক বিকেলে আমার কাছে এলেন উত্তেজিত হয়ে। হাতে একখানা বই। ক্লাস ফাইভ বিদ্যে যাঁর, তাঁর হাতে কখনও বই দেখিনি। আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রচন্ড উত্তেজনা নিয়ে বললেন 'এ্যাই দ্যাখ, আমাকে নিয়ে একজন গল্প লিখেছে।' আমি অবাক। তখন আমি জানি সব লেখকেরা থাকেন কলকাতায়। বাসুদার খবর তাঁরা পাবেন কি করে? আর বাসুদাকে নিয়ে লেখারই বা কি আছে? বাড়িতে যে কোন গল্পের বই নিষিদ্ধ ছিল। সেই বিকেল থেকে সন্ধ্যে নেমে যাওয়া পর্যন্ত তিস্তার পাড়ে বসে গল্পটা শেষ করে আমি স্তব্ধ। হ্যাঁ বাসুদারই গল্প। কিন্তু এই বাসুদার কথা আমি কখনও ভাবিনি।

গল্পের নাম—অযান্ত্রিক। আমার সমস্ত শরীরে কাঁটা ফুটল। তখনই আমি ছুটে গেলাম বাসুদার পক্ষীরাজকে দেখতে। দেখা মাত্র মনে হল গল্পটা কাকে নিয়ে? বাসুদা না পক্ষীরাজ, কার? বলতে সঙ্কোচ নেই, সেই সন্ধ্যে বেলায় একজন লেখক আমার পূর্বপুরুষ হয়ে গেলেন।

এর অনেক পরে, যখন তিস্তায় ব্রিজ তৈরী হয়ে গেছে, তখন আর চরে পক্ষীরাজ দৌড়ায় না, নৌকাগুলো উধাও, আর বাসুদা গালে হাত দিয়ে তাঁর কেউ কিনতে না চাওয়া পক্ষীরাজের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকেন তখন আবার সুবোধ ঘোষকে বড় বেশী কাছে পেয়ে যেতাম। মানুষ সুবোধ ঘোষকে আমি খুব কম জানি। যা জেনেছি ওঁর সম্পর্কে তা বই-এর পাতা থেকে জানা। কিন্তু লেখক সুবোধ ঘোষকে বারংবার দেখেছি তাঁর লেখা থেকে। জীবনের সত্য আর সাহিত্যের সত্য যিনি মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দিয়েছেন।[৪১]

এতো গেল গল্পের বর্ণিত বিষয়ের বাস্তবতা সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া। যদি গল্পে বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে জীবনের সাদৃশ্য ঘটে যায় তাহলে লেখকের বস্তু জ্ঞানের প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু রসজ্ঞান? সুবোধ নিজেই বলেছেন সাহিত্যে রস জ্ঞানই হল আসল জ্ঞান। সাহিত্যের সৌন্দর্য রম্যতা ও রসশীলতাই তার লক্ষ্য। আর সেদিক থেকে দেখলে বলতে হয় তিনি প্রথম থেকেই অসামান্য রসসিদ্ধি আয়ত্ত করতে পেরেছেন। তাঁর অযান্ত্রিক গল্পের বয়স এখন ৬২ বছর। আর এই ৬০/৬২ বছরে এই গল্পোর নানা বয়সের পাঠক একবাক্যে গল্পটির মহত্ত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। বিমলের দিক থেকে যন্ত্রের সঙ্গে যে মানবিক সম্বন্ধ স্থাপন করার কথা এ গল্পে বলা হয়েছে তার অপূর্বতাই এ গল্পের রসসিদ্ধির কারণ। বিষয় হিসেবে তা যেমন নতুন তেমনি তার বর্ণনাভঙ্গির নাট্যধর্মিতা ও মনোবিশ্লেষণের সূক্ষ্মতাও অপূর্ব। মাঝে মাঝে বিমলের একমুখী যন্ত্রপ্রেমের মধ্যে এসে বাধা সৃষ্টি করে গেছে তার সমধর্মী গাড়ির চালকেরা। আর তাতে যন্ত্রের সঙ্গে বিমলের প্রেম আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন মানুষের জীবনে প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে প্রেম সমৃদ্ধিমান হয়ে ওঠে এও অনেকটা তেমনি।

লক্ষণীয়, গল্পের পুরোনো বা নতুন গাড়ি সবই মানবীয় সম্পর্কের দ্বারা আখ্যাত হয়েছে। আর এই দিক থেকে যন্ত্রের সঙ্গে বিমলের প্রেমও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। পিয়ারা সিং যখন ঠাট্টা করে বলে 'তোমার বুড়িকে পেনসন দাও'[৪২] তখন বিমল রেগে যায়। তার কারণই এই গভীর মানবিক টান। এই পিয়ারা সিংদের ঠাট্টায় বিমল যেমন ক্ষিপ্ত হয় তেমনি প্রেমে বা অপ্রেমে যন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়ে ওঠে —

'না, আমি আছি জগদ্দল, তোকে সারিয়ে টেনে তুলবই ভয় নেই'[৪৩]। এই ধরনের উক্তিও সেই নিবিষ্ট প্রেমেরই প্রকাশ। বেঙ্গলী ক্লাবের লোকেরা বিমলকে বলেছিল 'যন্ত্র'। বিমল এই অভিধায় বেশ খুশী। এ হচ্ছে যন্ত্রের টানে মানুষেরও তার সঙ্গে একাত্ম হবার চেষ্টা। এই যে সুবোধ ঘোষের অপূর্ব রচনা বৈশিষ্ট্য - যন্ত্রের সঙ্গে মনে মনে মানুষের একাত্মতা, এরই মূল্যে গল্পটির মর্যাদা এত বেশী। আমরা বুঝি বিমলের এই যন্ত্রপ্রেম এমন একটা নিবিড় একনিষ্ঠতা – যাকে একটা (illusion) মায়া বলতে পারা যায়। বাস্তবের এই মায়াঞ্জন সৃষ্টিতে লেখকের পারদর্শিতা গল্পের পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করে। গল্পের প্রথম থেকেই পুরানো গাড়ির সঙ্গে নিবিড় প্রেম নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে নিবিড়তার ছবি দেখাতে দেখাতে শেষ পর্যন্ত বিমলকে অন্তহীন বেদনার ভারে আক্রান্ত করে তোলে। এই ভাবে বিমলের যে ট্রাজিক পরিণতি তা আমাদের মনকে ছুঁয়ে যায়। যন্ত্রকে উপলক্ষ করে মানুষের এই ট্র্যাজিক সংবেদন ঘটাতে পারেন যিনি, তিনি খুবই বড় শিল্পী। উজ্জ্বল কুমার মজুমদার এই গল্পটির সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি যন্ত্রযুগের টানের কথাটাকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভাবেন নি। হতে পারে যন্ত্রযুগের আগাম সংবাদ শিল্পীর চেতনায় ধরা পড়েছে। কিন্তু এ গল্পে আছে যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের হৃদয় সম্পর্ক। তিনি লিখেছেন 'লেখকের কৃতিত্ব এইখানেই– অন্নসংস্থানের একমাত্র উৎস শুকিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত যন্ত্র আর মানুষের অভিন্ন হৃদয় সম্পর্কটি তিনি তৈরী করতে পেরেছেন।'[৪৪] এই গল্পে তিনি সার্থকভাবে 'যন্ত্রমানবতা' খুঁজে পেয়েছেন। মনে হয় এই বিশ্লেষণই সার্থক।

বিমলের গল্পে সুবোধবাবু যন্ত্রকে মানুষের মনের অনুভূতির অবলম্বন করে এঁকেছেন আর 'কাঞ্চন সংসর্গাৎ' গল্পে মানুষকে এঁকেছেন যন্ত্রের মতো করে। একটু আগেই বলেছি বেঙ্গলী ক্লাবের ছেলেরা বিমলকেই যন্ত্র বলে চিহ্নিত করেছিল। তাবে সেটা একটা (Passing remark) লঘু মন্তব্য মাত্র। কিন্তু কাঞ্চন সংসর্গাৎ গল্পে তিনি মানুষকেই যন্ত্রের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। যে কেউ এই অংশ পড়লে অনুভব করবেন মানুষকে কী রকম যন্ত্রের পরিভাষায় তিনি আঁকেন। এই অংশটি জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর রাগ রাগিনীর মহাদেশ শিরোনামাঙ্কিত রচনায় উল্লেখ করে সুবোধ বাবুর শিল্পীমানসে যন্ত্রের গভীর প্রভাবের কথা বলেছেন।

> সকাল সাড়ে নটা থেকে সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত হাজারিমলের অটোমবিল স্টোরে হিসেবকষে কান্তিকুমারের মাথার ভেতর পিষ্টনগুলি যখন ক্ষয়ে গিয়ে ঝিমঝিম করতে থাকে, ঘাড়ের কাছে স্নায়ুর গিঁটগুলিতে স্পার্কের শক লাগে, বুকের ভেতর ফ্যানবেল্ট ছিঁড়ে গিয়ে দম ফুরিয়ে আসে - তখন ছুটি হয়। পরশ্রমজীবী মানুষের কর্মশালায় মানুষও যন্ত্রের সামিল হয়ে উঠেছে।[৪৫]

চার

নর-নারীর প্রেম-ভালবাসা সমস্ত ভাষার কথাসাহিত্যেরই এক অমূল্য, অশেষ এবং অন্যতম ভান্ডার। কথাশিল্পী সুবোধ ঘোষও স্বভাবতই আহরণ করেছেন অনেক মণি-মুক্তো এই ভান্ডার থেকে। অরুন কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'প্রেমের বিচিত্র রূপ নিয়ে গল্প লেখায় সুবোধ ঘোষের জুড়ি মেলা ভার।'[৪৬] একথা সত্যি। তাঁর রচিত বেশ কিছু প্রেমের গল্প বাংলা কথাসাহিত্যে সত্যি সত্যিই মনিমুক্তো হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে গল্পগুলোতে পরিবেশিত প্রেম-ভালবাসার বিচিত্রতায়, পাত্র-পাত্রী এবং পরিপ্রেক্ষিত নির্বাচনের বৈচিত্র্যে।

সুবোধ ঘোষ তাঁর প্রেমের গল্পগুলোতে একজন অভিজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিকের মতই পাত্র-পাত্রীর হৃদয়ের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করেছেন তাঁর নিজস্ব শৈলীতে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে-সুবোধ ঘোষের মনস্তত্ত্ব বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশুনো ও বিস্তর জ্ঞান ছিল।

সুবোধ ঘোষের বিভিন্ন গল্প পড়ে বারে বারেই মনে হয়েছে লেখক সুবোধ ঘোষকে মনস্তাত্ত্বিক সুবোধ ঘোষ বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে সুবোধ ঘোষের অসাধারণ জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর গল্পগুলোকে এক নতুন মাত্রা দান করেছে। এ ধরণের বিশেষ বিশেষ গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক সুবোধ ঘোষের বিষয়টি প্রাসঙ্গিকভাবেই উঠে আসবে।

এই পর্বে, সুবোধ ঘোষের কয়েকটি বহুপঠিত এবং বহুচর্চিত প্রেমের গল্প নিয়ে আলোচনা করে, ছোটগল্পের এই অন্যতম প্রধান শাখায়, লেখকের স্বতন্ত্রতার সন্ধান কোরব। এই গল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে — ঠগিনী, অভ্যর্থনা, চিত্তচকোর, জতুগৃহ, মনোলোভা, শুক্লা নবমী, শুক্লাভিসার, সুনিশ্চিতা, মানশুক্লা, চোখ গেল, দিগঙ্গনা, জয়ন্তী, থিরবিজুবী ইত্যাদি।

ঠগিনী গল্পে, বাবা ঠগ ও তার মেয়ে সুধা ঠগিনী। এক বিচিত্র বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে গল্পটি। বাবা সনাতন যোগাযোগ করে সুধার বিয়ে ঠিক করে। বিয়ের পর বাবা আর মেয়ে, জামাই এর বাড়ি থেকে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট দেয়। আবার বিয়ে ঠিক হয়, আবার চুরি, আবার চম্পট। তারকেশ্বর, বসিরহাট ও ভাটপাড়ার একজন করে ইতিমধ্যেই শিকার হয়েছে পিতা-পুত্রীর। এরপর একই লক্ষ্যে রাণাঘাটের রমেশকে বিয়ে করে সুধা। কিন্তু এবার রমেশের অবুঝ ভালবাসার জোয়াড়ে পরতে পরতে ভেঙে পড়ে ঠগিনীর অন্তর। রমেশের ভালবাসার ছোঁয়ায় নারীমনের শাশ্বত ঘর বাঁধার স্বপ্ন মাথা খুঁড়ে মরে ঠগিনীর অন্তরে। সুধা ওরফে করবীর অন্তর কিছুতেই ঠকাতে চায় না রমেশকে। সে চিত্রকর রমেশকে তার প্রকৃত পরিচয় জানাতে দ্বিধা করে না —

> আমি তোমাকে ঠকাতে এসেছি। আমি তোমার স-জাত নই, আমি করবী নই, আমি কুমারী নই। ...আমি হলাম... আমি এক ভয়ংকর বাপের ভয়ংকর মেয়ে। আমি তোমার ঘর করতে তোমার কাছে আসিনি, পালিয়ে যাবার জন্যই এসেছি।[৪৭]

সমস্ত জেনেও করবীকে যেতে দিতে চায় না রমেশ। কারণ সে প্রকৃতই ভালবেসেছে করবীকে। হোক সে ঠগিনী, হোক সে অন্য জাতের, না থাকুক তার কুমারীত্ব। ঠগ সনাতনের হাত থেকে বাঁচতে, করবীর পরামর্শে রমেশ তাকে নিয়ে সেই রাত্রেই বাগবাজারের বাসা গুটিয়ে চলে যায় এক অজানা ঠিকানায়, যার খোঁজ সনাতন কখনো পাবে না। মিথ্যার ঘাটে ঘাটে নোঙর করা এক নারী তার সংসারের ঠিকানা পেল, জয়ী হল ভালবাসা।

ঠগ বাপকে ঠকিয়ে ঠগিনী মেয়ের ভালবাসার এই জয়, সুবোধ ঘোষের বিষয় বৈচিত্র্যের প্রতি পাঠককে শ্রদ্ধান্বিত করে তোলে।

'অভ্যর্থনা' গল্পে সুবোধ ঘোষ প্রকৃতই একজন মনোবিজ্ঞানী। একটি শিক্ষিত এবং পরিণত নারী হৃদয়ও কি ভাবে আত্মাহঙ্কারে নিমজ্জিত থাকে তা লেখক খুলে দেখিয়েছেন পাঠককে। এক নির্জন বনপথে নমিতা ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়ায়। সে বাধাবন্ধহারা। কিন্তু ঐ একই বনপথে এক অপরিচিত ভদ্রলোকের নিয়মিত যাতায়াত বড়ই বেমানান এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনে হয় নমিতার। নমিতার সহজাত অহংকারী নারী অন্তর ক্রমশ বিশ্বাস করে যে ভদ্রলোক তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে তাকে দেখার জন্য ঐ একই সময়ে একই পথে ঘুরে বেড়ায়। নমিতা বিরক্ত হয়। কখনো ভাবে দুকথা শুনিয়ে দেবে, কখনো ভাবে ভদ্রলোকের এই হ্যাংলামোর স্পষ্ট প্রতিবাদ করে তাকে অপমান করবে আবার কখনো ভাবে পুলিশে খবর দিয়ে তাকে শায়েস্তা করবে।

যে দিন একান্ত নিরালায় ভদ্রলোকের হাতে এক মস্ত ফুলের তোড়া দেখতে পায় নমিতা, সে দিন তার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙে, সে প্রতিবাদ করে —

> অসভ্যতা করবার আর জায়গা পাননি ?
> — আমাকে বলছেন ?
> — হ্যাঁ, এই পাথরটাকে বলছি না।
> — আমাকে এ কথা বলছেন কেন ?
> — আপনি কোন সাহসে ফুল নিয়ে এসেছেন ? আমি আপনার ফুল হাতে তুলে নেব, এমন বিশ্বাসের স্পর্ধা কোথায় পেলেন ?
> — আমি আপনাকে ফুল দিতে আসিনি।
> — কি বললেন ?
> — আপনি কোথা থেকে এমন সন্দেহ করার স্পর্ধা পেলেন যে, আমি আপনার জন্য ফুল নিয়ে এসেছি ?[৪৮]

প্রকৃতপক্ষে ভদ্রলোক সেদিন এসেছিলেন ঐ জঙ্গলেই তাঁর মায়ের সমাধিতে ফুল দিতে। তার আগে বেশ কদিন নিয়মিত এসেছিলেন, ঐ সমাধির চারপাশে অযত্নবর্ধিত-আগাছা এবং কাঁটাগাছ পরিস্কার করতে। গত কুড়ি বছর ধরে এ সময়টাতে তিনি আসেন এবং মায়ের মৃত্যুদিবসে তাঁর সমাধিতে ফুল দিয়ে যান।

গল্পের পরবর্তী অংশে আমরা নমিতাকে অন্যরূপে দেখতে পাই। নমিতা ক্ষমা চায়। নমিতা ভদ্রলোকের ফুলের থেকে অর্ধেকটা চেয়ে নিয়ে, পাশাপাশি হেঁটে সমাধিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ফুল রাখে। তারপর দুজনেই একসঙ্গে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করে।

এই গল্পে নমিতা ভদ্রলোকের কাছে ক্ষমা চেয়ে ত্রুটি সংশোধনের সদিচ্ছা প্রকাশ করে, তার শিক্ষিত, পরিশিলিত রুচির এবং আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দেয়। বাংলা ছোটগল্পে নমিতা আধুনিক নারী অন্তরের এক অনাঘ্রাত সুবাস।

শুধুমাত্র ঠগিনীর সুধা বা অভ্যর্থনার নমিতাই নয়, সুবোধ ঘোষ তাঁর ছোটগল্পে প্রায় সমস্ত নারীচরিত্রগুলোকেই অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন। নিত্য নতুন বিষয়বস্তুর সন্ধানে ক্লান্তিহীন সুবোধ ঘোষ নিম্নবর্গ থেকে উচ্চবর্গ পর্যন্ত অসংখ্য নারী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। লক্ষ করার মত বিষয়, একদিকে তিনি যেমন নারীমহলের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে বেশকিছু আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারী চরিত্র সৃষ্টি করে, বাংলার নারীকে সমস্যা, সংস্কার এবং অশিক্ষার জাল ছিঁড়ে আসার পথ দেখিয়েছেন, উৎসাহও জুগিয়েছেন।

'চিত্তচকোর' — এক মনপাখি যা চন্দ্রসুধায় আকন্ঠ নিমজ্জিত থাকে। গল্পটি এমন এক সময়ের

প্রেক্ষিতে রচিত যখন সমাজে মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে বাইরে বেরোনোর এক অস্পষ্ট আহ্বান শুনতে পেয়েছে মাত্র, কিন্তু বেরোবার পথ ও সাহস খুঁজে পায়নি। তখন সমাজজীবনে মেয়েদের হাসি-কান্না, প্রেম-ভালবাসা, সমস্তই সংসারের প্রয়োজনে এবং অভিভাবকদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাতেই আবর্তিত হোত। চোখের জল এবং লুকোনো দীর্ঘশ্বাসই ছিল সে সময়ে বাংলার মেয়েদের সমস্ত ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার এক স্বাভাবিক পরিণতি। — চিত্তচকোরের নায়িকা অনিমা অভিভাবকদের অনুরোধে সৌরভকে হেসে স্বাগত জানালেও, তার পছন্দের স্টেনো-টাইপিষ্ট বিনয়কে ফিরিয়ে আনতে স্টেশানে যায় নিজের হৃদয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে। সৌরভকে স্বাগত জানাতে বাধ্যতামূলক 'সকালের হাসিটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, সন্ধ্যায় বিনয়ের জন্য অনিমার হৃদয়ের বোবা কান্না'কেই জিতিয়ে দিয়েছেন সুবোধ ঘোষ তাঁর আধুনিক মানসিকতায় এবং কুশলী পরিবেশনায়।'[৪৯]

নর-নারীর প্রেমের বিচিত্র রূপের বিভিন্ন প্রকাশ বাংলা কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে এসেছে দীর্ঘদিন থেকেই। কিন্তু বিষয় ও আঙ্গিকের দৃষ্টিকোন থেকে, প্রেমের বিচিত্র গতি প্রকৃতিকে, সুবোধ ঘোষ রূপ দিয়েছেন নুতন ভাবে। 'জতুগৃহ' – গল্পে শতদল ও মাধুরীর হঠাৎ দেখা এক অখ্যাত রেল ষ্টেশানের ওয়েটিংরুমে বিবাহ বিচ্ছেদের পাঁচ-সাত বছর পর। ইতিমধ্যে দুজনেরই জীবনে নতুন সঙ্গী এসেছে। গোটা গল্পটিতে এক অপ্রস্তুত পরিস্থিতিতে দুজনই তাদের টুকরো টুকরো আলাপচারিতার মাধ্যমে অন্তরঙ্গ অতীতের সলজ্জ স্মৃতিচারণ করে। মাধুরীকে শতদলের অবোধ প্রশ্ন – 'তুমি ভুলতে পেরেছ আমাকে ?'[৫০] না। ভুলতে অবশ্যই পারেনি তবে স্পষ্টভাবে এক কথায় উত্তরও দিতে পারেনি মাধুরী। গল্পের উপসংহারটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে —

> ওয়েটিংরুমের টেবিলের ওপর একটি ট্রে, তার ওপর পাশাপাশি দুটি শূন্য চায়ের পেয়ালা। কোথা থেকে কারা দুজন এসে, আর পাশাপাশি বসে তাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে চলে গেছে। রাজপুর জংশন আবার ঘুমিয়ে পড়ার আগে বয় এসে তুলে নিয়ে যাবে, ধুয়ে মুছে সাজিয়ে রেখে দেবে, একটা পেয়ালা কাবার্ডের এই দিকে, আর একটা হয়ত একেবারে ঐ দিকে।[৫১]

এই জতুগৃহে গল্পটি সম্পর্কে হুমায়ুন কবিরের মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। —

> বস্তুতপক্ষে প্রতিপাদ্য বিষয়ের বদলের সঙ্গে সঙ্গে রচনা ভঙ্গী যে কিভাবে বদলায়, সুবোধ ঘোষের রচনায় তার পরিচয় পদে, পদে মেলে। সুবোধ ঘোষের গল্প পড়তে পড়তে বারে বারে মনে হয় যেন চোখের সামনে ছায়াচিত্রের খেলা চলছে। স্তরের পর স্তর উদ্ঘাটিত হয়ে ওঠে। তাতে কিন্তু গল্পের আসল প্রাণ গোপন থাকে। হঠাৎ একটি চিত্র জীবন্ত হয়ে চোখের সামনে ধরা দেয় – সিনেমাতে যেমনভাবে ক্লোজ-আপ নায়ক বা নায়িকার হৃদয়বৃত্তির কোন বিশেষ প্রকাশকে মূর্ত করে তোলে, তেমনিভাবে এই আকস্মিক প্রকাশে গল্পের প্রাণরূপ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
>
> সুবোধ ঘোষের অনেক গল্প থেকেই হয়ত এ কথার যথার্থতা প্রমাণ করা যায়। কিন্তু 'জতুগৃহ' গল্পে এ রচনাভঙ্গি যেমন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তার তুলনা বেশী মিলবে না। এক হিসেবে, গল্পের বিষয়বস্তু অতি সামান্য। এককালে বিবাহিত কিন্তু অধুনা বিচ্ছিন্ন দুটি নর-নারীর রেল ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে খানিকক্ষণের জন্য সাক্ষাৎ হল। সেই আকস্মিক মিলন তাদের অতীত জীবন উদ্ভাসিত করে তোলে, তাদের আধুনিক মনোভাবও ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার ইঙ্গিত এনে দেয়।

বর্তমানে পৃথিবীর সর্বদেশে জীবন যেভাবে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে, পুরোনো জীবনযাত্রার ভঙ্গী ভেঙে পড়েছে, অথচ তার স্থানে এখনো কোন নতুন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি, যুগসন্ধির এই অব্যবস্থা প্রকাশের জন্য সিনেমার চিত্রভঙ্গী উপযুক্ত বাহন।

রূপদক্ষ শিল্পীর হাতে সেই চিত্রভঙ্গী কথা সাহিত্যের মধ্যেও ফুটে উঠেছে।[৫২]

নর-নারীর প্রেম-ভালোবাসা কখনোই সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলেনা। অথচ আমাদের সমাজে ভদ্র পরিবারে যে শৃঙ্খলাপরায়ণতার কথা বলা হয় তাতে প্রেমই কুন্ঠিত হয়ে নির্জীব হয়ে পড়ে। এই গল্পে উচ্চবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবনে প্রেমের সঙ্গে নিম্নবিত্ত সাধারণ সমাজের প্রেমের একটা বিরোধ তৈরি করে লেখক প্রেমের প্রকৃতি নির্দেশ করেছেন।

উচ্চবিত্ত পরিবারের জীবন যে সজীব কিছু নেই কেবল শৃঙ্খলায় আর আনুষ্ঠানিকতায় একটা বৈচিত্রহীন জড়ত্বে পরিণত হয়েছে এ গল্পে তার দৃষ্টান্ত আছে। অন্যপক্ষে প্রেমের ভিতরেই আছে এই জড়ত্বের হাত থেকে মুক্তি। তাই রমেশ এবং সুধার বৈপরীত্যে মিতা এবং মৃগেন জীবনকে আবিষ্কার করে। প্রেমই এখানে জীবনে নবীনত্ব আনে। মানবীয় প্রেমকে কঠোরভাবে শৃঙ্খলাপরায়ণ করার চেষ্টা প্রেমকেই প্রাণহীন করে তোলে। প্রেমের উচ্ছলতাতেই প্রেম বর্ণময়। সুবোধ ঘোষ মনোলোভা গল্পে এই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন দুই বিপরীতধর্মী পরিবারকে উপস্থিত করে।

মৃগেন আর মিতা। আপাত সুখী এই দম্পতির একমাত্র পুত্রসন্তান সুইট। মৃগেন যথেষ্ট পদমর্যাদা এবং ঐশ্বর্যের অধিকারী।

টাকার সুখ আর সুরুচির সুখকে রঙিন করে নিয়ে এবং সব রং হাসি গান ও ভাষাকে, পারিবারিক কর্তব্যকে, সব উদ্বেগ আগ্রহ ও কৌতুহলকে এক শান্ত ছন্দ দিয়ে পরিপাটি করে রাখতে পেরেছে মৃগেন বিশ্বাস আর মিতা বিশ্বাস। ওরা সুখী।[৫৩]

এই একান্ত পরিশীলিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনে সামান্য ছন্দপতনও তাদের অন্তরে অপরাধবোধের সৃষ্টি করে।

এক সন্ধ্যায় লনের উপরে একটা শুকনো পাতা সিরসির করে মিতার পায়ে লেগেছিল সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে আর ভয়ে শিউরে উঠে একটা লাফ দিয়ে সরে গিয়েছিল মিতা। নিজেরই উপর রাগ করে আর লজ্জায় রুমালে মুখ ঢেকেছিল মিতা। মৃগেনেরও দেখতে ভাল লাগেনি। ভয় পেলেই কি এভাবে নিজেকে বিশ্রী করে দিতে হয় ?[৫৪]

মৃগেন ও মিতার জীবনে প্রাত্যহিক প্রেম ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটে-কঠোর নিয়মে ও শৃঙ্খলার অনুশাসনে।

...সকাল ছ'টা থেকে আটটার মধ্যে যে যার প্রসাধন সেরে ফেলে। ঠিক নটা পর্যন্ত মিতার হাতে হাত রেখে বসে থাকে মৃগেন। মিতা ঠিক দুবার হাসে। মৃগেন যখন বলে – ভাল ঘুম হয়েছিল তো মিতা, তখন একবার। আর একবার ঠিক নটার সময় চেয়ার ছেড়ে যখন উঠে দাঁড়ায় মৃগেন, তখন মিতার মুখে ঝিক্ করে হাসি ফুটে ওঠে। মিতা বলে – তোমার ঘুম হয়েছিল তো ?[৫৫]

শুধু স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক নয়, একমাত্র সন্তানের প্রতি তাদের স্নেহ ভালবাসাও নিটোল ছন্দে বাঁধা।

—'আয়ার হাত ধরে সুইটও ঠিক নটায় বাপ-মার কাছে এসে দাঁড়ায়। একবার মৃগেন আর একবার মিতা সুইট্‌কে চুমো খায়।'[৫৬] অতি শৃঙ্খলাপরায়ণ আর অতিসচ্ছল এই সংসারে এসে উপস্থিত হয় মৃগেনের গাড়ির নবনিযুক্ত চালক রমেশ ? স্ত্রী সুধা এবং সুইটের সমবয়সী পুত্র টোটোকে সঙ্গে করে। আপাদমস্তক দারিদ্র্যচিহ্নযুক্ত এই পরিবারটিকে মনুষ্যপদবাচ্য বলে মনে করেনি বিশ্বাস দম্পতি। রমেশ ও সুধা যেন বিপরীত প্রান্তের বাসিন্দা। তাদের অভাব আছে কিন্তু উচ্ছল ভালবাসার অন্ত নেই। বাঁধভাঙা এবং সত:স্ফূর্ত ভালবাসার ঐশ্বর্য দিয়ে প্রতিদিনের দারিদ্র্যকে পরাজিত করে অবলীলায়। চুপিসারে রমেশ ও সুধার বাধাবন্ধহারা প্রেমের প্রকাশ আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যক্ষ করে অবাক হয় মৃগেন ও মিতা। মিতা রমেশের সঙ্গে ঘনিষ্ট হতে চেষ্টা করে, মৃগেন সুধার সঙ্গে। মিতা রমেশকে নিয়ে আলাদাভাবে বেড়াতে যেতে চায়। মৃগেন সুধার সঙ্গে সহাস্য আলপচারিতার সুযোগ খোঁজে। এদিকে সুইট্ চুরি করে টোটোর নোংরা পুরোনো কমদামী এক পুতুল।

> আলামারিতে ভরা খেলনা আছে যার, যার এরোপ্লেন স্প্রিং-এ দম পেলেই লনের উপর বাতাসে তিনটি চক্কর দেয়, সে চুরি করবে রমেশ ড্রাইভারের গালফুলো ছেলেটার এক নোংরা পুতুল ?[৫৭]

বিত্তবান মৃগেন ও মিতার অন্তরের দৈন্য আর সুইটের খেলনার অভাববোধ যেন একই সুরে বাঁধা। বম্বের মালাবার হিল্‌সের অতি সচ্ছল পরিবারটি তখন নি:স্ব, রিক্ত। এই অব্যক্ত যন্ত্রনা থেকে তাদের মুক্তি দিয়ে, রমেশ ও সুধা টোটোর হাত ধরে, ময়লা বিছানা ও টিনের বাক্সয় ভরা সংসার মাথায় নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে পথে। শত ঐশ্বর্যের লোভেও, তাদের ভালবাসার অন্তরসম্পদে কাউকে সামান্য ভাগ দিতেও রাজী নয় রমেশ ও সুধা।

প্রেমের গল্প লিখতে গিয়ে সংসারে স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার ব্যবহারিক রূপটি সুবোধ ঘোষ বিশ্লেষণ করেছেন 'শুক্লা নবমী'তে। শেষের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের অমিত বলেছিল —

> কেতকী...সে যে ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যের সঙ্গে আমার যে ভালবাসা সে রইল দিঘি; সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।[৫৮]

প্রেমিক-প্রেমিকার স্বপ্নের ভালবাসার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর আটপৌরে ভালবাসার পার্থক্যটা সুস্পষ্ট হয় অমিতের উক্তিতে। শুক্লা নবমীতে সুবোধ ঘোষ স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার বন্ধনের সেই মূল সূত্রটি নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। তিনি পরিস্কার করে বলতে চেয়েছেন স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার বন্ধন যেন অলঙ্কারের সোনা। একশ শতাংশ বিশুদ্ধ সোনা নয়। বিশুদ্ধ সোনার বাজারদর যত বেশীই হোক, তা গহনা তৈরীর উপযুক্ত নয়। গহনা তৈরীর জন্য তাতে কিছুটা খাদও মেশাতে হয়। নইলে সে সোনা ব্যবহারের উপযুক্ত হয় না। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসাকে কেন্দ্র করে যে এক একটি সংসার, এক একটি ছোট পৃথিবী গড়ে ওঠে, তাতেও কিছুটা খাদ দরকার প্রেমকে একটি ব্যাবহারিক এবং আটপৌরে রূপ দেবার জন্য। ব্যবহারিক ভালবাসার সে খাদ পারস্পরিক শ্রদ্ধা।

এই মূল বক্তব্যের পাশাপাশি শুক্লা নবমী ছোটগল্প হিসেবে নানা কারণে অভিনবত্বের দাবী করতে পারে। গল্পের মুখ্য চরিত্র ললিতা কখনো স্বামী সোহাগিনী, কখনো তার অন্তরে স্বামীর জন্য শুধুই একবুক ঘৃণা আবার একই ললিতা স্বামীর কোলে মাথা রেখে মরণ-সুখের স্বপ্ন দেখে।

ললিতা চরিত্রের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিত্ত চঞ্চলতা, ও আদর্শ ভাবনা যা সমাজ বিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানীদের গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হতে পারত, তা-ই সুবোধ ঘোষের পরিবেশনের

গুণে একটি সুখপাঠ্য ছোটগল্পে উন্নীত হয়েছে। হৃদয়ের গূঢ় তত্ত্বে ভরপুর এ গল্প তাই পাঠকের কাছে গুরুপাক হয়ে ওঠে নি, বরং সাহিত্য রসসিক্ত হয়ে পাঠককে জীবন ও আদর্শ নিয়ে কিছুটা ভাবনা চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

এ গল্পের জন্য যে বিষয়বস্তু, যে পরিবেশ বেছে নেওয়া হয়েছে, যে ভাবে সুবোধ ঘোষ একটি ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবারের দীর্ঘ ১৫/২০ বছরের অবক্ষয়ের আনুপূর্বিক বর্ণনা করেছেন, যে ভাবে মধ্যবিত্তের মূল্যবোধকে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে কষ্টিপাথরে যাচাই করেছেন – তাতে শুক্লা নবমী একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস হতে পারত। অন্তত একটি উপন্যাসের উপাদানের কোন ঘাটতি ছিল না এই গল্পের কাহিনীতে।

অন্য যে একটি কারণে গল্পটিকে অভিনব মনে হয়, তা হলো এর বিশেষ পরিবেশন ভঙ্গি। ললিতা ছাড়া দ্বিতীয় কোন চরিত্র এ গল্পে সরাসরি কথা বলেনি। আদর্শবাদে বিধ্বস্ত চারুবাবুর যে দু-চারটি কথা এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, তাও আমরা শুনি ললিতার জবানীতেই। 'আইডিয়ালিস্ট' স্বামী চারুবাবুর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা সম্পূর্ণ হারিয়ে স্ত্রী ললিতা রিক্ত। এক অর্থহীন সিঁদুরের চিহ্ন বহন করে, স্বামীর প্রতি একবুক ঘৃণা নিয়ে ললিতা বেঁচে আছে মরার জন্য। কিন্তু শুরুটা এমন ছিল না। চারুবাবুর আদর্শবাদের প্রতি তখন স্ত্রীর শ্রদ্ধা ছিল, চারুবাবুর যথেষ্ট বিষয় সম্পত্তিও ছিল। ছিল হীরের আংটি, ব্যাঙ্কের পাশ বই, পৈত্রিক বাড়ি সবই। কিন্তু দেশসেবা, সমাজ সংস্কার ইত্যাদির জন্য দরাজ হাতে খরচের বহরে – চারুবাবুর স্ত্রীকে নিয়ে উঠতে হয়েছে কুড়ি টাকা মাসিক ভাড়ায় সালকিয়া বাজারের এক গলিতে।

দশ বছর বয়সের একমাত্র ছেলে পল্টু শুকিয়ে মারা যায় বিনা পথ্যে বিনা চিকিৎসায়। গায়ের শেষ গয়নাটি বিক্রী করেও ললিতা বাঁচাতে পারেনি পল্টুকে। একটু পথ্য ও চিকিৎসার দাবীদার পল্টু যেন রেহাই দিয়ে গিয়েছে তার আদর্শবাদী পিতাকে। দেশভক্তি ও পরোপকারের যে আদর্শের জন্য একদিন নববধূ ললিতা পরম বিস্ময় এবং অসীম শ্রদ্ধায় স্বামীর মধ্যে এক মহাপুরুষকে প্রত্যক্ষ করেছিল, আদর্শবাদের ভয়াবহ পরিণতিতে স্বামীকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে দিতেও ঘৃণা হয় তার। অদ্ভুত চরিত্র ললিতার। কখনো সে স্বামী সোহাগিনী, কখনো স্বামীর আদর্শবাদকে নিজ সংসারের করুণ পরিণতির জন্য দায়ী করে, কখনো স্বামীকে আদর্শচ্যুত ভেবে অন্তরে পোষন করে এক বুক ঘৃণা, আবার কখনো রিক্ত স্বামীর মধ্যে আদর্শের উপস্থিতি আবিস্কার করে – স্বামীর কোলে মাথা রেখে মরতে চায়।

একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় স্বামীর প্রতি ললিতার প্রগাঢ় ভালবাসা গড়ে উঠেছিল স্বামীর স্বদেশীয়ানার আদর্শকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সেই আদর্শই ললিতার চরম শত্রু হয়ে দাঁড়াল যখন সেই আদর্শজাত দারিদ্র্য তার সংসারকে সালকিয়ার গলিতে এসে নামাল এবং কেড়ে নিল ছেলেকে। এ পর্যন্ত ললিতা ঘেন্না করেছে সেই আদর্শকে, কিন্তু মানুষ চারুবাবুকে নয়। স্বামী চারুবাবুও ললিতার কাছে চরম ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠল সেদিন, যেদিন ললিতা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করল, চারুবাবু চালাকি করে পরের অন্ন ধ্বংস করে আরামে পান চিবোচ্ছেন। সংশয়াপন্ন ললিতার একান্ত আত্মজিজ্ঞাসা – তবে কি মানুষটির এতদিনের আদর্শবাদ সবই মিথ্যা! গল্পের শেষে দেখি, প্রকৃত অর্থে উপোস করার জন্য থালা-বাটি বিক্রী করে খাবার জোগাড় করেও, খাবার গ্রহণ করেন নি চারুবাবু। সত্যিকার উপোস করেছেন। এটা কি পাগলামো? না। চারুবাবুর যুক্তি '...ঘরে খাবার না থাকলে সত্যি সত্যিই তো আর ব্রতের উপোস হয় না।'[৫৯]

গল্পের শেষাংশে দেখি শ্রদ্ধার পথ বেয়ে স্বামীর প্রতি ভালবাসা ফিরে এসেছে ললিতার অন্তরে – দারিদ্র্যের অন্ধকার, ললিতার ফিরে পাওয়া ভালবাসার আলোকে আর গ্রাস করতে পারেনি। চারুবাবুর

ব্রতের উপোসের পর ললিতার উপলব্ধি দিয়েই গল্পটি শেষ হয়েছে। ললিতা বলেছে —

> তারপর কি হয়েছিল সব মনে নেই। শুধু এইটুকু জানি যে, সে রাত্রে ভোর হবার আগে ঘুম ভেঙেছিল। বুঝলাম, স্বামীর বুকের কাছে মাথা রেখে শুয়ে আছি। ঘরের ভেতরে প্রদীপটা তখনো জ্বলছিল। মনে হলো, শুক্লা নবমীর চাঁদ থেকে একমুঠো আলো এসে পড়েছে আমার জীবনের বাসর-ঘরে। স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকালাম। দেখলাম ইনিই তো সেই।
>
> সকাল হলে বিছানা ছেড়ে উঠলাম। হেঁসেলে ঢুকতেই দেখলাম, বিড়ালে সব খাবার খেয়ে চলে গেছে।
>
> তার পরের ঘটনাগুলো আপনাদের শোনাবার আর প্রয়োজন হবে না। আমি বেঁচে আছি মরবার জন্য, এবং বিশ্বাস করি স্বামীর কোলে মাথা রেখে যদি মরি, তবে সে মরণ বড় সুখেরই হবে।[৬০]

কাজেই স্বামীর প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধা হারিয়ে যে ললিতা অন্তর সম্পদে নি:স্ব হয়ে গিয়েছিল, উপোসের ঘটনার পর সেই ললিতার অন্তরেই চারুবাবুর অধিষ্ঠান হয় কাঙ্খিত শ্রদ্ধার আসনে। চারুবাবুর প্রতি সশ্রদ্ধ ভালবাসায় ললিতা তার পূর্ণতা ফিরে পায়।

শুক্লাভিসার-এ এই একই শ্রদ্ধান্বিত ভালবাসার জয়গান করেছেন সুবোধ ঘোষ। শুক্লাভিসার অবশ্যই প্রেমের গল্প। তবে এই প্রেমের বিষয়বস্তু, পাত্র-পাত্রী এবং পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণেও বৈচিত্র্য রয়েছে। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে — 'সুবোধ ঘোষের গল্পে প্রেম আসে নি:শব্দ চরণপাতে, শিউলিফুলের মত, জ্যোৎস্নার মত, ভোরের মত। বরুত্রীর প্রতি ত্রিপাঠীর ভালবাসা সেভাবেই এসেছে।'[৬১]

শুক্লাভিসারের কাহিনী বিশ্লেষণে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ হয়। একনিষ্ঠ সমাজ সেবক দেবল ত্রিপাঠী। বোম্বাইয়ের দাদারে সুদর্শন ত্রিপাঠী এক ধর্মশালায় আবিষ্কার করে অসহায়, অল্পবয়সী বাঙালী বিধবা বরুত্রীকে। বরুত্রীকে সসম্মানে বাঁচার পথ দেখায় ত্রিপাঠী। হরিজন মেয়ে স্কুলের দায়িত্ব দেয় বরুত্রীকে। ত্রিপাঠীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় এবং তার সমাজসেবার প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠায় শ্রদ্ধান্বিত হয়ে বরুত্রী ত্রিপাঠীর প্রতি ভালবাসার টান অনুভব করে। কিন্তু তার এই অস্ফুট ভালবাসার পত্যুত্তরে কোন পরোক্ষ প্রশ্রয়ও বরুত্রী পায় নি কাজ পাগল ত্রিপাঠীর কাছ থেকে।

ত্রিপাঠীর সেবার আদর্শকে আঁকড়ে ধরে এগিয়ে চলে বরুত্রী। 'ত্রিপাঠী চলেছে আগে আগে, বরুত্রী তার পেছনে। মাঝে বেশ খানিকটা মহত্ত্বের ব্যবধান। বড় বেশী তীক্ষ্ণ উদার উঁচু মাথার মহত্ব। তিলমাত্র হৃদয়ের তাপ নেই।'[৬২]

বছর পার না হতেই বরুত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয় বনেদী এবং বিত্তবান পুস্কর। মাঝে মাঝেই বরুত্রীর আদর্শের অংশীদার হতে হাঁপিয়ে ওঠে পুস্কর। জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর বরুত্রী, এই সব দু:খ দূর করা সম্ভব ?'[৬৩] তবে হৃদয়ের উত্তাপ বিকিরণে পুস্কর ত্রিপাঠীর তুলনায় অনেক প্রাণবন্ত। ক্রমশ দুর্বল হয় বরুত্রী। বরুত্রী-পুস্করের মেলামেশায় কোন আপত্তি না করে, ত্রিপাঠী বরুত্রীকে তার আদর্শ সম্পর্কে সচেতন করে দেয়। কাজের প্রয়োজনে দাদারের বাইরে চলে যাবার আগে ত্রিপাঠী বরুত্রীকে বলে — 'ফিরে এসে হয়তো দেখবো, তোমরা দুজনে বিবাহিত জীবনে সুখী হয়ে রয়েছ। ভালই হবে। আমারও তাই ইচ্ছে। তবে স্কুলটা যেন ঠিক থাকে বরুত্রী।'[৬৪]

ইতিমধ্যে পুস্কর তার পছন্দমত চাকুরী পায়। বরুত্রীকে নিয়ে যেতে চায় তার কর্মস্থলে, আলমোড়ায়। বরুত্রীর সমাজসেবা তার কাছে নিতান্তই একটি সামান্য চাকুরী। কিন্তু বরুত্রী আদর্শচ্যুতা হতে পারে না। অন্ত:সত্ত্বা বরুত্রী ত্যাগ করে পুস্করকে। পুস্করের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে নিজেকে আদর্শচ্যুত এবং

স্কুলের সম্মান রক্ষার অনুপযুক্ত মনে করে বরুত্রী বিদায় চাইলো ত্রিপাঠীর কাছে। কিন্তু ত্রিপাঠী তাকিয়ে রইল বরুত্রীর মুখের দিকে।

> পাথর ছড়ানো কাজের পথে এতদিনে যেন একটি স্ফটিক আবিষ্কার করেছে ত্রিপাঠী। দুরন্ত লোভীর মত দৃষ্টিটা চক্‌চক্ করছিল ত্রিপাঠীর।[৬৫]

বরুত্রীকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে, তার গর্ভস্থ পুষ্করের সন্তানকে নিজ সন্তানের সামাজিক স্বীকৃতি দিয়ে দেবল ত্রিপাঠী তার ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে মহিমান্বিত করে মনুষ্যত্বকে।

এ গল্পে প্রেমের প্রকারভেদ লক্ষ্য করার মত। আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে দেবল ত্রিপাঠীকে ভালবেসেছিল বরুত্রী। বরুত্রী তার ভালবাসার কোন সমর্থন বা প্রশ্রয় ত্রিপাঠীর কাছে প্রথমে পায়নি। কারণ সমাজসেবার আদর্শের প্রতি তার নিষ্ঠা তখনও প্রমাণ হয়নি। কিন্তু বরুত্রী যখন তার সেবার আদর্শকে আঁকড়ে ধরে, পুষ্করের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেও পুষ্করকে ত্যাগ করে অবিচলিতভাবে, তখন তার আদর্শনিষ্ঠা প্রমাণিত। সেই আদর্শনিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়েই ত্রিপাঠী বরুত্রীকে জীবনসঙ্গী করে নেয়। কাজেই বরুত্রী এবং দেবল ত্রিপাঠীর প্রেম পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অন্যদিকে পুষ্কর বরুত্রীকে ভালবেসে তার সমাজসেবার আদর্শকে শ্রদ্ধা করার চেষ্টা করে মাত্র বরুত্রীকে লাভ করার জন্যই। সে কারণেই পুষ্কর বরুত্রীর আদর্শকে গ্রহণ করতে পারেনি। হৃদয়ের উষ্ণতায় বরুত্রীকে কাছে পেয়েও, তাকে হারিয়েছে পুষ্কর, কারণ তাদের দুজনের আদর্শ ও পথ ভিন্ন, একজনের আদর্শের প্রতি অন্যজনের শ্রদ্ধা নেই। তাদের ভালবাসা স্থায়িত্ব লাভের জন্য উপযুক্ত শ্রদ্ধার আসন পায়নি।

এর পাশাপাশি মনে করা যায় পারমিতা গল্পটির কথা। সেখানে বিধবা পারমিতা মজুমদার হাউসে ঠাঁই পেয়েছিল। তারপর দীর্ঘদিন মনোময়ের ডাক পাবার জন্য প্রতীক্ষায় মজুমদার হাউসের শূণ্যতা ভালবাসায় ভরিয়ে দেবার কাজে অনেক দিন কাটিয়ে দিয়েছে। অবশেষে ডাক এলো। তখন পারমিতার বুকের মধ্যে ঝড়। এতদিনের প্রতীক্ষা আজ সার্থক হতে যাচ্ছে। মনোময়ের ডাক এসেছে। 'আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখের ছবির দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরের উতলা বাতাসটাকে চেপে'[৬৬] রেখে মনোময়ের দরজায় এলো পারমিতা। আর তার পরেই পারমিতার প্রতীক্ষার প্রহরগুলি খানখান করে ভেঙে পড়ল মনোময়ের এক কথায়। মনোময় তার বন্ধুদের সামনে পারমিতাকে নাচতে বলল। আর তাতেই চমকে উঠে এতদিনের সমস্ত কল্পনা আর স্বপ্ন ভেঙে ফেলে বেরিয়ে এলো পারমিতা, এবং সেখানে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায় দরিদ্র অন্নহীন মানুষ হর্ষনাথ।

শুক্লানবমী এবং শুক্লাভিসার দুটি গল্পেই সুবোধ ঘোষ দেখিয়েছেন যে, প্রকৃত ভালবাসা বা প্রেম কেবলমাত্র সাময়িক ভাললাগা, খানিকটা হৃদয়ের উত্তাপ বা সুখভোগের উপরই নির্ভর করে না, বরং নর-নারীর প্রেম, উভয়ের আদর্শের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধার উপরই একান্ত নির্ভরশীল।

শুক্লানবমীতে ললিতার কাছে তার 'আইডিয়ালিস্ট' স্বামী, চারুবাবু চূড়ান্ত ঘৃণার পাত্র হয়ে ওঠে যখন চারুবাবুর আদর্শচ্যুতি ঘটে। আবার সেই ললিতার অন্তরেই চারুবাবুর জন্য ভালবাসার উন্মেষ ঘটে যখন ললিতা চারুবাবুর চরিত্রে আদর্শ অক্ষুন্ন আছে দেখে তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়।

মানব অন্তরের প্রতিটি অলিন্দে সুবোধ ঘোষের অবাধ বিচরণ এবং নর-নারীর প্রেমের বিচিত্র গতি-প্রকৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতার জন্যেই তাঁর প্রেমের গল্পগুলো বিচিত্র স্বাদের এবং ভিন্ন মাত্রার। চটকদার প্রেমের গল্প সুবোধ ঘোষের কথাসাহিত্যে নেই বললেই চলে। প্রতিটি প্রেমের গল্পেই সুবোধ ঘোষ নর-নারীর অন্তরের গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছেন। পাত্র-পাত্রীর অতল অন্তরে

প্রবেশ করে একটি একটি করে সংগ্রহ করেছেন মনি-মুক্তো। প্রেমের সৌন্দর্য তাঁর কাছে যত না ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তার চেয়ে বেশী হৃদয়গ্রাহী। তাঁর কাছে প্রেমের ক্ষেত্রে চোখের দৃষ্টির তুলনায় অন্তরের দৃষ্টি অনেক বেশী অনুভূতিপ্রবণ। সুবোধ ঘোষের কাছে ভালবাসা দৃষ্টিনির্ভর নয়, অন্তরনির্ভর। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প অবশ্যই উল্লেখের দাবী রাখে, গল্পটি —'চোখ গেল'।

গল্পের নায়িকা অপরাজিতা রায় রূপে এবং গুণে অগ্রগণ্যা। তার বিত্তবাণ এবং উপযুক্ত দুই প্রণয়প্রার্থী, হিরন্ময় এবং কিংশুক। যোগ্যতার নিরিখে দুজনের খুব হেরফের নেই। তবে হিরন্ময় দৃষ্টিহীন — দুটি পাথরের চোখ বসানো, কিংশুকের আছে আকর্ষণীয় দুটি চোখ। অপরাজিতা দৃষ্টিহীন হিরন্ময়কেই বিয়ে করে বসে, লোকচক্ষে 'মহিয়সী' বিবেচিত হবার আশায়। কিন্তু বিয়ের পর অনুশোচনায় অস্থির হয়ে ওঠে অপরাজিতা। ধিক্কার দেয় নিজেকে। সিদ্ধান্ত নেয় হিরন্ময়কে ত্যাগ করে কিংশুককেই জীবনসঙ্গী করবে সে। কারণ, তার সৌন্দর্য সম্পূর্ণ অর্থহীন দৃষ্টিহীন স্বামীর কাছে। কিংশুক আসে। কিন্তু কিংশুকের উপস্থিতিতেই অপরাজিতা হিরন্ময়ের ভালবাসার উত্তাপ অনুভব করে। হিরন্ময়ের কাছেই সমর্পণ করে নিজেকে। অপরাজিতাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে হিরন্ময় বলে —

— তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না বলে আমার এতটুকু দুঃখ হচ্ছে না অপরা!

অপরাজিতার উত্তর — হবেই না তো। তুমি যে চোখের দেখার চেয়ে তিনগুণ
দেখা দেখে নিচ্ছ হিরণ![৬৭]

হিরন্ময় তার গভীর অন্তর দৃষ্টির মধ্য দিয়ে অপরাজিতার সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে। প্রেমের অন্তর দৃষ্টির কাছে পরাজিত হয় বাহ্যিক রূপ অনুভবের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় দুটো চোখ।

সুবোধবাবুর গল্পে কী ভাবে যে প্রেম আসে আর যায় তার কোন আগাম বার্তা যেন ধরা পড়েনা। সুনিশ্চিন্তার বিমলেন্দু কোনোদিন ভাবেনি হতদরিদ্র নিখিল সরকারের মেয়ে মীরাকে সঙ্গিনী হিসেবে সে গ্রহণ করবে। তেমনি কোন দিন জয়ন্তী গল্পের রাজীব ঘোষের কল্পনায়ও আসেনি মুক্তির সঙ্গে বিবাহোত্তর সম্পর্কটা এরকম যন্ত্রণাকর হয়ে উঠবে। তেমনি আবার মানশুল্কা গল্পের সেই অপমানিত ধর্ষিতা জংলী মেয়ে আগোর মনেই যে কীভাবে প্রেমের একটি মনিরত্ন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তাও ছিল পূর্বসূত্রহীন। এই গল্পে যেরকম নিভৃতে আগোর মনে শ্রদ্ধান্বিত প্রেমের উদয় হয়েছে তা সত্যই বিস্ময়কর। দেহ ছাড়া যাকে কোনো সভ্য মানুষ ভাবেনি সেই তাকেই, সভ্য সমাজ যাকে গুন্ডা বলে পরিচিত এক মানুষ নারীত্বের মর্যাদা দিয়ে গেল। একদিকে যেমন আগোর মনে এই নিভৃত প্রেমের সঞ্চার তেমনি সভ্য সমাজের লাম্পট্য এবং তথাকথিত অসামাজিক মানুষের মনুষ্যত্বের রূপ উন্মোচিত করে দেখিয়েছেন লেখক। তাই শেষ পর্যন্ত আগো সভ্য সমাজের গুন্ডাকেই সাধু মহাত্মার সম্মান দিয়েছে। তাকে যে সে দেহ দিয়ে অসম্মান করেনি কেবল এমন মানুষের হাতে মাথা নুইয়ে সরে আসতে পেরেছে তার জন্য আগো ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে।

সুবোধ ঘোষের প্রেমের গল্প কেবলমাত্র তথাকথিত শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চবিত্ত নরনারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আর্থিক এবং সামাজিক অবস্থান নির্বিচারে প্রেমের সার্বজনীনতায় তাঁর সশ্রদ্ধ বিশ্বাস ছিল। বরং এ মন্তব্য করা অসংগত হবে না যে এই কথাশিল্পী নিম্নশ্রেনীর নরনারীর হৃদয় বিনিময়ের ক্ষেত্রে গভীরতর আন্তরিকতার পরিচয় রেখেছেন। এ ধরণের প্রেমের গল্পগুলোতে লেখকের সমাজ সচেতনা, প্রখর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী এবং সমাজের অপাংতেয় মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মানশুল্কা সুবোধ ঘোষের একটি অসাধারণ প্রেমের গল্প। সেখানে লাঞ্ছিতা এক নারীর প্রতি সভ্য মানুষের পশুসুলভ লালসা বাস্তবসম্মত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্যদিকে, লেখক ডুবুরীর মত ধর্ষিতা আগোর নারী অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে সন্ধান করেছেন প্রকাশোন্মুখ প্রেমের।

আগো সভ্য সমাজের বলি। বরাচকে একদল মেয়ে পুরুষ মজুরের সঙ্গে আগোও এসেছিল এক দীঘি কাটতে। তিনজন পানওয়ালা ধর্ষণ করে তাকে। নিজেই থানায় গিয়ে রিপোর্ট লিখিয়ে অপরাধীদের সনাক্ত করে সে। কিন্তু তাতেই সমস্যা বেড়েছে আগোর। সভ্যসমাজের নিয়মের অপমানজনক তদন্ত ব্যবস্থায় পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ হবে তার অভিযোগের। বুড়ো সেপাই বলে 'আরও কত বেইজ্জতি আছে দেখবি।'[৬৮] পুলিশের হেফাজতে সে চলেছে সদরে। কিন্তু পাহারাদার পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে আগো বিনা টিকিটে কোলকাতাগামী এক ট্রেনে উঠে বেঞ্চের নীচে লুকোয়। আগোর এই ট্রেনযাত্রা বর্ণনায় ভদ্রসমাজের প্রকৃতি উন্মোচন করে দিয়েছেন লেখক।

> বেঞ্চের ওপর থেকে নানা জাতের যাত্রীর দশ জোড়া পা সাপের মত ঝুলে রইল। যতদূর সম্ভব আগো তার শরীরটাকে এই সর্পিল সংস্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করলো, কিন্তু বৃথা। পামশু-পরা, খড়ম-পরা ও নাগরা-পরা পাগুলি সারা রাত ধরে ও নানা কৌশলে ক্ষুধার্ত নখরের মত বেঞ্চের নীচে যেন অন্ধকারের মাংস খুঁজে বেড়ায়।[৬৯]

এই সভ্য সমাজের বিকৃত কামনার শিকার আগোরা। হাওড়ার টিকিট চেকার ছেড়ে দেয় আগোকে। বলে – 'জলদি ভাগ্ এখান থেকে। আর কেউ ধরে ফেললে আরও অনেক কিছু আদায় করে ছাড়বে।'[৭০] মহানগরী কোলকাতার চলমান জনসমুদ্রে পা মেলায় আগো। বিস্ময়ে প্লাবিত তার দৃষ্টি। কিন্তু ক্রমশ তার দেহের ওপর বিভিন্ন পুরুষের লোলুপ দৃষ্টিতে ভয়ার্ত হয়ে পড়ে সে। ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন আগোর চলার বিরাম নেই। কারণ, সম্পূর্ণ অপরিচিত কোলকাতায়, একটু আশ্রয়ের সন্ধানে এ তার নিরুদ্দেশ যাত্রা। মোষের সঙ্গেই রাস্তায় জল পান করে সে।

ভীড়ের সুযোগে অনেকেই তার স্পর্শসুখ লাভের চেষ্টা করে, কেউবা তার কোমলাঙ্গে চিমটি কাটে, কেউবা জড়িয়ে ধরে কোমর। এরই মধ্যে বকের মত রোগা কালো দাঁতের একটা লোক আগোর পিছু নেয়। ভয়ে আগো এ গলি, সে গলি ধরে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু লোকটি লেগেই থাকে পেছনে। মাঠের ধারে গাছের ছায়ায় এক বুড়িকে ভাত রান্না করতে দেখে আগো গিয়ে দাঁড়ালে বুড়ি বলে – 'তোমর ভাবনা কিসের, অমন গতর থাকতে!'[৭১] আগো মন্দিরে প্রবেশে বাধা পায়, গির্জার দরজাও খোলে না।

সন্ধ্যে হয়। ময়দানে একটা গাছের নীচে বসে আগো। হঠাৎ চোখে পড়ে সেই রোগা কালো দাঁতের লোকটিকে, কাছেই একটি তেলেভাজার দোকানে। ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসে আগোর। হঠাৎ চোখ খুলে দেখে লোকটি একেবারে গায়ের কাছে উপস্থিত। আগো, হঠরৎই সব ভীরুতা কাটিয়ে, তার গায়ে হাত দেবার আগেই লোকটির ওপর ঝাপিয়ে পড়ে আক্রমনের জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু আগোকে বিস্মিত করে লোকটি তাকে এগিয়ে দেয় এক ঠোঙা তেলেভাজা। আগোর কাছে এ এক বিচিত্র এবং তৃপ্তিদায়ক অভিজ্ঞতা। এই প্রথম আগো দেখল এমন পুরুষ যে তাকে রক্ষা করতে নিজের বিপদ ডেকে আনে, উপকার করেই সরে যায়। সে আরো অবাক হয় যখন জানতে পারে এই লোকটিকেই পুলিশ ধরতে চাইছে গুন্ডা সন্দেহে। আগোকে তার গন্তব্যে পৌঁছে দিতে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে তুলে দেয় লোকটি। গাড়ি চলতে শুরু করলেই লোকটিকে ধরে পুলিশ। আগো কাঁদে এমন একটি মনের মত মানুষকে পেয়ে হারানোর জন্য।

শ্মশানচাঁপা, সুবোধ ঘোষের অভিনব বিষয় নির্বাচনের এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। মাধব গাঙ্গুলী মিউনিসিপ্যালিটির চাকুরী পেয়ে হয়েছেন শ্মশানের ঘাটবাবু। শ্মশানের রেজিষ্টারে মৃতের নাম-ঠিকানা লিখতে লিখতে, শবদাহের তদারকি করতে করতে – ঘাটবাবু যেন পিশাচে পরিণত হয়েছেন। এই

ঘাটের কদর্য পরিবেশেই বয়েছে একটি চাঁপা গাছ, কিন্তু তাতে ফুল ফোটে না, 'ধোঁয়ার জ্বালায় কালো হয়ে গিয়েছে গাছটা।'[৭২] সম্ভাবনাহীন, বন্ধ্যা। শুধু শ্মশানের ধোঁয়ায় নয়, সভ্য মানুষের অসভ্য আচরণে ব্রাত্য ঘাটবাবুর আত্মবিশ্বাস তলানীতে গিয়ে ঠেকেছে। শহরের পথে তাকে দেখা গেলে সব দরজা-জানালা বন্ধ হয়ে যায়। শহুরে মানুষের বক্তব্য – 'ছাই, ধোঁয়া আর অন্ধকারের দেশে বাস করে যে লোকটা, সেই লোকটা আবার এই আলোর রাজ্যে কেন ?'[৭৩]

তবু ঘাটবাবু গাছ নয়, মানুষ। তাই তার মনেও ফুল ফোটে। বিয়ে করে ঘাটবাবু। 'উপুড় করা ডাস্টবিনের মত'[৭৪] ঘাটবাবুর কোয়ার্টার যেন নবরূপ লাভ করে ছবির মত ফুটে ওঠে। সভ্য সমাজের প্রতিভূ মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার এবং বান্ধব সমিতির কর্তা কাঞ্চনবাবুর কাছে ঘাটবাবুর এই বিয়ে এক অন্যায়, মিথ্যাচার, ভাঁওতা এবং জোচ্চুরি। এই বান্ধব সমিতির পেট্রন কুমার সাহেব একদিন ঘাটবাবুর বিবাহিতা এবং অন্ত:সত্ত্বা সুন্দরী স্ত্রী সুমিতাকে নিয়ে তোলে একজন রক্ষিতা হিসেবে। কাঞ্চনবাবুদের কাছে এই ঘটনা আপত্তিজনকও মনে হয়নি। সভ্য সমাজ সুমিতাকে 'রাণীজী' হিসাবে সসম্মানে মেনে নেয়। রাণীজী মারা যায়। শ্মশানে তার দেহ আসে সৎকারের জন্য।

> রাণীজীর মুখের দিকে একবার তাকাতে গিয়েই এই ন্যাড়া চাঁপা গাছটার মত একেবারে থমকে আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঘাটবাবু। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল, রানীজীর মুখের ঢাকা আর একটু নামিয়ে দিল, তারপর খাটিয়ার পাশে মেঝের ধুলোর উপর ধপ করে বসে পড়লো ঘাটবাবু। ...একটা মরা মেয়েমানুষের সুন্দর মুখের উপর লুব্ধ সাপের মত সিরসির করে ঘাটবাবুর রোগা আর শুকনো হাতটা ঘুরছে। আবার মনে হয়, যেন অনেক যন্ত্রণায় ক্লান্ত একটা মানুষকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে ঘাটবাবু।[৭৫]

শ্মশানযাত্রীরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য কোরল, মৃতার সার্টিফিকেটের তথ্যগুলো আগ্রাহ্য করে ঘাটবাবু তার রেজিষ্টারে লিখেছে – মৃতার নাম সুমিতা গাঙ্গুলী, বয়স পঁচিশ, সধবা, সন্তানবতী, একটি ছেলে, হার্টের অসুখে মৃত্যু, মৃতার স্বামীর নাম মাধব গাঙ্গুলী। ঘাটবাবু অনেক দিন ধরেই বলছিলেন, শ্মশানের এই চাকরীটা ছেড়ে দেবেন। সেই মর্মে একটি পদত্যাগ পত্রও লিখে রেখেছিলেন তিনি। কাঞ্চনবাবু আজ তার সেই পদত্যাগ পত্র চাইতেই ঘাটবাবু সেটি কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেললেন। আরও কিছুদিন চাকুরী করতে চান তিনি। তার আশা এমনি করেই তার ছেলেও কাঁধে চড়ে আসবে এ শ্মশানে। কারণ তিনি জেনেছেন, ছেলে রোগাক্রান্ত। বাঁচবে না।

সুবোধ ঘোষ তাঁর সমাজ সচেতন দৃষ্টিতে দেখিয়েছেন যে কত সহজেই বিত্তবান এবং প্রতিষ্ঠিত কুমার সাহেব মাধব গাঙ্গুলীর সাধের সংসার ভেঙে, তার বিবাহিত স্ত্রীকে নিজের রক্ষিতা করে রাখতে পারে। এতে সমাজের তথাকথিত ভদ্রজনেরা অন্যায় কিছু খুঁজে পায় না। অন্যদিকে সেই একই সমাজ, মাধব গাঙ্গুলীকে কেবলমাত্র পেশাগত কারণে অপাংতেয় কর রাখে। এমনকি মাধব গাঙ্গুলীর স্বাভাবিক বিবাহিত জীবন যাপনের চেষ্টাও সমাজের চোখে অনধিকার চর্চা বলে বিবেচিত হয়।

ঘাটবাবুর চাকরী করে, সামাজিক বঞ্চনা এবং অত্যাচারের শিকার হয়ে, মাধব গাঙ্গুলী আত্মবিশ্বাসশূন্য হয়ে পড়েন। সুস্থ জীবন যাপনের পথ ও সাহস হারিয়ে ঘাটবাবু স্ত্রীর শহদেহে হাত বুলিয়ে প্রিয়াসঙ্গসুখ খুঁজে বেড়ায়, মৃতার সঙ্গে কথা বলে অন্তরঙ্গভাবে। ঘাটবাবু সাগ্রহ প্রতীক্ষায় থাকেন শ্মশানে একমাত্র পুত্রের মৃতদেহ পৌঁছানোর জন্য। বন্ধ্যা চাঁপাগাছের সঙ্গে ঘাটবাবুর চরিত্রের এই হৃদয়-বিদারক সাদৃশ্যে ভারাক্রান্ত হয় পাঠক অন্তর। শ্মশানচাঁপা গল্পে সমাজদেহের এই দগদগে ক্ষত স্থানটি সুবোধ ঘোষ চিহ্নিত করেছেন, সমাজকেই সুস্থ করার প্রয়াসে, তাতে সন্দেহ নেই। এমন নিষ্ঠুর একটি গল্পের উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে খুব একটা চোখে পড়ে না।

সুনিশ্চিতা চিত্তচকোরেরই মত একটি প্রেমের গল্প। সেরকম আরেকটি গল্প বৈদেহী আর প্রেম-অপ্রেমের গল্প জয়ন্তী। সত্যি বলতে কী সুবোধবাবুর প্রেমের গল্পের বিস্তার এতটাই যে তার সীমানা সবসময় বজায় থাকে না। কিংবা অন্য শ্রেণীর গল্পের হাওয়ায় তার প্রকৃতিও দুলে ওঠে। সুনিশ্চিতা প্রাক বিবাহ প্রেমের গল্প কিন্তু যে অর্থে প্রাক্ বিবাহ প্রেমের কথা আমরা বুঝি তার কথা এখানে নেই। আর শেষ পর্যন্ত যে মীরাকে বিয়ে করল বিমলেন্দু তার সঙ্গে তো প্রেমের কোনো কথাই হয় নি। কলকাতার এক কোম্পানীর ইনস্পেক্টিং অফিসার বিমলেন্দু হীরাপুরে এসে তিনটি নারীর মুগ্ধদৃষ্টির প্রসন্নতা পায়। কিন্তু সে যেদিন চলে যাচ্ছে সেদিন সেই ট্রেনে যাচ্ছে তার চেয়ে অনেক মর্যাদা সম্পন্ন ডি কে রায়। বিমলেন্দু ভেবেছিল সেই ধীরা অতসী সুমনারা অন্তত তার বিদায় বেলাকার মুহূর্তটি কুসুমে আর কলহাস্যে উজ্জ্বল করে দেবে। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে সে দেখল তারা এসেছে ডি,কে,রায়ের জন্য ফুলের তোড়া নিয়ে। আর তার জন্য খাবারের একটা ছোট হাঁড়ি নিয়ে এসেছে সেই হতদরিদ্র্য নিখিল সরকারের মেয়ে যার বই কেনা আর পরীক্ষায় বসবার জন্য বিমলেন্দুকেই টাকা সাহায্য করতে হয়েছিল। বিমলেন্দু বুঝতে পারে ধীরা সুমনা অতসীদের প্রেম একান্ত তারই জন্য উৎসর্গিত নয়। নিখিল সরকারের মেয়ে মীরার একটি কথায় তার মনের দরজা খুলে যায়। মীরা বলে 'কাউকে চলে যেতে দেখলে আমার খুব খারাপ লাগে।'[৭৬] এই কথাতেই বিমলেন্দুর মনটা নিশ্চিন্ত হয়। সে তাকেই বিয়ে করে নিয়ে যেতে চায়।

সুবোধবাবুর আর একটি প্রেমের গল্প, বৈদেহী। মাল্লিকাকে বৈদেহী নামটা দিয়েছিল তার এক জামাইবাবু যাকে সে বলত বৈদান্তিক। বৈদেহী মানে দেহটাই এত ক্ষীন যে – মনে হয় যেন নেই আর বৈদান্তিক মানে দন্তহীন। এই বৃদ্ধ জামাইবাবুই মল্লিকার বিয়ের ব্যবস্থা করেন সর্বগুণান্বিত – বিদ্বান অর্থবান রূপবান বিকাশের সঙ্গে। কিন্তু বিয়ের রাত থেকেই যেন মল্লিকার মনের সুর বাজছে না। জামাইবাবু মল্লিকাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'আগে বিয়ে করে তারপর প্রেম করলে কেমন হয় ? মল্লিকা বলেছিল ভালই হয়।'[৭৭] এ গল্প সেই বিয়ের পর প্রেমের গল্প। বিয়ের পর কিন্তু বিকাশ এই ক্ষীনদেহী মল্লিকার মনটাকে বুঝল না-সে চাইল দেহ। প্রথম দিন রাত দশটার সময় সে কলিংবেল বাজিয়ে তাকে ডাকল। এর পর 'একটা মূক ও বধির পেশী দর্পিত উল্লাস মল্লিকার শ্বাসরোধ করে কিছুক্ষণ'।[৭৮] এইভাবে মল্লিকা দুই সন্তানের জন্ম দেয়। কিন্তু তারও পরে ঠিক রাত দশটায় সেই চটি পরা পায়ের শব্দ কার্পেটের উপর হেঁটে যায়। সে চায় অন্ধকারের তৃপ্তি। কিন্তু মল্লিকা তাতে বাধা দেয়। তারপর টেলিফোনের নতুন শব্দ যোগ হয় বিকাশের অন্ধকারের আকাঙ্ক্ষায়। মল্লিকা বিকাশের যাত্রাপথে শুধু নির্বাকভাবে তাকিয়ে দেখে।

বিকাশ বলে – তোমার আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোনো অর্থ হয় না। যদি বুঝতাম যে ক্ষমা চাইতে এসেছ তবে না হয়...

মল্লিকা – তোমার কাছে ক্ষমা চাইব এটা কি আর এমন কঠিন কাজ !

বিকাশ – তবে চলো আমার ঘরে...

মল্লিকা – কেন যাব তোমার ঘরে ? টেলিফোনে তোমার একটা নেমতন্ন এসেছে বলে ভয় পেয়ে ? আমি টেলিফোন নই কলিংবেলও নই, আমি মানুষ।[৭৯]

পাঁচ

বিষয়বৈচিত্র্যে সুবোধ ঘোষের গল্পের যে বিস্তার তার অনন্যতা যেমন তাঁর প্রথম গল্প অযান্ত্রিকে ধরা পড়েছিল তেমনি তা ফুটে উঠল তাঁর পরবর্তী রচনা ফসিলে। 'ফসিল' গল্পটিকে বাংলা সাহিত্যের সমালোচক মাত্রই একটি 'উজ্জ্বল রত্ন'[৮০] বিশেষ বলে বিবেচনা করেন। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'ফসিল' গল্পটিকে এই রত্ন বলেই অভিহিত করেছেন। আর জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন সুবোধ ঘোষের এই গল্পটি বাংলা কথাসাহিত্যে 'ঐতিহাসিক মর্যাদা'[৮২] পেয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে এই গল্পটিকে মধ্যবিত্ত জীবনবোধের গল্প বলার চাইতে লেখকের ইতিহাস চেতনার গল্প বলাই সঙ্গত। ফসিল ১৯৪০ সালে লেখা হবার আগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় তেমন ইতিহাসের গতিচেতনার কথা ফুটে উঠেছিল কিনা সন্দেহ। তাঁর লেখায় উত্তরকালের গল্পে সেই সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্ব লাভ করে। কিন্তু মার্কসবাদীদের ইতিহাসের যে বিশ্লেষণ পাওয়া যায় এই গল্পে সেই বিশ্লেষণের একটি রক্তমাংসের মূর্তি রচনা করেছেন লেখক। জগদীশবাবু ঠিকই লিখেছেন 'এতদিন ধরে সাম্যবাদী সমাজবিজ্ঞানের যে বলিষ্ঠ ভরসা সাহিত্যে শুধু প্রচার কার্যই চালিয়ে যাচ্ছিল, 'ফসিলে' এসে তা প্রথম শিল্প হিসাবে সার্থক হয়ে উঠল।[৮৩]

ফসিল গল্পে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র এবং আগ্রাসী ধনিকতন্ত্র পরস্পর লড়াই করেছে, কিন্তু যখন প্রয়োজন হয়েছে তখন তারাই ঠান্ডা মাথায় একযোগে জোট বেঁধে, শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। খনিতে ধ্বসে পড়া পীটের ভেতর বিপ্লব আর বিপ্লবীদের কবর দিয়েছে। শ্রমজীবীদের বিরুদ্ধে সামন্ততন্ত্র ও ধনিকতন্ত্রের এই অদ্ভুত বন্ধুত্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষের প্রকৃত আর্থ-সামাজিক ছবিটি তুলে ধরেছে।

এ কথা সত্য, সে সময় অনেকের গল্পেই অবক্ষয়ী জমিদারী প্রথার কথা আছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জলসাঘর গল্পে এক পড়তি জমিদারের সঙ্গে উঠতি ব্যবসায়ীর বিবাদ বর্ণিত হয়েছে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পে রয়েছে সুবিধাভোগী বিত্তবান শ্রেণীর সঙ্গে সংঘর্ষের কাহিনী। কিন্তু সুবোধ ঘোষের 'ফসিল'-এ তিনটি শ্রেণী – সামন্তকুল, ধনিককুল এবং শ্রমিককুলকে নিয়ে পরিবর্তনশীল নতুন সমাজের যে ছবি আঁকা হয়েছে, বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে তা এক বিরল দৃষ্টান্ত। এ প্রসঙ্গে অলোক রায়ের মন্তব্য উল্লেখ করা যায় —

> ...সুবোধ ঘোষ সাহিত্যজীবনের সূচনায় শুধু গল্প বলে তৃপ্তি পাননি, গল্পের মধ্য দিয়ে আরও কিছু বলতে চেয়েছেন। – সেই পরিবর্তনের কথা যার সঙ্গে দেশ কালের যোগ প্রকট। ...এই পরিবর্তনের স্রোতেই ভেসে গেছে 'ফসিল' গল্পের নেটিভ ষ্টেট অঞ্জনগড়। 'ফিউডাল দেমাকে অন্ধ আর ইজ্জতের কমপ্লেক্সে জর্জর, মহারাজা প্রথমে পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারেননি, কারণ নতুন প্রাণের জোয়াড়ের সঙ্গে অঞ্জনগড়ে এলো বিদেশী বণিকের মাইনিং সিন্ডিকেট। বাঁধলো সমান্ততন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের বিরোধ। হয়তো এই বিরোধের চিত্র একালের অন্যান্য গল্প উপন্যাসেও পাওয়া যাবে, কিন্তু তারাশঙ্কর বা অন্য অনেকের মতো সুবোধ ঘোষ একে কেবল প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব হিসেবেই দেখেননি। শক্তি ও প্রতিপত্তির অর্থনৈতিক বনিয়াদ যে শোষনের উপর দাঁড়িয়ে আছে, তা রাতারাতি পাল্টায় না। তাই মহারাজা ও গিবসন সহজেই চুক্তিতে আসতে পারে - সেখানে শ্রেণীস্বার্থের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অন্যদিকে আদর্শবাদী ইতিহাস পড়া মুখার্জী হাজার চেষ্টা করেও তার মার্কিনী ডেমোক্রেসির আদর্শ সফল করতে পারে না, বরং সেই-ই নিজের

অজ্ঞাতসারে কুর্মি শ্রমিকদের সর্বনাশ করে। সুবোধ ঘোষ এর মধ্যে দেখেছেন ইতিহাসের আঙ্গুলি-সংকেত, ফসিলে পরিণত মানুষের ভবিষ্যৎ।[৮৩]

প্রশ্ন জাগে সুবোধ ঘোষ তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরুতেই 'ফসিলের' মত এত পরিণত একটি গল্প লিখলেন কি করে? 'সুবোধ ঘোষ : প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থটির সম্পাদক, নিতাই বসু গ্রন্থটির মুখবন্ধে লিখেছেন —

ওঁর পিতামহের বন্ধু, ভারতের জিওলজিক্যাল সার্ভের প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টর, রায়বাহাদুর পার্বতীনাথ দত্ত ওঁর কাছে নদী পাহাড় সমুদ্র ও পাথরের অনেক মজার মজার গল্প বলতেন, বড়-বড় প্রাণীর হাড় পাথর-চাপা পড়ে ফসিল হয়ে যায়। এই ভাবেই সুবোধ ঘোষের শিল্পীসত্তায় 'ফসিল' গল্পের উপকরণ ধরা পড়ে।[৮৪]

বাংলা কথাসাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ফসিল গল্পটি সম্পর্কে প্রখ্যাত সমালোচক ডঃ জগদীশ ভট্টাচার্য্য বলেছেন — '...গল্পটি এ যুগের জীবনমহাকাব্যেরই প্রতীক। জন-আন্দোলনের শহীদদের প্রতি লেখকের গভীর সহানুভূতি উপসংহারের বক্রোক্তির মধ্যে বিধৃত হয়েছে।'[৮৫]

সাড়ে আটষট্টি বর্গমাইলের নেটিভ স্টেট-অঞ্জনগড়। ক্ষয়িষ্ণু এই স্টেটের রাজ-অত্যাচারে অতিষ্ঠ প্রজারা দলে দলে রাজ্য ছেড়ে পালায়। কেবলমাত্র কুর্মি প্রজারা মাটি কামড়ে পড়ে থাকে তাদের সাত পুরুষের বাস অঞ্জনগড়ে। 'বেহায়ার মত চাষ করে, বিদ্রোহ করে আর মারও খায়।'[৮৬] লাঠিতন্ত্রের রাজত্ব চলে অঞ্জনগড়ে। কিন্তু লাঠির ঘায়ে আদায়ীকৃত রাজস্বেও রাজার রাজসিক খরচ কুলোয় না। পৈত্রিক সিন্দুকে হাত পড়ে, সেই সিন্দুকও শূন্য হতে থাকে দ্রুতগতিতে।

মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিভূ, আদর্শবাদী, মুখার্জী প্রথমে রাজার আইন নবিস উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হয়ে ক্রমে নিজ যোগ্যতায় ডি-ফ্যাক্টো সচিবোত্তম পদে উন্নীত হয়ে রাজার প্রধান সহায় হয়ে দাঁড়ায়। মুখার্জীর দক্ষ পরিকল্পনায় ও পরিচর্যায় স্টেটের উন্নতি শুরু হয়, বন্ধ হয় লাঠিতন্ত্র। প্রজারা একযোগে ভয় ও ভক্তি করে মুখার্জীকে। মুখার্জীর কর্মদক্ষতায় অঞ্জনগড়ের খনিজ সম্পদ, অভ্র আর অ্যাসবেসটসপূর্ণ কাঁকুরে মাটির ডাঙাগুলো লাখ লাখ টাকায় ইজারা দিয়ে, হতশ্রী অঞ্জনগড় তার শ্রী ফিরে পায়। গড়ে ওঠে রাজার গোয়ালিয়রী প্যালেস, মাইনিং সিন্ডিকেট। কুর্মিরা খনিতে যোগদান করে-নগদ মজুরী পায়, মুরগী বলি দেয়, হাড়িয়া খায় আর নিত্য সন্ধ্যায় মাদল ঢোলক পিটিয়ে খনি অঞ্চল সরগরম করে রাখে। শ্রমিক দরদী মুখার্জী স্বপ্ন দেখে —

অঞ্জনা নদীর সমস্ত জলের ঢলটা কায়দা করে অঞ্জনগড়ের পাথুরে বুকের ভেতর চালিয়ে দিতে হবে – রক্তবাহী শিরার মত। প্রত্যেক কুর্মি প্রজাকে মাথা পিছু এক বিঘা জমি দিতে হবে বিনা সেলামীতে, আর পাঁচ বছরের মত বিনা খাজনায়। আউস আর আমন, তা ছাড়া একটা রবি। বছরে এই তিন কিস্তির ফসল তুলতেই হবে। উত্তরের প্লটের সমস্তটাই নার্সারী, আলু আর তামাক, দক্ষিণেরটায় আখ, যব আর গম। তারপর —

তারপর ধীরে একটা ব্যাঙ্ক। ক্রমে একটা ট্যানারী আর কাগজের মিল। রাজকোষের সে অকিঞ্চনতা আর নেই। এই তো শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ। শিল্পীর তুলির আঁচড়ের মত এক একটি এস্টিমেটে সে অঞ্জনগড়ের রূপ ফিরিয়ে দেবে। সে দেখিয়ে দেবে – রাজ্যশাসন লাঠিবাজি নয়, এও একটা আর্ট।[৮৭]

ঘটনা এগিয়ে চলে। ক্রমে সামন্ততান্ত্রিক মহারাজা আর ধনতান্ত্রিক সিন্ডিকেটের চেয়ারম্যান গিবসনের

বিরোধ শুরু হয়। কুর্মি নেতা দুলাল মাহাতো শ্রমিক মন্ডলের প্রতিষ্ঠা করে। তার ঘোষণা – পেট আর ইজ্জতের উপর যে ছুরি চালাতে আসবে তাকে আর কোনমতেই ক্ষমা নয়। মহারাজের ফতোয়া কোন কুর্মিকে দিয়ে সিন্ডিকেট খনির কাজ করাতে পারবে না। কারণ কুর্মিরা মহারাজের প্রজা। সিন্ডিকেটের আইনী বক্তব্য — মহারাজার নতুন সর্ত বিবেচনা করা যেতে পারে প্রথম চুক্তির নিরানব্বই বছরের মেয়াদ পূর্ণ হবার পরই। দুলাল মাহাতোরা খনির কাজে নগদ প্রাপ্তিকেই পরমার্থ জ্ঞান করে। মুখার্জী সিন্ডিকেটকে মহারাজার নতুন সর্ত মানাতে ব্যর্থ হয়।

এরই মধ্যে খবর আসে খনির চোদ্দ নম্বরের পীট ধসছে। নব্বইজন মেয়ে পুরুষ কুর্মি চাপা পড়েছে। এর পরই আবার খবর – ঘোড়ানিমের জঙ্গলে বিনা টিকিটে 'লকড়ি' কাটায় মহারাজের ফৌজদার গুলি চালিয়েছে। নিহত বাইশ, আহত পঞ্চাশেরও বেশি। মুখার্জী পেয়াদা পাঠিয়ে দুলাল মাহাতোকে ধরে আনে। —

> সে রাতে ক্লাবঘরে আর আলো জ্বললো না। একসঙ্গে একশো ইলেকট্রিক ঝাড়ের আলো জ্বলে উঠলো প্যালেসের একটি প্রকষ্ঠে...এ বৈঠকের সিদ্ধান্ত ও আশু কর্তব্য কি নির্ধারিত হয়ে গেছে, ফৌজদার সেটা মুখার্জীর কানে কানে শুনিয়ে দিল।
>
> এর পর কম্বলে মোড়া দুলাল মাহাতোর লাশ এলো। এলো ঘোড়ানিমের জঙ্গল থেকে ট্রাক বোঝাই লাশ। 'ক্ষুধার্ত খনির গহ্বরের মুখে লাশগুলি তুলে নিয়ে দারোয়ানরা ভুজ্যি চড়িয়ে দিল একে একে।[৮৮]

মধ্যবিত্ত, আদর্শনিষ্ঠ, শিক্ষিত এবং শ্রমিক হিতাকাঙ্ক্ষী মুখার্জী প্রতিবাদ করতে পারল না। নিজ আদর্শকে মর্যাদা দিয়ে প্রতিরোধ করতে পারল না সুবিধাবাদী সামন্ততন্ত্র ও ধনিকতন্ত্রের মিলিত শ্রমিক মারণ যজ্ঞের। বিবেকের দংশন বুকে নিয়ে এক অমানবিক নরমেধ যজ্ঞের নির্বাক দর্শক হয়ে রইল সে। আপাত বিবদমান অথচ স্বার্থচিন্তায় অভিন্ন দুই শ্রেনীশত্রুর কাছে কি এক অজ্ঞাত কারণে আত্মসর্ম্পণ করে মুখার্জী। — মুখার্জীর এই আত্মসমর্পণকে গল্পকার সুবোধ ঘোষ, শিক্ষিত, আদর্শনিষ্ঠ মধ্যবিত্তের আত্মসমর্পণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আর এখানেই সুবোধ ঘোষ মধ্যবিত্ত চরিত্রের আত্মপ্রতারণা, ভণ্ডামী এবং দ্বিধাদীর্ণ মানসিকতার কঠোর সমালোচক।

এই আর্থ-রাজনৈতিক ঘটনার মধ্য দিয়েই গল্পটি শেষ হ'তে পারত, কিন্তু তা হয়নি। শেষ একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদে সুবোধ ঘোষ তাঁর শিল্পসুন্দর দৃষ্টি প্রসারিত করেছেন বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে। শেষ অনুচ্ছেদে লেখক সদ্য আদর্শচ্যুত মুখার্জীর চোখ দিয়ে দেখেছেন লক্ষ বছর পরের ভবিষ্যতকে।

> লক্ষ বছর পরে, এই পৃথিবীর কোন এক জাদুঘরে, জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতুহলে স্থির দৃষ্টি মেলে দেখছে কতগুলি ফসিল। অর্ধপশুগঠন, অপরিণত মস্তিষ্ক ও আত্মহত্যাপ্রবণ তাদের সাব-হিউম্যান শ্রেণীর পিতৃপুরুষের শিলীভূত অস্থিকঙ্কাল, আর ছেনি হাতুড়ি গাঁইতা; কতগুলি লোহার ক্রুড কিম্ভুত হাতিয়ার। অনুমান করেছে তারা, প্রাচীন পৃথিবীর একদল হতভাগ্য মানুষ বোধহয় একদিন আকস্মিক কোন ভূ-বিপর্যয়ে কোয়ার্টস আর গ্রানিটের গহ্বরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখছে, শুধু কতগুলি সাদা সাদা ফসিল, তাতে আজকের এই লাল রক্তের কোন দাগ নেই![৮৯]

সুবোধ ঘোষের গল্পে মধ্যবিত্তের মানস বিশ্লেষণের একটা প্রয়াস লক্ষ করা যায়। আসলে সুবোধবাবু যে সময়ের ও যে শ্রেণীর শিল্পী তাতে তাঁর পক্ষে আর কেবল মনোমোহন গল্প রচনা করা সম্ভব হচ্ছিল

না। তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যাচ্ছিল সে সময়ের রূপ। বাংলা সাহিত্যে এরকম ভাবে তাদের প্রকৃতি আর আগে তেমন ধরা পড়েনি। সুবোধবাবুর নিজের যে জগৎ সেই জগৎ হল মধ্যবিত্তের আত্মরক্ষার এবং আত্মপ্রতারণারও জগৎ। সেইখানে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাই শিল্পমূর্তি লাভ করেছে তাঁর গল্পে। তাঁর যে বিশেষ কয়েটি গল্প আত্মপ্রতারক মধ্যবিত্তের দ্বিধাদীর্ণ মানসিকতার তীক্ষ্ণ সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে, তার মধ্যে ফসিল, তিন অধ্যায়, সুন্দরম, গোত্রান্তর, নির্বন্ধ, কাঞ্চন সংসর্গাৎ, স্বর্গ হতে বিদায়, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, স্বমহিমচ্ছায়া, হৃদঘনশ্যাম, গ্লানিহর, স্নানযাত্রা গরল অমিয় ভেল, এবং বারবধূ অন্যতম। তবে এই রকম বিছিন্ন বিশ্লেষণের দ্বারা তার গল্পের মধ্যবিত্ত মানস উদ্ঘাটনের কাজ সম্পূর্ণ করা যাবে না। তার বহু গল্পেই এই মানুষকে আমরা পাব। সৌমেন্দ্রনাথ সরকার বলেছেন—

> পরিকল্পনার মৌলিকতা ও আলোচনার বিস্ময়কর বৈচিত্র্যে সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্পটি বাংলা ছোটগল্পকে একাই যেন রাজৈশ্বর্যে পূর্ণ করে দিয়েছে। সাধারণ মানুষের উপর যুগ যুগ সঞ্চিত বঞ্চনা আর অত্যাচারের প্রতিকারহীন বেদনা তীব্র ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে এখানে ফেটে পড়েছে।...আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার চাপে উৎপীড়িত মানবচেতনার এমন উলঙ্গ উদ্ধত প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে এর আগে আর হয় নি। তাই এ গল্প শুধু অপূর্ব নয় ঐতিহাসিকও বটে।[৯০]

ফসিলের অভিনবত্ব সকলেই স্বীকার করেন। এই অভিনবত্ব অতিশয় মৌলিক এই কারণে যে যখন ফসিল লেখা হয় তার আগে অন্য কোনো লেখকের গল্প লেখায় এই ধরনের সমাজ প্রকৃতির বিশ্লেষণ এবং সমাজ ইতিহাসের গতি নির্দেশিকা পাওয়া যায় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা সমাজ প্রগতির শিল্পী বলে মনে করি। কিন্তু তাঁরও কোনো লেখায় তখনো এ ধরণের বিশ্লেষণ করা হয়নি। সুবোধবাবু যে ভাবে সামন্ততন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের সংঘর্ষ এবং শেষ পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের সংঘবদ্ধরূপে দাঁড় করিয়েছেন তাতে ইতিহাসের মার্কসবাদী পথই চিহ্নিত হয়েছে। এদিক থেকেও তাঁর গল্পটি ঐতিহাসিক অর্থে মূল্যবান। উজ্জ্বল কুমার মজুমদার লিখেছেন 'সামন্ততন্ত্র ধনতন্ত্র এবং শ্রমিক কৃষিজীবীদের পারস্পরিক সংঘর্ষের আশ্চর্য নাটকীয় রূপ একটি গল্পের ছোট পরিসরে ধরা পড়েছে।'[৯১]

ফসিল ঠিক মধ্যবিত্ত জীবনের গল্প নয়। ফসিল গোটা বাংলা সাহিত্যে অনন্য। তার মতো গল্প আর নেই। কিন্তু মধ্যবিত্ত মানসিকতার উন্মোচন সুবোধ ঘোষের অনেক লেখায় অকৃত্রিমভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তিন অধ্যায় এরকম একটি গল্প।

'তিন অধ্যায়' গল্পে মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং গোত্রান্তরের মধ্য দিয়ে সমাজের পুনর্বিন্যাসের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এই গল্পে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গেই প্রকট হয়েছে - কিভাবে মধ্যবিত্তের ঠুনকো আভিজাত্যবোধ সামান্য চাপের মুখে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। মধ্যবিত্ত তার আভিজাত্য হারিয়ে কিভাবে আত্মগ্লানিতে ভোগে, তার এক পূর্ণাঙ্গ দলিল - 'তিন অধ্যায়'। ১৯৪০ এর দশক বাংলা দেশে একটা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কাল। তখন যেমন অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তেমনি তার ফলে মানুষের পুরানো জীবন ও জীবিকার ছাঁদ ক্রমে ভেঙে যাচ্ছে। এই ছন্দ ভাঙা জীবনের দাবি পুরানো শ্রেণী চৈতন্যকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। এ নিয়ে অহিও বেশ একটু শ্রেণীমর্যাদা রক্ষারই চেষ্টা করে গেছে। সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার নামটি বদলানোর জন্য তার চেষ্টার ত্রুটি নেই। সে তখনো ভদ্রলোকের ছেলে এই বিশেষণটি নিজের নামের আগের দিকে বসায়। কিন্তু একদিকে যেমন অহির দীনতা অন্যদিকে সমাজের উচ্চবীত্তের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাকে শ্রেণীচ্যুত করতে বদ্ধপরিকর। মিউনিসিপ্যালটির চেয়ারম্যানকে সে বন্ধুর কাকা হিসেবে কাকাবাবু বলে সম্বোধন করবার শাস্তি পায় প্রত্যুত্তরের ব্যঙ্গে। আর টাকা না বাড়িয়ে কেবল পোষ্টের নামটা অপরিবর্তিত রাখার চেষ্টা চেয়ারম্যানের এক ধমকেই শেষ হয়ে যায়। কাকাবাবু থেকে অহি স্যার ও হজুর সম্বোধনে নেমে যায়। এ গল্পে সুবোধবাবুর সমাজবোধ

এত গভীর এবং দূর প্রসারী যে এরকম একটি অসাধারণ মানব মনস্তত্ত্ব আর শ্রেণী পরিচয়ের মর্যাদা রক্ষার করুণ চেষ্টা তিনি অবলীলায় ধরে দিয়েছেন। আর সেই সঙ্গে দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে উচ্চবিত্ত সমাজের লোকেরা ধাক্কা দিয়ে শ্রেণীচ্যুত করে দেয়।

স্কুলের বন্ধু অহিভূষণ চাটুজ্যেকে বারীণ-ভবানী-সতু-শশীরা একেবারেই আমল দেন না। কারণ অহি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির অ্যাসিস্টান্ট কনজারভেন্সি সুপারভাইজার হলেও তার প্রকৃত কাজ হচ্ছে জমাদারদের দেখাশুনো করা যা অভিজাত মধ্যবিত্তের কাছে কখনোই ভদ্রোচিত নয়। এরই মধ্যে অহির পদের নাম পরিবর্তিত হল। তার পদের নতুন নামকরণ হল - সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার। ফলে বন্ধুদের কাছে সে হল ব্রাত্য। পদের নাম অ্যাসিট্যান্ট কনসারভেন্সি সুপারভাইজার থাকাকালীন, অহি তার মধ্যবিত্তের অবিশিষ্ট মর্যাদাবোধটুকু বজায় রাখার তাগিদে কর্মক্ষেত্রে জমাদারদের সঙ্গে একটা দূরত্ব বজায় রাখত। কিন্তু পদের নাম পরিবর্তন ঠেকাতে না পেরে হতাশ অহি অভিজাত বন্ধুদের প্রিয়সঙ্গ ত্যাগ করে যথার্থভাবেই সর্দার স্কাভেঞ্জারের কাজে মন দেয়। এই ভাবে অহির সামাজিক পরিচয়ের পরিবর্তন ঘটে যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে ব্রাহ্মণ সন্তান পুলিন বাড়ুজ্যের কথা। আর্থিক কারণে উপার্জনের প্রয়োজনে পুলিনবাবু জুতোর দোকান খুলেছিলেন। প্রথমদিকে ব্রাহ্মণত্ব তথা মধ্যবিত্তের আভিজাত্য বজায় রাখার চেষ্টা তার ছিল। নিজে মালিকশ্রেণীর মানুষ হিসেবে একটা দুরত্ব বজায় রেখেছিলেন। জুতোর মাপ নেবার জন্য কারো পায়ে হাত দিতেন না, জুতো তৈরীর চামড়াও স্পর্শ করতেন না। কিন্তু সমাজের উচ্চবিত্তরা ততক্ষণে পুলিন বাড়ুয্যেকে পুলিন চামার হিসেবে ডাকতে শুরু করেছে। অবমাননায়, ভেঙে পড়ে পুলিন নিজেকে চামার হিসেবেই মেনে নেয় এবং মুচিদের সঙ্গে একাসনে বসেই দোকানে কাজ করে। এক শ্রেণীর মধ্যবিত্তের মিথ্যা অহংকারবোধ অন্য এক মধ্যবিত্তকে গোত্রচ্যুত করে দেয়। এই অধ্যায়েই আমরা দেখি, পুলিনবাবুর মেয়ে বন্দনা হাসপাতালে আয়ার কাজ নিয়েছে। তার এই ভূমিকায় সেও অবমাননা ও অবজ্ঞার শিকার হয়। হাসপাতালে আয়ার কাজে মধ্যবিত্তের আভিজাত্য কিছুতেই বজায় থাকে না। সমাজের কাছে বন্দনা জমাদারণী। মধ্যবিত্তের আক্রমণ বন্দনার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জামাদারণী আখ্যাতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি; মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং তাঁর স্ত্রী পরম দক্ষতায়, একটি ভদ্রঘরে বন্দনার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দেয়। বন্দনাও মধ্যবিত্তের পরিচয় বজায় রাখার জন্য আর রাখ-ঢাক করে নি। শশীদের বাড়ীতে নার্সের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করতে গিয়ে, পাকা জমাদারণীর মতই তার প্রাপ্য এক টাকার অতিরিক্ত, আট আনা আদায় করে নেয় বকশিশ হিসেবে। বন্দনাও টিঁকে থাকতে পারেনি মধ্যবিত্ত সমাজে। কোন প্রতিবাদ প্রতিরোধ ছাড়াই সে নিজেকে সরিয়ে নেয় মধ্যবিত্ত অভিজাত সমাজ থেকে।

মধ্যবিত্ত সমাজের উন্নাসিক মর্যাদাবোধ স্ক্যাভেঞ্জার সর্দার অহিভূষণ চাটুজ্যে, জুতোর ব্যবসায়ী পুলিন বাঁড়ুজ্যে এবং তার মেয়ে হাসপাতালের আয়া বন্দানাকে ভদ্রাসনে বসতে দেয়নি। আবার একই সঙ্গে অহি, পুলিনবাবু এবং বন্দনাও সমাজের আঘাতে সহজেই ভেঙে পড়েছে। গল্পে লেখক মধ্যবিত্ত সমাজের একজন মুখপাত্র হিসেবে ভবানীর মুখে মন্তব্য করেছেন —

> ...ঐ মানুষগুলিও কত সহজে ও সামান্য আঘাতে ভেঙে গেল। সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার বলা মাত্র হু হু করে নেমে গেল অহি। পুলিনবাবুও তাই। চামার নামে শুধু একটা কথার কথায় যেন চামার হয়ে গেলেন। আসলে ওদের মনুষ্যত্বটাই স্ক্যাভেঞ্জার ও চামার হয়ে গিয়েছিল অনেকদিন আগেই। আমরা শুধু মুখোসটা খুলে দিয়েছি। আমাদের দোষ নেই। অপবাদ দিয়ে আমরা ওদের মিথ্যে করে দিয়েছি, এ কথা সত্য নয়।[৯০]

তৃতীয় অধ্যায়ে মধ্যবিত্ত গোত্রচ্যুত অহি ও বন্দনার বিবাহ অনুষ্ঠান। সংসার সুখে মধ্যবিত্তের যেন একচেটিয়া আধিকার। ব্রাত্যজনেরা সে সুখের স্বপ্ন দেখে কোন অধিকারে? বারীণ সতু শশীরা আবার সক্রিয় হয় এ বিয়ে ভাঙতে। এবার তাদের সে চেষ্টা সফল হয় নি। যথানিয়মে অহির বন্ধু ভবানী-বারীণ-সতু-শশীদের ক্লাবে পৌঁছোয় 'দশ বারোটা রঙিন লেফাফাবদ্ধ চিঠি।[৯৩] যাব না, যাব না করেও বন্ধুরা একে একে যায় অহির বিয়েতে। ভবানীও যায় একা —

> আজই রাত্রে অহির বিয়ে। কেমন করে সঠিক তারিখটা জানতে পারলাম, জানি না। তবু বুঝলাম, পুলিনবাবুর বাড়ির দিকে চলেছি, একা একা, অন্ধকারে, চুপে চুপে — বরের আসরে বসে ছিল অহি। ছোট একটি সামিয়ানা, ওপরে একটি বেলোয়ারী ঝাড়ের আলো জ্বলছে। দুটি ছোট কার্পেট পাতা। তার ওপরে বসে আছে জনাকয়েক বরযাত্রী। মিউনিসিপ্যালিটির মুন্সি হীরালাল, রামনাথ পানওয়ালা, অক্ষয় ময়রার ছেলে গোলক আরো ঐ ধরণের কয়েকজন। সবাই বেশ ভাল সাজগোজ করে এসেছে, বেশ সজ্জনের মত বসে আছে। বড় কৃতার্থ খুশি ও গর্বিতভাবে বরযাত্রীরা বসেছিল। — আসরের দিকে আর বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারলাম না। আজ আবার অনেক বছর পরে অহির ঘুসি খেয়ে যেন রিং থেকে ছিট্‌কে বাইরে পড়েছি। ঐ রিং এর ভেতর অহি এখন সর্বেশ্বর। সামিয়ানার নীচে যেন এক ভিন্ন পৃথিবীর শান্ত আলো ফুটে রয়েছে। সেখানে সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে আছে অহি। দক্ষিণী ব্রজের চিবুক আর কপালের ওপরে চন্দনের ছিটে লেগে রয়েছে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে অহিটাকে![৯৪]

নেমন্তন্ন খাবার পর বন্ধুরা সবাই ফিরে এলেও, একদা বন্দনার কট্টর সমালোচক বারীণ থেকে যায়, কারণ অতিথি আপ্যায়নের অনেক কাজ তখনো সারা হয়নি। শেষাংশে ভবানী বলে —'আর বলবার কিছু নেই। বারীণকে রেখে আমরা রওনা হলাম। আরও কিছুক্ষণ থাকুক বারীণ। আজ যেন ওর অন্তরাত্মা চরমভাবে হেরে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছে।'[৬৫] উল্লেখযোগ্য এ গল্পে দুটি জিনিস লেখক দেখিয়েছেন। প্রথমত, অর্থনৈতিক বৈষম্যই শুধু শ্রেণীগত বিপর্যয়ের কারণ নয় – অহি তার দৃষ্টান্ত। পদের নাম পরিবর্তনের ফলেই সে ক্রমে এক শ্রেণী থেকে নিম্নতর শ্রেণীতে নেমে গেছে। যদিও অর্থনীতি তার মূলে কাজ করেছে। এই ভাঙনকে বলা যায় মানসিক। না হলে পুলিন বা তার মেয়ে কিংবা অহির এই অধোনমন এত ত্বরিত হতো না। এই ভাবে লেখক অর্থনীতির তত্ত্বকে পটভূমিতে রেখে তার মানস প্রকৃতি উন্মোচন করলেন। দ্বিতীয়ত, প্রতিক্রিয়া ঘটানো হল বারীন এবং তারই অন্যান্য সমধর্মী মানুষদের মনে।

এই গল্পে পেশার শ্রেণীবিন্যাসে সমাজের মানুষের নতুন শ্রেণীকরণ করবার অযৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মধ্যবিত্তের দ্বিধাদীর্ণ মানসিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে লেখক নি:সন্দেহে তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করেছেন। জগদীশ ভট্টাচার্যের মতে —

> ...মধ্যবিত্তের উন্নাসিকতা ও মিথ্যা মর্যাদাবোধের বিরুদ্ধে লেখকের বিদ্রুপবাণী যেমন তীব্র, সমাজস্তরে অবনীয়মান মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতিও তেমনি প্রীতিস্নিগ্ধ। তিন অধ্যায় গল্পটি সমাজচেতন সাহিত্যের নূতন অধ্যায় রচনা করেছে।[৯৬]

তিন অধ্যায় গল্পে মধ্যবিত্তের উন্নাসিক আভিজাত্য পুলিন বন্দনা বা অহিকে ঠেলে নামিয়ে দিয়েছিল

নীচুতলার জীবনে। সে গল্পে মধ্যবিত্তের এই হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা ছিল পরোক্ষ পরিহাসের আড়ালে। 'সুন্দরম' গল্পে আর সেই পরোক্ষ পরিহাসের আড়াল রইল না। তা একেবারে তীক্ষ্ণ তীব্র ব্যঙ্গের বিষয় হয়ে উঠলো। এই গল্পে মধ্যবিত্তের সেই উন্নাসিকতা এবং তার লালিত ধ্যান ধারণাকে সুবোধবাবু তীব্র ধিক্কার দিলেন। 'সুন্দরম' গল্পে সুবোধ ঘোষ মধ্যবিত্তের উন্নাসিক আভিজাত্যের শব ব্যবচ্ছেদ করে দেখিয়েছেন মধ্যবিত্তের তথাকথিত সভ্যতা, সামাজিকতা এবং সংস্কৃতিবোধ কতটা ভণ্ড ও নীতিহীন হতে পারে। মধ্যবিত্ত নীতিবোধের অন্তঃসারশূন্যতার এক উলঙ্গ প্রকাশ সুন্দরম।

ডাক্তার কৈলাশবাবুর ব্রহ্মচারী পুত্র সুকুমারের চারিত্রিক স্খলনকে এ গল্পের বিষয় হিসাবে নির্বাচিত করে মধ্যবিত্ত নীতি চেতনার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন গল্পকার। রিপুর তাড়নার কাছে পরিমার্জিত মধ্যবিত্ত চরিত্রের আত্মসমর্পণই এ গল্পে দেখান হয়েছে।

গল্পটিতে আমরা দেখি, সুকুমার নাভিমূলে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে অগুরু পুড়িয়ে ঘরের বাতাস পবিত্র করার পরই উপন্যাস পড়তে বসে। এই হল মধ্যবিত্ত চরিত্রের দ্বন্দ্বের সীমা। অনেক সাধ্য-সাধনার পর সে বিয়ে করতে সম্মত হলেও কোনো পাত্রীই তার পছন্দ হয় না। তার সৌন্দর্যের বিচারে উত্তীর্ণ হয় না কোন পাত্রীই। এ পর্যন্ত তার চরিত্রে কিছু দ্বিমুখী মানসিকতা থাকলেও চরিত্রের স্খলন প্রমাণ হয় নি। কিন্তু এই সুকুমারই যখন এক কুদর্শনা, কদর্য, নোংরা ভিখিরি তুলসীর সঙ্গে যৌন কামনা চরিতার্থ করে গোপনে, এবং তার ভদ্র মধ্যবিত্তের মুখোশ বজায় রাখার জন্য গর্ভিনী তুলসীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে, তখন সুকুমারের চরিত্র স্খলনের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। সম্পূর্ণ হৃদয়াবেগশূন্য হয়ে শুধুমাত্র যৌন তাড়নার কারণেই যে সুকুমার তুলসীকে সম্ভোগ করেছে, তাতে পাঠকের কোন সন্দেহ থাকে না, গল্পকারের দেওয়া তুলসীর রূপের বর্ণনায়। —

> তুলসী একটা কলাই-করা থালা হাতে চুপ করে বসে আছে। পরিধানে খাটো একটা নোংরা পর্দার কাপড়, বুকের ওপর থেকে গেরো দিয়ে ঝোলান। আভরণের মধ্যে একটা কৌড়ির তাবিজ।
>
> দেখবার মত চেহারা এই তুলসীর! বছর চৌদ্দ রয়স, তবু সর্বাঙ্গে একটা রূঢ় পরিপুষ্টি। ডাকিনীর টেরাকোট্টা মূর্তির মত কালি-মাড়া শরীর। মোটা থ্যাবড়া নাক। মাথার বেঢপ খুলিটা যেন একটা চোট লেগে টেরে বেঁকে গেছে। বড় বড় দাঁত জুড়ে যেন একটা জন্তুর হিংসে ফুটে রয়েছে। মুখের সমস্ত পেশী ভেঙে-চুরে গেছে, ছন্নছাড়া বিক্ষোভে। এ মুখের দিকে তাকিয়ে দাতাকর্ণও দান ভুলে যাবে, গা শিরশির করবে।[৯৭]

তুলসীর শব লাসকাটা ঘরে এসে পৌঁছোয় ময়না তদন্তের জন্য। পুত্রের ঘৃণ্য যৌনাচারের বলি তুলসীর বুকে পেটে ছুরির ফলা চালিয়ে ডাক্তার কৈলাসবাবু প্রত্যক্ষ করলেন তার দেহের ভেতর স্তরে স্তরে বিন্যস্ত অন্তর সৌন্দর্য —

> বাতিটা কাছে এগিয়ে নিয়ে কৈলাশ ডাক্তার তাকিয়ে রইলেন – প্রবাল পুষ্পের মালঞ্চের মত বরাঙ্গের এই প্রকট রূপ, অছদ্ম মানুষের রূপ। এই নবনীত-পিন্ড মস্তিষ্ক, জোড়া শতদলের মত উৎফুল্ল হৃৎকোষের অলিন্দ আর নিলয়। রেশমী ঝালরের মত শত শত মোলায়েম ঝিল্লী। আনাচে কানাচে যেন রহস্যে ডুব দিয়ে আছে সুসূক্ষ্ম কৈশিক জাল।
>
> কৈলাশডাক্তার তেমনই বিমুগ্ধ হয়ে দেখলেন – থরে বিথরে, সাজানো সারি সারি রক্তিম পর্শুকা। বরফের কুচির মত অল্প অল্প মেদের ছিটে। মজ্জাস্থি

ঘিরে নেমে গেছে প্রাণদা নীলার প্রবাহিকা।

কৈলাশডাক্তার বাতিটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে আর দু'চোখ অপলক করে দেখতে থাকেন – খন্ডস্ফটিকের মত পীতাভ ছোট বড় কত গ্রন্থির বীথিকা। প্রশান্ত মুকুটধমনী ! সন্ধিতে সন্ধিতে সুপ্রচুর লসিকার বুদ্বুদ। গ্রন্থিক্ষীরে নিমিক্ত অতি অভিরাম এই অংশুপেশীর স্তবক আর তরুণাস্থির সজ্জা ঝাঁপিখোলা রত্নমালার মত আলোয় ঝলমল করে উঠলো।[৯৮]

কিন্তু তুলসীর মৃত্যুর কারণ তখনও স্পষ্ট হয়নি। আবিষ্ট ডাক্তার আবার হাতের কাজে মন দিলেন—

ছুরির ফলার এক আঘাতে দু'ভাগ করা হ'ল পাকস্থলী। এবার কৈলাশ ডাক্তার দেখলেন, কোথায় মৃত্যুর কামড়। ক্লোমরসে মাখা একটা অজীর্ন-পিন্ড – সন্দেশ পাউরুটি আর...আর বেলেডোনা।[৯৯]

নিশ্চিন্ত হলেন ডাক্তার এটা সাধারণ মৃত্যু নয় – 'মার্ডার'। আবার টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন ডাক্তার —

ছোঁ মেরে কাঁচিটা তুলে নিয়ে তুলসীর তলপেটের দুটো বন্ধনী ছেদ করলেন। নিকেলের চিম্‌টের সুচিক্কণ বাহুপুটে চেপে নিয়ে, স্নেহাক্ত আগ্রহে ধীরে ধীরে টেনে তুলে ধরলেন পরিশঙ্কে ঢাকা সুডৌল সুকোমল একটি পেটিকা। মাতৃত্বের রসে উর্বর, মানব জাতির মাংসল ধরিত্রী। সর্পিল নাড়ীর আলিঙ্গনে ক্লিষ্ট ও কুঞ্চিত, বিষিয়ে নীল হয়ে আছে একটি শিশু আশা।[১০০]

গল্পের সমাপ্তিতে পাঠকের কাছে তুলসীর হত্যাকারীকে চিহ্নিত করতে, পাঠককে চম্‌কে দিয়ে যদু ডোম তারই উপযুক্ত ভাষায় কৈলাশ ডাক্তারের হত-বিহ্বল অবস্থাকে কটাক্ষ করে বলে — 'শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে।'[১০১]

যদু ডোমের এই বক্রোক্তি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিভূ সুকুমারের সৌন্দর্যচেতনাকে তীব্র ব্যঙ্গে বিধ্বস্ত করেছে। সুন্দরম গল্পে সুবোধ ঘোষ সৌন্দর্যের এক নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন এক শিল্পী চিকিৎসকের দৃষ্টিতে। মধ্যবিত্তের মুখোশ খুলে দেওয়ার প্রচেষ্টার পাশাপাশি সুবোধ ঘোষ শিল্পীর দৃষ্টিতে মাতৃগর্ভে শিশুর অবস্থানকে দেখেছেন 'মাতৃরসে উর্বর মানব জাতির মাংসল ধরিত্রী' রূপে। বাংলা কথাসাহিত্যে এ এক অনন্য অভিজ্ঞতা। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরমের মৌলিকতা ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে বলেছেন —

সুন্দরম গল্পে সৌন্দর্য সম্বন্ধে ময়না-ঘরের শবব্যবচ্ছেদের ভিত্তিতে গঠিত এক নূতন আদর্শ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রহিরাবরণের ছদ্মবেশ ভেদ করিয়া দেহান্ত:পুরের নাড়ী-শিরা-ধমনীর জটিল জালবেষ্টনীর মধ্য দিয়া, অস্থিমজ্জাবিন্যাসের আশ্রয়ে দৈহিক রূপের এক অভিনব মূর্তি প্রকটিত হয়, যাহা মানবের স্থূল, অনভ্যস্ত দৃষ্টির নিকট এখনও অননুভূত। সৌন্দর্য সম্বন্ধে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে, সূক্ষ্মরুচি সুকুমারের কদর্যদর্শন ভিখারীর মেয়ের প্রতি আকর্ষণ লেখকের অপ্রত্যাশিত চমকপ্রদ পরিণতি সৃষ্টি করিবার অদ্ভুত নৈপুণ্যের পরিচয়।[১০২]

সমালোচক অলোক রায় এই গল্পেই প্রত্যক্ষ করেছেন সুবোধ ঘোষের রোমান্টিকতা —

সুন্দরম গল্পে সুকুমারকে প্রথমে মনে হয় চমৎকার ক্যারিকেচার, ব্রহ্মচর্য পালনের পরিণামে – মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই – এবং সুন্দরী

পাত্রীর সন্ধান ! কিন্তু দেহধর্মের তাড়নায় ভিখারিণী তুলসীকে তার প্রয়োজন। তত্ত্ব প্রতিপাদনের দিক দিয়ে ঠিক আছে - কৈলাশ ডাক্তার তুলসীর শব ময়নাতদন্তকালে চিন্তা করেন —কুৎসিতা তুলসীর ঐ রূপের পরিচয় কে রাখে ! তবুও মানুষের এ তিমিরদৃষ্টি হয়তো ঘুঁচে যাবে একদিন। আগামীকালের কোন প্রেমিক বুঝবে ঐ রূপের মর্যাদা। নতুন তাজমহল হয়তো গড়ে উঠবে সেদিন ! — একেই বলতে চেয়েছি সুবোধ ঘোষের রোমান্টিকতা। এর সঙ্গে গল্পের অন্তিম চমকপ্রদ মন্তব্য খাপ খায় না - 'শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে'। তবুও সুন্দরম সুবোধ ঘোষের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প, কারণ আদর্শবাদী লেখকের সমাজ চেতনার এক চূড়ান্ত নিদর্শন কৈলাশডাক্তার।[১০৩]

অলোকবাবু যথার্থভাবেই রোমান্টিক সুবোধ ঘোষকে আবিষ্কার করেছেন এই গল্পে সন্দেহ নেই। তবে যদু ডোমের অন্তিম উক্তি - 'শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে' - বিষয়ে তাঁর মত - 'এর সঙ্গে গল্পের অন্তিম চমকপ্রদ মন্তব্য খাপ খায়না' সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ থেকে যায়। কারণ প্রথমত এই মন্তব্যটি দিয়েই লেখক তুলসীর করুণ পরিণতির জন্য দায়ী সুকুমারকে পাঠকের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। যা গল্পের অন্তিম অংশ হলেও গল্পের প্রধান নিয়ামক। দ্বিতীয়ত - মন্তব্যটির ভাষা আপাত অশালীন হলেও যথেষ্ট বাস্তবোচিত। কারণ মন্তব্যটি করেছে যদু ডোম। তার মুখে কিছু মার্জিত শব্দ বসিয়ে মন্তব্যটি পেশ করা হলে কৃত্রিমতার অভিযোগ উঠতো। উপরন্তু 'অপ্রত্যাশিত চমকপ্রদ পরিণতি' যা গল্পটিকে এক নতুন মাত্রা দান করে যথেষ্ট উপভোগ্য করে তুলেছে, তা থেকে পাঠকেরা বঞ্চিত হতেন।

গোত্রান্তর গল্পে শিক্ষিত আপাত আদর্শনিষ্ঠ মধ্যবিত্ত মানুষের পরিণতিও কম বীভৎস বা কম ঘৃণ্য নয়। অর্থনীতিতে এম,এ, ডিগ্রীধারী বেকার সঞ্জয় অর্থনীতির কষ্টিপাথরে যাচাই করে বিশ্বাস করে যে, সে সংসারে স্নেহ, মায়া, মমতা, প্রেমের পেছনে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্কটা ধরে ফেলেছে —

ওপর থেকে দেখতে কী সুন্দর ! মা, বাপ, ভাই, বোন, আপনজন, আত্মীয়তার নীড়। কত গালভরা প্রবচন ! একটু আঁচড় দিলেই চামড়া ভেদ করে দেখা দেয় নির্লজ্জ মহাজনের মাংস ! সঞ্জয় এক এক সময় হেসে ফেলে। তবে এ তত্ত্ব নতুন কিছু নয়। ইতিহাসের শিরায় শিরায় এই রীতি গড়িয়ে আসছে বহু হাজার বছর ধরে। সেই গুহা-মানবের গৃহধর্ম থেকে শুরু করে মকতপুরের দত্তবাড়ির সংসারকলা। প্রেম-প্রণয় আত্মীয়তা — লঙ্কা গুড় আদা মরিচ। যে ক্রেতা সেই আপণজন।[১০৪]

তাই অনেক দূরদেশে রতনগঞ্জে, রতনলালের সুগার মিলে ত্রিশ টাকা মাইনের ক্যাসমুন্সীর চাকরী নিয়ে চলে যায় সঞ্জয়। কারণ — 'পশুর মত নিছক একটা গোত্রমোহের তাড়নায় সমস্ত জীবনের ইষ্ট এখানে সে বাঁধা রাখতে পারবে না। সঞ্জয় বুঝেছে, তার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন গোত্রান্তর !'[১০৫] আত্মসর্বস্ব, অর্থান্বেসী সঞ্জয় লোডিং মুহুরী নেমিয়ার ও তার বোন রুক্মিণীর পাল্লায় পড়ে। অতি সহজেই রুক্মিনীকে আপন করে পায় সে। লেখকের দৃষ্টিতে —

সত্যিকারের গোত্রান্তর হয়েছে সঞ্জয়ের। পাখী শুধু তার ডাকার আবেগে যেমন করে সঙ্গিনী লাভ করে, রুক্মিনী তেমনিভাবে এসেছে তার কাছে। তার লাঞ্ছিত পৌরুষকে এই পথের মেয়েটাই সসম্মানে লুফে নিয়েছে। জ'লো দাম্পত্যের চেয়ে এ ঢের ভাল ! তার বিদ্রোহের প্রথম পরিচ্ছেদ পূর্ণ হয়েছে।'[১০৬]

বিশ্বের বাজারে চিনির দাম পড়তে শুরু করে। কোলকাতা বন্দরে পৌঁছায় জাভা চিনি। বিশ্ব বাণিজ্যের আঘাত এসে আছড়ে পড়ে রতনলালের মিলেও। মিলে নোটিশ জারী করে মাইনে ও মজুরী ছেঁটে দেওয়া হয় চল্লিশ শতাংশ। সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম পরিপোষক মূল্য থেকে অনেক অনেক কম দামে আখ চাষীদের থেকে আখ কিনতে চায় মিল মালিক। প্রলয় আসন্ন। সঞ্জয়ের 'অপমানিত প্রতিভা যেন ব্যর্থ রোষে ফণা নামিয়ে দিন গুনছিল। এইবার ফিরে ছোবল দিতে হবে, যতখানি বিষ ঢালতে পারা যায়।'[১০৭]

নেতৃত্বের দাবীদার কেউ নেই। সবাই একান্ত বিপদের দিনে শিক্ষিত বাঙালী বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বুড়ো বটের তলায় পুরোন শিবালয়ের সিঁড়িতে দিশাহীন আখ চাষীদের প্রতি সঞ্জয়ের নির্দেশ — ''কেউ ফসল বেচবে না...লড়াই শুরু করে দাও।...বটপাতা ছুঁয়ে সকলে কসম খাও।'[১০৮]

মিলের মেসিন বন্ধ। চাষীর ঘরে খাবার নেই। গো-মড়ক লেগেছে। চুরাশী পরগণার ওপর শকুন উড়ছে। গৃহস্থের গরু মোষ বিকিয়ে যাচ্ছে জলের দরে। অসুস্থ রুগ্ন, সর্বজনপরিচিত অপদার্থ নেমিয়ার গোটা চুরাশী পরগনা ছুটে বেড়িয়ে চাষীদের মনোবল অটুট রাখে। চাষীরা আন্দোলনের নেতা সঞ্জয়ের কাছে এলো পরবর্তী নির্দেশের জন্য। সঞ্জয় চাষীদের কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে বলে। কিন্তু আন্দোলনের গতি প্রকৃতি দেখে চিন্তায় পড়ে যায় সঞ্জয়। তার হিসেবমত ঘটনাগুলো ঘটছে না —

> রায় বাহাদুর এখনো তাকে ডাকলো না, এই সঙ্কটে একটা পরামর্শের জন্য। আভাসে সঞ্জয় একদিন জানিয়েও ছিল — যদি বলেন তো কিষাণদের আমি শান্ত করি।
>
> এদিকে রুক্মিণী এক কাঁটা গিলে বসে আছে। দুদিকেই একটা ব্যবস্থা এবার করা উচিত।[১০৯]

লোহার মূর্তির মত নেমিয়ার এসে দাঁড়ায়। মিলের ক্যাশঘরের চাবি চায় সঞ্জয়ের কাছে। 'গোত্রহীন মানুষের স্বরূপ দেখে আজ সঞ্জয় আঁতকে উঠেছে, বসে আছে মাথা নীচু করে। যেন অতি আসন্ন বিপ্লবের ফরমান নিয়ে দাঁড়িয়েছে নেমিয়ার। চাবির তোড়া নিয়ে যায় সে। অবস্থাটা যে এত গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে তা অনুমান করতে পারেনি উচ্চশিক্ষিত সঞ্জয়। '...সার্কাস দেখবার জন্য যে সিংহকে খাঁচার বাইরে আনা হয়েছে, একটু সামান্য খোঁচা দিতেই সেটা যে বুনো হাঁক ছেড়ে অবাধ্য হয়ে উঠবে, কে এতটা ভেবেছিল ?''[১১০]

সঞ্জয় দৌড়লো নেমিয়ারের বাড়ির দিকে। জানালা দিয়ে দেখলো অসহ্য যন্ত্রণার পর রুক্মিণী প্রসব করল এক শিশুসন্তান। অন্য ঘরে নেমিয়ার রুটি ও পচাই খাচ্ছে সামনে রাখা এক ভোজালি —'এ ঘরে ভাই, ও ঘরে বোন। পুরাকল্পের বর্বর পৃথিবীর দু'জন কুপিত ডাইন ও ডাইনী যেন তুক্ করে সর্বনাশের আহ্বান করছে !'[১১১]

সঞ্জয় এক দৌড়ে মিলে গিয়ে জানায়, ছুরি দেখিয়ে ক্যাশঘরের চাবি নিয়ে গেছে নেমিয়ার। ক্যাশ ঘরে পাহারা বসানো হল। নেমিয়ারকে হাতেনাতে ধরে উপযুক্ত শাস্তি দেবার ব্যবস্থাও হ'ল। মালিক তার বিশ্বাসী ভৃত্যকে পুরস্কৃত করে। ইমানদার ক্যাশমুন্সী সঞ্জয় হাত বাড়িয়ে পঞ্চাশ টাকা বকশিস নিয়ে মনিবের দেওয়া ঘোড়ায় চড়ে ছেড়ে পালালো বিপ্লবক্ষেত্র চুরাশী পরগনা। গল্পের শেষ স্তবকে গৃহস্থের মুর্গি চোর-এর ধূর্ত শেয়ালের সঙ্গে, সঞ্জয়কে একই ঘাটে জল খাইয়ে, গল্পকার সুবোধ ঘোষ মধ্যবিত্তের স্বার্থান্বেষী চরিত্রকে নগ্ন করে দিয়েছেন —

> সঞ্জয় ঘোড়া থেকে নেমে স্রোতের ধারে বসে আঁজলা ভরে জল খেল। গেরস্থের মুর্গি চুরি করে একটা শেয়াল ভেজা বালির উপর বসে গোঁপের রক্ত চাটছিল। সেও জল খাবার জন্য স্রোতে মুখ নামাল।[১১২]

গোত্রান্তর গল্প সম্পর্কে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য — 'ভীরু স্বার্থপর মধ্যবিত্ত সঞ্জয়ের সঙ্গে ঐ মুর্গি-চোর শেয়ালের কোনো পার্থক্য নেই। ইচ্ছে করলেই মধ্যবিত্ত তার গোত্র বদল করতে পারে না।'[১১৩] জগদীশ ভট্টাচার্যের মতে —

> বিপ্লবের এ ঝড় আত্মসুখান্বেষী মানুষের সহ্যের অতীত। তাই সঞ্জয় শ্রমিকদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে ধূর্ত জম্বুকের মতই পালিয়ে আত্মরক্ষা করল। এ কাহিনী একটি বিশেষ ব্যক্তি-মানুষেরই অধ:পতনের কাহিনী। কিন্তু এ যুগের অর্থপরায়ণতার একটি সম্ভাব্য পরিণাম বর্ণনায় লেখকের সন্ধানী দৃষ্টি বিপ্লবী ধনবিজ্ঞানের মর্মস্থল পর্যন্ত উদ্ঘাটিত করেছে।[১১৪]

মধ্যবিত্তের চরিত্র অঙ্কনে সুবোধ ঘোষ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযাত্রী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যাকে ঘুষ দিতে হয়' এবং 'নমুনা' গল্পদুটির মতো সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম' এবং 'গোত্রান্তর' গল্পেও মধ্যবিত্ত চরিত্রের দ্বিধাদীর্ণ মানসিকতা দেখানো হয়েছে। এই চারটি গল্পের মধ্যেই মধ্যবিত্তের চরিত্রে, ভঙ্গুর-মেকী আদর্শবাদ এবং 'গৃহস্থের মুরগী-চোর' শেয়ালের স্বার্থপর মনোবৃত্তি অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে।

'যাকে ঘুষ দিতে হয়' গল্পে সুশীলা স্বামী মাখনের সঙ্গে ঝকঝকে গাড়ি চড়ে বেড়াতে বের হয়। ঠিকাদারি ব্যবসায়ে সম্প্রতি মাখনের সাফল্য এসেছে। এখন টাকা বাড়ছে, বিলাস বাড়ছে, বাড়ছে আরও টাকার প্রয়োজন —

> সুশীলা মধ্যবিত্ত ভালোঘরের মেয়ে, পরীক্ষায় ভালো পাশ-করা গরীবের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হল। ওমা, এত ভালো ছেলের চাকরী কিনা একশ টাকার। কত অবজ্ঞা, অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা স্বামীকে দিয়েছে সুশীলার মনে পড়ে।[১১৫]

সুশীলা-মাখনের আজকের এই বাড়-বাড়ন্তর পেছনে প্রধান মানুষটি দাস সাহেব। তারই করুণায় মাখনের কন্ট্রাক্টপ্রাপ্তি এবং অর্থাগম। মাখন তা স্বীকার করে। তবে বলে — '...কিন্তু আমি না থাকলেও আর দাস সাহেব ফাঁপতো না। কি ঘুষটাই দিয়েছি শালাকে!' সে যাই হোক দাস সাহেবের প্রতি অটুট সমীহ এই দম্পতির। সুশীলার মতে —'এই মহাপুরুষটি তার স্বামীকে ট্রামে ঝোলার অবস্থা থেকে এই দামী মোটরে চড়ার অবস্থায় এনেছেন। শ্বশুর ভাসুর ইত্যাদি গুরুজনের চেয়েও ইনি গুরুজন।'

রাস্তায় হঠাৎ গায়ে পড়ে সুশীলা এবং মাখনের সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসে দাস সাহেব। সুশীলার সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ জমিয়ে বসে। সহ্য করতে হয় মাখনকে। একটা লোভনীয় কন্ট্রাকট পাইয়ে দেবার লোভ দেখিয়ে সস্ত্রীক মাখনকে বাড়িতে চা খেতে নিয়ে যায় অবিবাহিত দাস সাহেব। বাড়িতে পৌঁছেই মাখনের সঙ্গে কন্ট্রাকট নিয়ে আলোচনা শুরু করে। পাশের ঘরে গিয়ে হাওয়ার্ডের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলে দাস সাহেব। এদিকে সুশীলা-মাখন একান্তে আলোচনা করে, লাভ কত হতে পারে এ কন্ট্রাকটে সোয়া লাখ – না আরো বেশী! দাস সাহেব টেলিফোনে কথা সেরে মাখনকে বলে, তখনই কিছু কাগজ নিয়ে হাওয়ার্ডকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে আসার জন্য —

> হাওয়ার্ডের সঙ্গে কথা বললাম। আপনাকে গিয়ে একবার কথা বলতে হবে। কাগজপত্রগুলি নিয়ে আপনি এখুনি চলে যান। দুটো সই করিয়ে নিয়ে আসবেন। ...আমরা ততক্ষণ গল্প করি। ...সুশীলাকে বলে – উনি ঘুরে

আসুন, আমরা ততক্ষণ আলাপ জমাই। আরেক কাপ চা খাবেন ?[১১৬]

অত্যন্ত সম্ভাবনাময় মুহূর্ত। সুশীলা-মাখন, কন্ট্রাকট-মুনাফার ফাঁদে না পড়ে নিজেদের সম্ভ্রম, সম্মান, শালীনতা রক্ষা করতে পারত আনায়াসেই। 'যাকে ঘুষ দিতে হয়' তাকে ঘুষ না দিলেও পারত, তবে সে ক্ষেত্রে তাদের হারাতে হত লক্ষাধিক টাকা মুনাফা লাভের স্বপ্ন। একটি রাখলে অন্যটি হারাতে হবে। তৃতীয় কোন পছন্দ নেই। মধ্যবিত্ত দম্পতি, সুশীলা মাখন এই সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অর্থলোলুপতা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। যদিও দাস সাহেবের প্রস্তাবে মনে হয়েছিল পাখাটা যেন দুজনেরই মাথার ভেতর 'অকথ্য বিশৃঙ্খল উদ্ভট আওয়াজ'[১১৭] করে উঠেছে, তবু মাখন সুশীলাকে বলে – 'তুমি চা'টা খাও, আমি চট করে ঘুরে আসছি। সুশীলা ঢোক গিলে বলে – দেরী কোরো না।'

সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম'-এ সুকুমারের অদম্য রিপুর তাড়নাকে এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গল্পে সুশীলা মাখনের অদম্য অর্থলোলুপতা, সুযোগসন্ধানী, ভন্ড মধ্যবিত্ত চরিত্রকে একেবারে নগ্ন করে দিয়েছে। তবে মধ্যবিত্ত মানস বিশ্লেষণে সুবোধ ঘোষের তুলনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক বেশী প্রত্যক্ষ এবং তীক্ষ্ণ। সে তুলনায় সুবোধ ঘোষের এই প্রচেষ্টা কিছুটা উদার এবং শৈল্পিক, সন্দেহ নেই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নমুনা' গল্পে রয়েছে টাকার থলির কাছে মধ্যবিত্তের আদর্শ এবং সনাতন বিশ্বাসভঙ্গের ঘটনা। মেয়েদের আশ্রম চালাবার নামে কালাচাঁদ মেয়েমানুষের ব্যবসা করে। কালাচাঁদ থাকে তার পারিবারিক বাড়িতে। দূরে অন্য দুটি ঘর ভাড়া নিয়ে সতের-আঠারজন মেয়েকে দিয়ে সে ব্যবসা চালায়। দুর্ভিক্ষের বাজারে শহরে মেয়েদের চাহিদা যেমন বাড়ছে, মেয়েদের দাম তেমনই কমছে মফ:স্বলে। কালাচাঁদের পক্ষে সস্তায় মেয়ে কেনার এটাই উপযুক্ত সময়।

হত দরিদ্র ব্রাহ্মণ কেশব চক্রবর্ত্তীর কঙ্কালসার কুমারী কন্যা, শৈলর ওপর নজর পড়ে কালাচাঁদের। '...কিছুদিন ভাল খেতে দিলেই গায়ে মাংস উথলিয়ে উঠবে।' কিছু চাল-ডাল-মাছ-তরকারী দিয়ে কেশবকে টোপ দেয় সে। নিরুপায় কেশব শেষপর্যন্ত রাজীও হয়। নির্দিষ্ট দিনে, গভীর রাতে কালাচাঁদ এলো। গাড়ীতে চেপে তিন বস্তা চাল, অন্যান্য সামগ্রী এবং শৈলর জন্য নতুন জামা-কাপড় নিয়ে এসেছে সে। হতভাগ্য পিতা কেশব একটি সর্তে শৈলকে কালাচাঁদের হতে তুলে দিতে রাজী হয়। কেশব কালাচাঁদকে বলে — 'আমি শুধু নারায়ণ সাক্ষী করে শৈলকে তোমার হাতে সঁপে দেব। তারপর ওকে নিয়ে তুমি যা খুশী কোরো, সে তোমার ধর্মো। আমার ধর্মো রাখো। এটুকু করতে দাও।'[১১৮] কেশবের 'ন্যাকামিতে' বিরক্ত হয়ে কালাচাঁদ বলে 'যা করবার করুণ চট্‌পট্। —

> নিবু নিবু প্রদীপের আলোয় কালাচাঁদ আর শৈলর হাত একত্র করে কেশব বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে। কালাচাঁদ দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে করতে তাগিদ দেয়—শীগগির করুণ। ঘরে যে ঠাকুর আছেন সে জানতো না। ঠাকুর দেবতার সঙ্গে এ সব ইয়ার্কি ফাজলামি তার ভাল লাগে না। একটু ভয় করে। মনটা অভিভূত হয়ে পড়তে চায়। গৃহস্থের শান্ত পবিত্র অন্ত:পুরে জলচৌকিতে শুকনো ফুল-পাতায় অধিষ্ঠিত দেবতা, সদ্‌ব্রাহ্মণের মন্ত্রোচ্চারণ, নির্জন মাঠঘাট প্রান্তরের মফ:স্বলে পুঞ্জীভূত মধ্যরাত্রির নিজস্ব ভীতিকর রহস্য তাকে কাবু করে দিতে চায়। মনে মনে নিজেকে গাল দিতে দিতে সে ভাবে এ বুড়োর এ পাগলামিতে রাজী না হওয়াই তার উচিত ছিল।[১১৯]

নারায়ণ সাক্ষী করে মন্ত্রোচ্চারণের পর হাত ধরে শৈলকে টেনে নিয়ে গেলেও কালাচাঁদের মনে এক অদ্ভুত অনুভূতির সৃষ্টি হয়। শৈলকে আর অন্য সতেরটা মেয়ের মত আদিম ব্যবসায়ে নামতে চায় না সে। —'শৈলকে দেখতে ডাক্তার আসে। তার জন্য হাল্কা দামী ও পুষ্টিকর পথ্য আসে। অন্য

মেয়েগুলিকে তার কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয় না। কালাচাঁদ তার সঙ্গে অনেক সময় কাটায়।' কালাচাঁদ শৈলকে বাড়ি নিয়ে যেতে চায়। এ পাপ ব্যবসায় শৈলকে লাগাতে মন চায় না তার —

> মনটা খুঁতখুঁত করছে। ধরতে গেলে ও আমার বিয়ে করা বৌ। ঠাকুরের সামনে, ওর বাবা মন্ত্র পড়ে ওকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। আমি বলি কি, বাড়ী নিয়ে যাই।[১২০]

শৈলকে বিশেষ মর্যাদা দেবার প্রশ্নে, কালাচাঁদের সঙ্গে, তার বৌদি তথা বাড়িউলি মন্দোদরীর সঙ্গে মতান্তরও হয়েছে, হয়েছে 'অশ্লীল, কুৎসিত কলহ'। কালাচাঁদের শৈলপ্রীতিতে মন্দোদরীর চোখে দেখা দিল 'কুটিল কালোচাউনি'।

একদিন শৈলকে নিজ বাড়িতে নিয়ে যেতে গিয়ে বাধা পায় কালাচাঁদ। মন্দোদরী জানায় শৈলর ঘরে লোক ঢুকেছে। কালাচাঁদের মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। মনে হল মন্দোদরীকে সে বুঝি খুন করে ফেলবে। শৈলর সঙ্গে ধর্ম সাক্ষী রেখে বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের প্রতি কালাচাঁদের অন্তরে যে এক রক্ষণশীল ধারণা এবং দায়িত্ববোধের সৃষ্টি হয়েছিল, তা মুহূর্তেই নি:শেষ হয়ে পড়ে যখন মন্দোদরী শৈলকে গ্রাহকের কাছে তুলে দেওয়ার পরিবর্তে একতাড়া নোট কালাচাঁদের হাতে তুলে দেয়।

> মন্দোদরী নি:শব্দে মোটা একতাড়া নোট বার করে কালাচাঁদের সামনে ধরল। একটু ইতস্তত করে নোটগুলি হাতে নিয়ে কালাচাঁদ সন্তর্পণে গুণতে আরম্ভ করল। গোণা শেষ হবার পর মনে হল সে যেন মন্ত্রবলে ঠান্ডা হয়ে গেছে।[১২১]

এই গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সরাসরিভাবে দেখিয়েছেন, অর্থের লোভে কিভাবে একজন মধ্যবিত্ত তার আদর্শচিন্তা, তার ধর্মীয় বিশ্বাস মুহূর্তে বিসর্জন দিতে পারে। মধ্যবিত্ত চরিত্রের স্খলনের 'নমুনা' তুলে ধরতে কোথাও কোন বাড়তি শব্দ ব্যাবহার করেন নি, কোন রূপকের আশ্রয়ও নেন নি।

'নমুনা'র সঙ্গে যদি আমরা সুবোধ ঘোষের 'গোত্রান্তর' গল্পটির তুলনামূলক আলোচনা করি তবে দেখব, দুটি গল্পেরই বিষয়বস্তু মধ্যবিত্তের স্বার্থপরতা এবং অবশ্যই অর্থলোলুপতা। 'নমুনা'র কালাচাঁদ যেমন এক তাড়া নোটের লোভে তার বিবাহিতা স্ত্রী শৈলকে বাজারের পণ্য করে তুলতে দ্বিধা করেনি, ঠিক তেমনি, গোত্রান্তরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সঞ্জয়ও নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আখ চাষীদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনকে পেছন থেকে ছুরি মেরে, সদ্যজাত সন্তান ও প্রণয়ীকে ফেলে, পঞ্চাশ টাকা ঘুষ নিয়ে পালিয়েছে। একই চরিত্র। শুধুমাত্র পাত্র-পাত্রী, পরিবেশ এবং পরিস্থিতির ভিন্নতা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুবোধ ঘোষ দুজনেই মধ্যবিত্তের মুখোশ খুলে দিয়েছেন।

দুজনের এই দুটি গল্পে যে মূল পার্থক্য ধরা পড়ে তা হলো – সুবোধ ঘোষ স্বার্থপর সঞ্জয়ের চরিত্রটিকে এক মুরগী চোর শেয়ালের সঙ্গে একধর্মী করে এমনভাবে গল্পটি শেষ করেছেন, যার ফলে শিল্প সৌন্দর্যের বিচারে গল্পটি এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

'নির্বন্ধ' গল্পেও সুবোধ ঘোষ দেখিয়েছেন যে মধ্যবিত্তের গোত্রান্তর সহজে হয় না। প্রয়োজনের মুহূর্তে মধ্যবিত্ত চরিত্রের স্বার্থচিন্তা, সযত্ন লালিত আদর্শবাদকে গলা টিপে হত্যা করে অনায়াসে।

চিত্রপুর থানার দারোগাবাবু বিভূতি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। জল হাওয়া ভাল হলেও, টিকাইত ধনঞ্জয় গোঁসাইয়ের আইন বহির্ভূত ক্ষমতা ও খবরদারী সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে তার —

> প্রথম প্রথম বিভূতি তার অফিসারি স্পর্ধা নিয়েই চলতে শুরু করেছিল। গোঁসাইয়ের মাত্র দু-একটি প্যাঁচের দাপটে সে স্পর্ধা নুইয়ে এল মন্ত্রশান্ত

ভুজঙ্গের মত। গোঁসাই এ পর্যন্ত চারজন দারোগার চাকরী খেয়েছে। গোঁসাইয়ের নতুন মোটর গাড়ির চাকাটার দিকে তাকিয়ে বিভূতি নিজেকে শান্ত করে আনে — অসম্ভব নয়, ঐ চোদ্দ-হাজারী গাড়ির চাকার তলায় নব্বই টাকার দারোগাগিরি গুড়ো হয়ে যেতে কতক্ষণ ?[১২২]

থানার ছোট জমাদার আকবর খাঁ, কড়ে খাঁ নামেই পরিচিত আসামীদের ওপর বলপ্রয়োগ করে স্বীকারোক্তি আদায় করে নিতে কড়ে খাঁ অদ্বিতীয় এবং অনিবার্য। চঞ্চল শিশুরা বন্দীদের ওপর কড়ে খাঁর অমানুষিক অত্যাচারের গল্প শুনে ভয়ে চোখ বোঁজে। এই কড়ে খাঁও পনের বছর ধরে গোঁসাইয়ের বেআইনী ক্ষমতার বহর দেখে দাঁতে দাঁত ঘষে। আল্লার কাছে ইনসাফ চায় — ...দেখি আর কতদিন! পেন্সন নেব না হুজুর -- জিন্দেগি পর্যন্ত দেখবো, এই বেইজ্জতির মার কতদিন চলে, কবে ইনসাফ হয়।'[১২৩]

চিত্রপুরের ছোট হিস্যার গরীব গোঁসাইয়ের স্ত্রী, অতি সুন্দরী। তাকে হত্যা করেছে ধনঞ্জয় গোঁসাই। লাস গুম করা হয়েছে, পাত্তা নেই। বিভূতি মাঝ রাতে খবর পেয়েই ছুটেছে দলবল নিয়ে। সদর্পে থানায় ফিরেও এসেছে, 'চিত্রপুরের বিধাতা' ধনঞ্জয় গোঁসাইকে গ্রেপ্তার করে। ভোরবেলাতেই কাতারে কাতারে মানুষ জুটেছে এই অসম্ভব বিষয়টি প্রত্যক্ষ করতে। আসামী ধনঞ্জয় গোঁসাই বিভূতি দারোগার সামনে টুলে বসে জবানবন্দী দিচ্ছে। কড়ে খাঁ তার সিঙ্গাপুরী বেতের লাঠিটা হাতের কাছে টেনে নিয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অপেক্ষা করছে বিভূতি দারোগার একটি পরিচিত ডাকের জন্য। মারের চোটে জবরদস্ত আসামী ধনঞ্জয়ের স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য। 'বহু প্রতীক্ষার, বহু কামনার এক দূর স্বপ্নছবি আজ মূর্ত হয়ে উঠেছে সমুখে।'[১২৪]

জবরদস্ত দারোগা বিভূতির ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট লেখা শেষ। এবার আসামীর জবানবন্দী লিখতে হবে। গোঁসাই বিভূতিকে পরিস্কার জানায় যে তার দুটি পথ খোলা আছে। আপোস করলে গোঁসাই বিভূতিকে 'দু-হাত ভরে' দেবে। আর পুলিশি পথে বা আইনের পথে চললে যে লড়াই হবে, সেই লড়াই-এ বিভূতির হার সুনিশ্চিত। উপরন্তু গোঁসাই প্রমাণ করে ছাড়বে ছোট হিস্যার গোঁসাইয়ের সুন্দরী স্ত্রীকে সে খুন করেনি, খুন করেছে বিভূতি দারোগা নিজেই। আপোস চাইলে বিভূতিকে এখনই জানাতে হবে, খবর পাঠাতে হবে ধনঞ্জয়ের কেরানীবাবুকে। কারণ ভোরের আলো ফুটলেই ধনঞ্জয়ের নির্দেশমত কেরানীবাবু সদরে রওয়ানা হবে। উঁচু পর্যায়ে সবই মীমাংসা হবে অবশ্যই ধনঞ্জয় গোঁসাইয়ের পক্ষে। তখন বড় দেরী হয়ে যাবে বিভূতির, দুকুলই হারাবে।

নিজের ভালটা বুঝতে একটুও সময় লাগেনি বিভূতির। মুহূর্তে ভেবে নিয়েছে এ লড়াইয়ে অবশ্যাম্ভাবী পরাজয়ের পর, তার চাকুরী, বেতন, পদ, সংসার এবং ভবিষ্যতের কথা। শেষ পর্যন্ত কড়ে খাঁকে ডাকে বিভূতি। তবে পিটিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য নয়, ধনঞ্জয় গোঁসাইয়ের কেরানীকে একটি চিঠি চট জলদি পৌঁছে দিতে যাতে বলা হয়েছে তার আর সদরে যবার দরকার নেই। কড়ে খাঁ চিঠিটা এক চৌকিদারের হাতে দেয় পৌঁছে দেবার জন্য, নিজে ধুপ করে বসে পড়ে টুলটার ওপর আশাহত হয়ে। দেহে মনে ভেঙে পড়ে বৃদ্ধ পাঠান। এদিকে —

বিভূতি একবার উঠে দাঁড়ালো। চোখ দুটো বাষ্পায়িত আকাশের মত ম্লান। বিভূতির মনে হল, কড়ে খাঁ এবার সত্যিই পেনসন নেবে। ও শরীরে আর শক্তি সামর্থের কোন নিশানা নেই। জরাগ্রস্ত, লোলচর্ম বিগলিত পেশী এক অশীতিপর বৃদ্ধের শব কুঁকড়ে পড়ে আছে বারান্দার কোনে।[১২৫]

সুবোধ ঘোষ তথাকথিত সৎ ও আদর্শনিষ্ঠ মধ্যবিত্তের ক্লীবত্ব প্রমাণ করেছেন 'কাঞ্চন সংসর্গাৎ'

গল্পে। জগদীশ ভট্টাচার্য এই গল্পটির মধ্যে কডওয়েলের দর্শনের সাযুয্য দেখতে পেয়েছেন। স্টাডিস্ ইন ডায়িং কালচার গ্রন্থে ক্রিষ্টোফার কড্ওয়েল বলেছেন —

> Money makes the bourgeois world go round and this means that selfishness is the hinge on which bourgeois society turns for money is a dominating relation to an owned thing. This commercialisation of all social relations indvades the most intimate of emotions, and the relation of the sexes is affected by the differing economic situations of man and woman.
>
> কাঞ্চন সংসর্গাৎ যেন এই মন্তব্যটিরও একটি গল্পরূপ।[১২৬]

পরোপকারী, সৎ, নির্লোভ এবং আদর্শবাদী যুবক কান্তিকুমার। তার বাবার বন্ধু, সফল ব্যবসায়ী এবং টাকার কুমীর অটলনাথ বসু চৌধুরীর প্রধান সহকারী। পদটির মর্যাদা থাকলেও, পদাধিকারী প্রকৃতপক্ষে একজন নিছক আজ্ঞাবহ মাত্র। এদিকে কান্তিকুমার – একদা ধনাঢ্য, বর্তমানে নি:স্ব–প্রতাপবাবুর কন্যার প্রণয়াসক্ত। কান্তি জয়াকে ভালবাসে। কিন্তু তার ভালবাসায় শুধুই আদর্শনিষ্ঠ প্রতীক্ষা। প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রেয়সীকে আপন করে নেবার পৌরুষ তার নেই।

প্রতাপবাবু এবং জয়ার পিতা-পুত্রের সংসারকে সচল রাখতে কান্তিকুমার অনবরত রসদ জুগিয়ে চলে তার কষ্টার্জিত অর্থ থেকে। জয়া বারবার নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছে কান্তির কাছে, অন্তত লোকালজ্জার হাত থেকে বাঁচতে। কিন্তু সততা, প্রেমের প্রতি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা এবং ধৈর্যের দোহাই দিয়ে শুধুই অপেক্ষার প্রহর গুণতে জয়াকে বাধ্য করেছে কান্তিকুমার।

জ্বরে পড়েছে জয়া। সংসার চালানোর জন্য এবং চিকিৎসার জন্য টাকা দরকার। জয়ার বাবা প্রতাপবাবু কান্তির কাছে টাকা চেয়ে ফিরে গেছেন বেশ ক'বার। কারণ কান্তির পকেট শূন্য।

প্রাত্যহিক নিয়মে সন্ধ্যেবেলায় কান্তিকুমার অটলনাথকে বই পড়ে শোনানোর সময় জানতে পারে ধড়িবাজ ব্যবসায়ী অটলের দৃষ্টি পড়েছে তারই প্রেমিকা, জয়ার ওপর। অটলনাথ সুকৌশলে জয়ার বাবা প্রতাপবাবুকে স্থানান্তরিত করেছেন দূরে এক চাকুরীর ব্যবস্থা করে। দারিদ্রের শেঁকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা জয়াও ধরা দিতে রাজী হয়েছে, অটালনাথের অন্ত:পুরে স্ত্রী হিসেবে নয়, রক্ষিতা হিসেবে। খবরটা শুনেই কান্তিকুমারের ভেতরে সুপ্ত পৌরুষ যেন গর্জে উঠল —

> আহত জানোয়ারের মত আচমকা হিংস্র মূর্তি ধরে একটা লাফ দিয়ে ছাতাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো কান্তিকুমার। সামনের সোফার উপর পড়ে এক বৃদ্ধ অজগর যেন কুন্ডলী পাকিয়ে লালসায় কাতরাচ্ছে। মাথার উপর প্রচন্ড একটা বাড়ি দিয়ে অজগরের জীবনের শেষ অধ্যায় এখুনি লিখে দিতে পারা যায়। কান্তি মাস্টার নয়, যেন হিংস্র এক খুনী ছুরি বাগিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে। তবু এই মূর্তিতে কান্তিকুমারকে যেন একটু বিসদৃশ মনে হয়, যেন অভিনয় করার জন্য একটা ভঙ্গী নিয়ে দাঁড়িয়েছে।[১২৭]

কান্তিকুমারের এই পৌরুষ, এই আস্ফালন নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। অটলনাথের আর একটি ডাকেই যেন খাঁচাছাড়া বাঘ নিজেই খাঁচার ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে নিজ আসনে গিয়ে বসে —

> কান্তিকুমারের উদ্ধত মূর্তিটা এই সামান্য একটু হুকুমের শব্দে যেন সেই মুহূর্তে চুপসে যায়। সতত সৎপথে চলা, কৃতজ্ঞতায় বাঁধা, পরোপকারে ডগমগ ও পুরস্কার-প্রীত একটি অতিভদ্রের পরবশ আত্মা ঘাড় গুঁজে চেয়ারের ওপর

> আবার একেবারে সুস্থির হয়ে বসে। এখন তবু কান্তিকুমারকে বেশ স্বাভাবিক মনে হয়।[১২৮]

জগদীশ ভট্টচার্য বলেছেন —

> এ গল্পে কান্তিকুমারের ব্যক্তিগত ক্লীবত্বের ফলেই তার হৃদয়লক্ষ্মী রাবণের স্বর্ণলঙ্কায় ধরা পড়েছে। কিন্তু যে সমাজব্যবস্থায় আর্থিক অনুগ্রহ দিয়ে মানুষকে কিনে রাখা যায়, সেখানে মানুষের হৃদয়বৃত্তি কতটা ক্লিন্ন ও কলুষিত হতে পারে, এ গল্পটি তারও এক জ্বলন্ত চিত্র।[১২৯]

যাকে জগদীশবাবু ব্যক্তিগত ক্লীবত্ব বলতে চান আমাদের মনে হয় তাকে সমাজব্যবস্থারই ফল বলে মনে করা উচিত। কারণ যে দুর্বল হীন মধ্যবিত্ত চরিত্র এই সমাজ ব্যবস্থারই ফল তাকেই কান্তিকুমারের চরিত্রে দেখানো হয়েছে। জগদীশবাবু নিজেই কড্‌ওয়েলের বিশ্লেষণ মেনে এই সমাজ সম্পর্কের ব্যাখ্যা করেছেন।

ছয়

'স্বর্গ হতে বিদায়' একটু ভিন্ন স্বাদের গল্প হলেও এ গল্পটিকে মধ্যবিত্ত মানসিকতার ব্যবচ্ছেদের উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কারণ এ গল্পে প্রধান উপজীব্য এক মধ্যবিত্ত নারীহৃদয়ের আত্মগ্লানি।

এই গল্পের নায়িকা অরুণা, দরিদ্র কেরানী বাপের এক সুন্দরী মেয়ে। অরুণা এক সাধারণ স্কুল শিক্ষক বিনয়কে ভালবাসে। কিন্তু সেটা শুধু ভালবাসাই। বিয়ের পাত্র হিসেবে বিনয়কে স্বাভাবিক কারণেই আহামরি কিছু একটা ভাবতে রাজী নয় অরুণা বা তার মা, বাবা। অরুণা যদিও স্কুলের গন্ডি পেরোতে পারে নি, তবুও নিজের রূপের ওপর তার যথেষ্ট আস্থা। তাই তার আশা বিনয়ের থেকে অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত, সচ্ছল পাত্র তার জুটবেই। গল্পকার বলেছেন — 'অরুণার মনের ভেতর বোধহয় একটা অভিমান মুখ ভার করে রয়েছে, বিনয় ছাড়া কি আর কোনো আর একটু ভাল পাত্র নেই ?' তবে সঙ্গে সঙ্গে অরুণা আর তার মা বাবার মনে এও রয়েছে যে শেষ পর্যন্ত বিনয় তো রইলই।

হীরাপুরের কয়েকটি কয়লাখনির মালিক প্রশান্ত নিজে থেকেই অরুনাকে বিয়ে করে। অরুণার মধ্যবিত্ত মনও এমনই একটা সংসার চেয়েছিল কিন্তু ক্রমে তার কাছে উন্মোচিত হল প্রশান্তর প্রকৃতি। সে আসলে এক পরনারীলুব্ধ শঠ নায়ক। আর সেই শঠতা বজায় রাখতেই সে সরল স্বভাবের 'লোভী' অরুণাকে বিয়ে করেছিল। এই গল্পে উচ্চবিত্ত সমাজের জীবনযাপনের একটা দিক লেখক দেখিয়েছেন। তিনি যেমন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের লোভের দিক দেখান তেমনি দেখান প্রশান্তদের জীবনচিত্র কীভাবে এই অরুণাদের বঞ্চনা করে নিজেদের জীবনের শঠতার পথ খোলা রেখে চলে। প্রশান্তর হীরাপুরের এই সংসারে অরুণা ছবির মতো একটি মূর্তি। সেখানে কোনো প্রতিবেশী আসে না — কারো সঙ্গে তার আলাপ হয় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সেই স্থান ছেড়ে নিজেই বিনয়ের সঙ্গে চলে যায়।

স্বপ্নের স্বর্গ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে অরুণার কাছে। আত্মগ্লানিতে ভোগে সে। দেনা-পাওনার, ন্যায়-অন্যায়ের, চাওয়া-পাওয়ার, ইচ্ছা-অনিচ্ছার হিসাব মেলাতে অযথা সময় নষ্ট করেনি অরুণা। ভুলের সংশোধন করে স্কুল শিক্ষক বিনয়কে ডেকে নিয়ে এক কাপড়ে হীরাপুরের ঐশ্বর্যকে পেছনে ফেলে বেরিয়ে এসেছে। বোধহয় 'স্বর্গ হতে বিদায়' কথাটার পেছনে রবীন্দ্রনাথের কবিতার কিছু ইঙ্গিত অস্ফুট আকারে হলেও থেকে গেছে। স্বর্গ হতে বিদায় কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্বর্গের প্রকৃতি বুঝিয়ে লিখেছিলেন একটা শুকনো পাতা ডাল থেকে সরে গেলে ডালের যতটুকু বেদনা বোধহয় সেটুকুও স্বর্গের অধিবাসীদের অনুভূতিতে লাগেনা। এই হিরাপুরের স্বর্গলোকের অধিবাসীদের যে ভোগপূর্ণ জীবন সেই জীবনেও কোন অনুভূতি নেই। স্বর্গে যে মানুষ গিয়েছিল — সে মর্ত্যে ফিরে আসছে — এই অনুভূতিতে মর্ত্যই হয়েছে সুখ:দুখের জীবনবোধের কবিতা। প্রায় সেই একই রকম অনুভূতিতে সুবোধবাবু অরুণাকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন স্বর্গ থেকে।

একে মধ্যবিত্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার গল্প বলতে চাইলে বলা যায় কিন্তু এ গল্পের মধ্যবিত্ত অনুভূতি কাঞ্চন সংসর্গাৎ গল্পের থেকে পৃথক। কাঞ্চন সংসর্গাৎ — গল্পে কান্তিকুমার এই মধ্যবিত্ত জীবনচেতনারই আর এক ছবি — যার মধ্যে ভদ্রতা আর ক্লীবত্ব একসঙ্গে জুড়ে গেছে। সে চরম ক্ষতির মুখে দাঁড়িয়েও কোনো প্রতিবাদ করতে পারেনি। অরুণা উচ্চাকাঙ্ক্ষায় প্রশান্তকে বিয়ে করলেও শেষ পর্যন্ত সেই ক্লীবত্বে সে আচ্ছন্ন হয়নি । প্রশান্তর সব শঠতার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। এই Activity অন্তত কান্তিকুমারের ছিল না। হয়তো অরুণা ঠিকই স্বামীর মন জয় করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে বুঝতেও চলেছে যে প্রশান্তর মন জয় করতে পারছে না। এই যে প্রশান্তর মন অরুণার প্রতি একটুও আগ্রহবোধ করেনা - একটুও অনুরাগ দেখায় না এটাই স্বর্গের হৃদয়হীনতার অনুভূতি। আর এই

অনুভূতিহীন জগৎ থেকেই চলে গেছে অরুণা।

প্রথমেই বলা হয়েছে গল্পটি একটু ভিন্ন স্বাদের। একটু ব্যতিক্রমী। বিশেষত: অরুণার বিবাহ পরবর্তী অংশুটুকু। এই অংশটুকু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে অরুণা অতিরিক্ত ধনী পরিবারে বিয়ের পর, স্বামী প্রশান্তর মন জয় করতে তার পছন্দের নায়িকাদের অনুকরণে বারবার নিজের প্রসাধন ও সাজসজ্জার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। প্রশান্ত প্রতিবারই অরুণার নিত্য নতুন সাজ সজ্জায় তার এক একজন সহচরীর রূপ দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়েছে, আবার পরক্ষণেই তার নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে।

বিয়ের পর হীরাপুরে এসে প্রথমেই পাশের বাড়ির লতিকাদিকে দেখেছে অরুণা। লতিকাদি আধময়লা হলদে ধনেখালি শাড়ি পড়ে চুলের রাশ ঘাড়ে-পিঠে ছড়িয়ে, খালি গলায়, খালি হাতে, স্বামী মি: মুখার্জীকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে, পূর্ব প্রেমিকের হাত ধরে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেছে চিরদিনের মত। স্বামীকে ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়াটা অত্যন্ত অন্যায় মনে হলেও, মধ্যবিত্তের চেহারায় এবং সাজে লতিকাদিকে বড় আপন মনে হয়েছিল অরুণার।

প্রশান্ত কখনো অরুণাকে নিয়ে বাইরে যায় নি। নিজের বিলাসবহুল বাড়ির সীমানার মধ্যেই অরুণাকে সাজিয়ে রেখেছে দামী আসবাবের মত। কারণ, প্রশান্তর বাইরের জগতে, অর্ধশিক্ষিত, মধ্যবিত্ত পরিবেশে লালিত অরুণা বড়ই বেমানান। অরুণাও তর্ক করে, অশান্তি করে প্রশান্তর জীবনে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেনি। প্রশান্ত অরুণাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে না গেলেও, ড্রাইভারকে নিয়ে ইচ্ছে হলে বাইরে বেড়িয়ে আসতে অরুণার বাধা ছিল না। ফলে অরুণা জানতে পারে প্রশান্তর বাইরের জীবনের আকর্ষণ, সুন্দরী মহিলাদের। জানতে পারে ঘরের বাইরে কাদের সঙ্গে প্রেমে ডুবে থাকে প্রশান্ত।

প্রতিদিন বাইরে বেরোবার সময়, প্রশান্তর সামনে সুন্দর সাজে সেজে, মিষ্টি করে হাসে অরুণা, কারণ, এটা প্রশান্তর পছন্দ। একদিন প্রশান্ত বেরোবার সময়, অরুণা সাজে ঠিক নন্দা চৌধুরীর মত। খুব পাতলা সিফনের হালকা নীল রঙের শাড়ি, প্রসাধন-সবই-একেবারে নন্দা চৌধুরীর মত। আশা, হয়ত প্রশান্ত নন্দার রূপে হলেও তাকে আপণ করে নেবে, ভালবাসবে। প্রশান্ত চম্‌কে ওঠে – অরুণা যেন বর্ণে বর্ণে নন্দা হয়ে উঠেছে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে যায় প্রশান্ত। মধ্যবিত্ত অরুণা নন্দা হতে পারল না।

আর একদিন অরুণা সাজে প্রশান্তর অন্য এক বান্ধবী, কাপুর সাহেবের শ্যালিকা, সোহিনীর মত। রাজগঞ্জ থেকে ফেরার পথে সোহিনীকে দেখেছে অরুণা। ঠিক সোহিনীর মতই গোলাপী রঙের চোলি পড়েছে, মাথার ওপর চুড়ো করে খোঁপা বেঁধেছে, আর লাল স্টিক বুলিয়ে ঠোঁট দুটোকেও রঙিন করেছে। অবাক হয় প্রশান্ত — '...সত্যিই তোমাকে এখন হঠাৎ দেখলে সোহিনী বলে ভুল হতে পারে।' কিন্তু ভুল করেনি প্রশান্ত। অরুণার আর সোহিনী হওয়া হল না।

অরুণা লক্ষ্য করেছে, প্রশান্ত তার ড্রাইভার, রাজকুমারের ঘরে ঢুকেছে। রাজকুমার তার বৌকে নিয়ে ছুটিতে গেছে কলকাতায়। রবিবার ছুটির দিনে তখন সেই ঘরে একা রয়েছে রাজকুমারের বড় ভাইয়ের মেয়ে চামেলি। চামেলি মেজর গুপ্তর বাড়িতে আয়ার কাজ করে।

এবার প্রশান্ত বেরোবার সময় অরুণা সাজে চামেলির সাজ। পরণে ঝলমলে রঙিন সাটিনের শাড়ি। খোঁপাতে সাদা ফুলের মালা, গলায় মালা লাল পাথরের। পাউডার ছিটিয়ে মুখটা একেবারে সাদা। – প্রশান্ত অবাক হয়, বিরক্ত হয়। কেন এ সাজ ? অরুণার অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর – 'ইচ্ছে'। কিন্তু এবারও হেরে যায় অরুণা। কারণ, অরুণা চামেলির মত হতে পারে, কিন্তু প্রশান্তর চামেলি হতে

পারেনি। মধ্যবিত্ত গোত্রচ্যুত হতে চেয়েও বিফল হল।

অরুণার সর্বশেষ সাজ, প্রথম দেখা মধ্যবিত্তের আটপৌরে সাজে সজ্জিতা লতিকাদির অনুকরণে। আধাময়লা, হলদে ধনেখালি, খালি গলা, খালি হাত, ঘাড়-পিঠে ছড়ানো উসকো খুসকো চুল। লতিকাদির মতই অরুণা প্রশান্তকে ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে তার পূর্ব-প্রেমিক আর এক মধ্যবিত্ত, স্কুল শিক্ষক বিনয়-এর হাত ধরে। এই গল্পে পর্বে পর্বে পরীক্ষা নিরীক্ষায় সুবোধ ঘোষ দেখিয়েছেন যে মধ্যবিত্তের গোত্রান্তর সহজ নয়, এবং সচরাচর ঘটেও না।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ গল্পে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভন্ড ইনটেলেকচুয়ালিজমকে নিয়ে মস্ত একটা ঠাট্টা করে নিয়েছেন লেখক। ইতিহাসের তরুণ অধ্যাপক মহারাজ অশোক ছাড়া আর কিছু জানেন না। তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি আচরণ আশোকের ছাঁচে গড়া। এই ছদ্ম ইনটেলেকচুয়াল অধ্যাপক বসুর তাঁর প্রণয়ী ষ্টেলাকে ছেড়ে কলকাতায় ফিরে যাবার ঘটনাটিকে লেখক যেন ব্যঙ্গার্থে সেই একই অশোকের জীবনাদর্শের সঙ্গে এক করে দেখিয়েছেন। লেখক আশ্চর্য দক্ষতায় এই অধ্যাপকের মেকী আদর্শনিষ্ঠা ব্যঙ্গ সহযোগে ফুটিয়ে তুলেছেন ইতিহাসের অশোকের জীবনাদর্শের সঙ্গে অধ্যাপক বসুর হাস্যকর আদর্শানুসরণকে কাহিনীতে উপস্থাপিত করে।

এই গল্পে আমরা দেখি, অধ্যাপক বসু ছাত্রদের কাছে যথেষ্ট সমীহ আদায় করে নিয়েছে। ইতিহাসের এই অধ্যাপকের আচারে-ব্যবহারে, চালে-চলনে, সাজে-পোষাকে এবং অবশ্যই পান্ডিত্যে ছাত্রকুল মুগ্ধ। নিজেকে একজন 'গ্রেট-ইন্‌টেলেকচুয়াল' বলে প্রতিপন্ন করেন অধ্যাপক। অধ্যাপক বসু আদর্শনিষ্ঠ। তার জীবনের আদর্শ মহারাজা অশোক। ইতিহাসের এই অধ্যাপক বলতেন, মহারাজা অশোক বিবাহ করেছিলেন এক অনুন্নত ভীল কন্যাকে। এদিকে ছাত্ররা জানতে পেরেছে তাদের প্রিয় অধ্যাপকও, হয়ত মহারাজ অশোকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই এক আদিবাসী ছাত্রী স্টেলা হেমব্রমকে বিয়ে করতে চলেছেন। হঠাৎ একদিন দেখা গেল এই অধ্যাপক স্টেলাকে জীবন থেকে সরিয়ে এক ধনী কন্যাকে বিয়ে করার জন্য কোলকাতায় চলে গেলেন। অধ্যাপকের এই আচরণেও ছাত্ররা খুঁজে পায় মহারাজা অশোকের আদর্শ। কারণ মহারাজা অশোকও নাকি ভীল কন্যাকে পরিত্যাগ করে, কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিয়ে পাটলিপুত্রে ফিরে গিয়েছিলেন।

আদ্যন্ত বিদ্রুপাত্মক এই গল্পে সুবোধ ঘোষ এক ছদ্ম গাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে, মধ্যবিত্তের প্রতিভূ এই অধ্যাপকের অসাড় বিদ্যাভিমান, নীচতা এবং সুযোগসন্ধানী চরিত্রের মুখোশ খুলে দিয়েছেন।

'হৃদঘনশ্যাম' গল্পে সুবোধ ঘোষ মধ্যবিত্তের অযৌক্তিক ভক্তি ভাবনাকে বিদ্রুপ করেছেন। উপভোগ্য এই গল্পটিতে তিনি দেখিয়েছেন, সমাজে তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন গুরু বাবাজী মহারাজেরা কি ভাবে শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত মানুষকে অবলীলায় মোহগ্রস্থ করে ফেলে। এই গল্পের গুরু-বাবাজী মহারাজের নাম হৃদঘনশ্যাম। সাধু-সুলভ চেহারার, ভাব-ভঙ্গির এই গুরু মহারাজের ভক্তদের মধ্যে যেমন শিক্ষিত মানুষেরা আছেন, তেমনি আছেন বিত্তবানেরা। দূর দূর শহরের 'ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, জমিদার, মার্চেন্ট সবাই এসে পড়ছেন বাবার পায়ে।

লেখক নিতুবাবু এবং তার তিন শিক্ষিত সঙ্গী হৃদঘনশ্যামের এই বাড়-বাড়ন্তে বেজায় অখুশী। কারণ এরা গুরু হৃদঘনশ্যাম এর পূর্বাশ্রম সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল। একদিনের গুলিখোর, ঠগ্ শ্যামু, যে এক আনা প্যাকেট দরে লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধুলি বিক্রী করে মানুষ ঠকাত, দীর্ঘ দশ বছর আত্মগোপন করে থাকার পর সেই শ্যামুরই এই শহরে আবির্ভাব হৃদঘনশ্যাম হয়ে। মানুষের সহজ বিশ্বাসকে পাথেয় করে, হৃদঘনশ্যামের আশ্রমের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে, সাধারণের কাছে এই আশ্রম এবং গুরু হৃদঘনশ্যামের আকর্ষণ বাড়ছে প্রতিনিয়ত। বাস্তব বুদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন নিতুবাবু সমমনোভাবাপন্ন

তিন বন্ধুকে নিয়ে এর প্রতিকার করতে বদ্ধ-পরিকর।

লেখক, সুরেনদা, কুঞ্জবাবু এবং চরণ ডাক্তার জনসমক্ষে শ্যামুর মুখোশ খুলে দেবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে পৌঁছোয় আশ্রমে — 'একটা শিলাবেদীর ওপর বাঘের ছাল পেতে স্বয়ং শ্যামু জীবন্ত বিগ্রহের মত সমাসীন – বাবা হৃদঘনশ্যাম।' হৃদঘশ্যামের চেহারা, আশ্রমিক পরিবেশ কিছু অলৌকিক ঘটনার প্রস্তাবনা ইত্যাদিতে একে একে সুরেনদা, কুঞ্জবাবু এমন কি চরণ-ডাক্তার পর্যন্ত ক্রমশ বাবাজীর ভক্ত ও অনুগত হয়ে পড়ে। রাগে ঘেন্নায় হতাশ হয়ে একাই ফিরে আসতে হয় লেখক নিতুবাবুকে। কারণ, যাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন শ্যামুর ভন্ডামীর মুখোশ খুলে দিতে, তারা সবাই হৃদঘনশ্যামের ভক্ত তালিকায় নাম লিখিয়ে ফেলেছে।

এই গল্পটিতে সুবোধ ঘোষ মধ্যবিত্ত চরিত্রের একটি বিশেষ দুর্বল অংশের প্রতি আলোকপাত করেছেন, তাঁর বাস্তব এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই দুর্বলতার প্রতি কটাক্ষ করেছেন। মধ্যবিত্ত চরিত্রে অতিরিক্ত স্বার্থচিন্তা, অবাস্তব রঙিন স্বপ্ন এবং সর্বোপরি অনন্ত লোভ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকে অলৌকিক জগতের প্রতি আকর্ষণ করে। যেহেতু সাধু-সন্নাসীদের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে, সেহেতু সাধুবেশধারীদের প্রতি মধ্যবিত্তের দুর্বলতা বড়ই প্রত্যক্ষ। তাই গুরু-বাবাজীদের প্রতি সামান্যতম বিশ্বাস স্থাপনের সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষ। এদের মধ্যে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে চিকিৎসক পর্যন্ত বাদ যায় না কেউই।

মধ্যবিত্ত চরিত্রের এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন এক শ্রেণীর গুরু মহারাজেরা। ঠগ্-শ্যামু ওরফে সাধু হৃদঘনশ্যাম এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

হৃদঘনশ্যাম-এ লেখক যেমন চোখে আঙুল দিয়ে মধ্যবিত্ত চরিত্রের একটি অতি দুর্বল জায়গা দেখিয়েছেন, ঠিক তেমনই মধ্যবিত্তের আদর্শনিষ্ঠা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন অনেক গল্পে। স্নানযাত্রা-য় আদর্শনিষ্ঠ যুবক ইন্দুনাথের আদর্শের অসাড়তা ধরা পড়ে যায় এক পতিতার কাছে। পালিয়ে বাঁচে ইন্দুনাথ, পালিয়ে বাঁচে মধ্যবিত্তের আদর্শ। ইন্দুনাথ কর্তব্যপরায়ণ এবং সমাজসেবী।

> প্রত্যেকটি প্রতিজ্ঞার কাজকে জয়ী না করে ক্ষান্ত হয়নি ইন্দুনাথ। জেলার সদর শহরে বিলাতী কাপড় অচল হয়েছে, রঘুনাথপুরের বাজার থেকে আবগারী মদের দোকান উঠে গিয়েছে, বড়গাছিয়ায় চাঁড়াল পাড়ায় প্রত্যেকটি পুরুষ কৃত্তিবাস পড়তে আর নিজের নাম লিখতে শিখেছে, রানীহাটের কুমোরেরা একটা কো-অপারেটিভ করেছে, এই সবই তো ইন্দুনাথের এক একটি সৎ প্রতিজ্ঞার সফলতা।[১৩০]

এই ইন্দুনাথ সদলবলে বটেশ্বরপুরে এসেছে স্নানযাত্রা মেলা উপলক্ষে আগত পতিতাদের আদিম বৃত্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। প্রতি বছর স্নানযাত্রার মেলায় সময় বটেশ্বরপুরে শতাধিক পতিতার এক ছাউনি পড়ে, এবারও পড়েছে। কিন্তু ইন্দুনাথ এই ধর্মীয় মেলার অঙ্গ হিসাবে পতিতাবৃত্তিকে মেনে নেবে না কিছুতেই। কড়া পাহারায় মেলার থেকে পতিতা ছাউনিকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে ইন্দুনাথ এবং তার দলবল। এ শুভ প্রচেষ্টায় যত বাধা আসে ততই দৃঢ় হয় ইন্দুনাথের প্রতিজ্ঞা। কিন্তু আদর্শবাদী ও পরোপকারী ইন্দুনাথ একটি প্রশ্নে কঠোর সমস্যার মুখোমুখি হয়। মেলার শুচিতা বজায় রাখার প্রশ্নে স্নানযাত্রা পর্যন্ত পতিতাবৃত্তি বন্ধ রাখার একটা যুক্তি হয়ত আছে, কিন্তু সেই সুবাদে পতিতাদের উপার্জন বন্ধ করে তাদের 'ভাতে মারবার' কি যুক্তি আছে তার ? আদর্শনিষ্ঠ ও যুক্তিবাদী ইন্দুনাথ নিজের নি:শেষিত সম্পত্তিটুকু বিক্রী করে পতিতাদের দু-বেলা খাবার এবং হাতখরচের ব্যবস্থা করে। প্রতিদিন সে আর তার সেচ্ছাসেবীরা প্রতিটি পতিতার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসে সিধে — চাল, ডাল, আলু আর নগদ দুআনা পয়সা।

ঐ পল্লীতে সোনলীকে অন্য পতিতাদের তুলনায় একটু অন্যরকম মনে হয় ইন্দুনাথের। আর্থিক সঙ্গতি থাকলেও সোনালী ইন্দুনাথের ইচ্ছার মর্যাদা দিয়েই অতি সাধারণ 'সিধে' গ্রহণ করে, তার উগ্র সাজসজ্জা পরিত্যাগ করে, গ্রাহককে আকর্ষণ করার জন্য তার ঘরের লালসাপূর্ণ কুশ্রী ছবিও সরিয়ে দেয়। ইন্দুনাথের 'রিলিফ' বন্টনকে সাহায্য করার জন্যই চা খাওয়া বন্ধ করে সোনালী। সেচ্ছাসেবীদের ছেঁড়া জামা-কাপড়ও সেলাই করে দেয় সে। ইন্দুনাথ হয়ত নিজের অজান্তেই একটু দুর্বল হয়ে পড়েছিল সোনালীর প্রতি। তাদের একটি সংলাপেই বিষয়টি স্পষ্টতর হয়।

ইন্দু — আপনাকে দেখে কে বলবে যে, আপনি এখানকার মানুষ ?
সোনালী — চিরকাল তো এখানকার মানুষ ছিলাম না।
ইন্দু — সেই কথাই তো বলছি। ঘরে চলে যান।
সোনালী — ঘরে ?
ইন্দু — হ্যাঁ।
সোনালী — ঘর কোথায় ? আমাকে ঘরে নেবে কে ?
ইন্দু — চেষ্টা করে দেখুন। ঘর পাওয়া যাবে না কেন ?...[১৩১]

আদর্শনিষ্ঠ ইন্দুনাথ কি পতিতা সোনালীকে ভালবেসে তার ঘরে আনতে চেয়েছিল ? ইন্দুনাথ যদি সত্যিই সোনালীকে ভালবেসে, তাকে নিয়ে সংসার করতে চাইতো, তবে তাতে মধ্যবিত্ত চরিত্রের সামান্যতম মর্যাদাহানি ঘটত না। বরং একজন পতিতাকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে চরিত্রটি বলিষ্ঠতায় উদ্ভাসিত হত। কিন্তু গল্পের শেষাংশে আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ করি, আদর্শভ্রষ্ট ইন্দুনাথ সোনালীকে ভোগ করতে চেয়েছিল, কাপুরুষের মত একান্ত চুপিসারে।

স্নানযাত্রা শেষ। ইন্দুনাথ শিবির ছেড়ে চলে যাবার জন্য তৈরী। শেষবারের মত দেখা করতে যায় পূর্ণিমার কাছে। ইন্দুনাথ অবাক বিস্ময়ে দেখে পূর্ণিমাও অতি সাধারণ বেশে তার জামাকাপড়ের ছোট্ট পুটুলি গুছিয়ে যাবার জন্য তৈরী হয়ে আছে।

ইন্দুনাথ — কিন্তু যাবার জন্য আজই কেন তৈরী হয়েছে ?
পূর্নিমা — আজই তো। তাইতো শুনলাম।
ইন্দুনাথ — কি শুনলে ?
পূর্নিমা — বিজয়দা বললেন, আপনি আজই চলে যাবেন বলে ঠিক করেছেন।
ইন্দুনাথ — ঠিকই বলেছ। কিন্তু সে জন্য তুমি তৈরী হলে কেন ?

যেন হঠাৎ বোবা হয়ে যাওয়া একটা বিস্ময়ের জ্বালা নিয়ে ইন্দুনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে পূর্ণিমা। তারপর চোখ নামিয়ে নেয়। আপনি তাহলে আজই চলে যাচ্ছেন ?[১৩২]

এই কথোপকথনে একটি বিষয় পরিস্কার হয় যে, ইন্দুনাথের কথাবার্তায়, আচার আচরণে পূর্ণিমার সঙ্গত কারণেই মনে হয়েছিল যে সাহসী ইন্দুনাথ হয়ত তাকে ভালবেসে, এই নরক থেকে মুক্তি দিয়ে তার কাছেই নিয়ে যাবে এক সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে। ভরসা ছিল আর কখনো তাকে সোনালী হতে হবে না। কিন্তু ইন্দুনাথের কাছে সে সম্মান দাবী করার কোন অধিকার তার ছিল না। তাই পূর্ণিমা যেন হঠাৎ বোবা হয়ে যায়। গল্পের চূড়ান্ত পর্ব, স্নানযাত্রার পরদিন। সেদিন পতিতাপল্লীতে ইন্দুনাথ ও তার দলবলের পাহারাদারি উঠে গেছে। যাব যাব করেও, ইন্দুনাথ ফিরে যায়নি সেদিন। হাঁটতে হাঁটতে হাজির হয় পূর্ণিমার ঘরে। পূর্ণিমা তখন আবার সোনালীতে রূপান্তরিতা। যে ইন্দুনাথ একদিন সোনালীর এই চটকদার সাজকে এবং অর্ধনগ্না এক উর্বশীর ছবিতে সাজানো তার ঘরটিকে 'বেমানান' বলেছিল, সেই ইন্দুনাথের চোখেই তখন সোনালীর সস্তা, উগ্র সাজ এবং নিম্নরুচির গৃহসজ্জা 'বেশ সুন্দর' বলে মনে হয়।

ইন্দুনাথ কিছুক্ষণ কাটাতে চায় সোনালীর সঙ্গে। কিন্তু ততক্ষণে সাহসী ইন্দুনাথের উপর সোনালীর ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। তবুও শেষবারের মত ইন্দুনাথের সাহস পরীক্ষার জন্য সোনালীর প্রশ্ন — 'আলো থাকবে না নিভিয়ে দেবো ? ইন্দ্রনাথের উত্তর 'তোমার যা পছন্দ।' অর্থাৎ সোনালী চাইলে অন্ধকারেও তার সঙ্গলাভে আপত্তি নেই ইন্দুনাথের। সোনালীর কাছে আদর্শবাদী পরোপকারী ইন্দুনাথ তখন এক ভীরু, ক্লেদাক্ত এবং কাপুরুষ চরিত্র।

সোনালী আলো নিয়ে ইন্দুনাথকে পালাবার পথ দেখায়। কারণ তার ঘরে তখন জাঁদরেল গ্রাহক 'মেজকর্তা' আসবে। অন্ধকারে পালিয়ে যাবার সময় ইন্দুনাথকে পিছু ডাকে সোনালী — 'শুনুন, ডাক দিয়ে আর দু'পা এগিয়ে এসে ফিসফিস করে সোনালী – দিব্যি দিয়ে বলছি, আমার কথাটা তুচ্ছ করো না লক্ষ্মীটি। ঘরে ঢুকবার আগে একবার স্নান করে নিও।'[১৩৩]

এই উক্তিতে ইন্দুনাথের মধ্যবিত্তসুলভ আদর্শ, চরিত্রনিষ্ঠা একেবারে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। সুবোধ ঘোষের এই গল্পে মধ্যবিত্তের আত্মপ্রতারণা, ভীরুতা এবং আদর্শচ্যুতি অত্যন্ত প্রকট।

বারবধূ গল্পেও সেই একই মধ্যবিত্ত চরিত্রের ভণ্ডামী ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনা। মধ্যবিত্ত মানুষ জানে ন্যায়-অন্যায়ের পরিধি। সে জানে কোনটি সমাজিক, কোনটি অসামাজিক। তার চরিত্রের স্খলন ইচ্ছাকৃত। তাই নিজ স্বার্থরক্ষায় বা রিপুর তাড়নায় কোন অন্যায় বা অসামাজিক কাজ করার পরও সে সচেষ্ট থাকে নিজ সামাজিক মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে। প্রসাদ রায় বারবধূ পঞ্চীবিবিকে নিয়ে তোলে এক নতুন জায়গায় যেখানে নিরুপদ্রবে কদিন তার লালসা চরিতার্থ করতে পারবে। কিন্তু সেখানেও বাঙালী ভদ্রজনেরা উপস্থিত হওয়ায় প্রসাদ অনেক কাকুতি মিনতি করে পঞ্চীবিবিকে রাজী করায় বধূবেশে ক'টা দিন অভিনয় করার জন্য, নিজের সমাজিক প্রতিষ্ঠা এবং মধ্যবিত্তের শ্রেণীগৌরব অক্ষুন্ন রাখার তাগিদে। বারবধু গল্পে সুবোধ ঘোষ একদিকে যেমন বিত্তবান পুরুষের নারীসঙ্গলিপ্সা ও একইসঙ্গে সামাজিক সম্মান অক্ষুন্ন রাখার প্রাণন্তকর প্রচেষ্টার দ্বন্দ্ব তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে একজন পতিতা নারীর অন্তরেও যে একটু গৃহকোণের জন্য কি অদম্য আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে থাকে, তা ফুটিয়ে তুলেছেন।

এই গল্পে তারকেশ্বরের ভাড়া করা বারবধূ পঞ্চীবিবি, প্রসাদ রায়ের সঙ্গে বরাকরে এসেছে, পরিচিত গন্ডির বাইরে নিভৃতে প্রসাদের যথেচ্ছাচারী লালসা পূর্ণ করতে। প্রসাদের কাছে পঞ্চীবিবির আদরের নাম লতা। কিন্তু বরাকরে বেড়াতে আসা বেশ কয়টি বাঙালী পরিবার সঙ্গলোভে আবিষ্কার করে প্রসাদ-লতাকে। বিব্রত হয় প্রসাদ। ভদ্র সমাজের কাছে পতিতাসঙ্গের বিষয়টি ধরা পড়ে যাবার আশংকায়, প্রসাদের একান্ত অনুনয়ে, বারবধূ লতা মদের বোতল, সিগারেট এবং দেহ-পসারিনীর বেশভূষা ছেড়ে, আলতা-সিঁন্দুর–তাঁতের কাপড় পড়ে নিজেকে গৃহবধূতে রূপান্তরিত করে। এই প্রথম লাভ করে এক অনাস্বাদিত সম্মান, ভালবাসা এবং অন্তরঙ্গতা। বারবধূ লতার নারী জীবনের এই প্রাপ্তি তার নারীমনের একান্তে লুকোনো একটি শুচিস্নিগ্ধ গৃহকোণের আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করে তোলে। এদিকে প্রসাদ লতার নিখুঁত গৃহবধূর অভিনয়ে সামাজিক সম্মান বজায় রাখতে পারায় যথেষ্ট সন্তুষ্ট হলেও, সন্ধ্যায় একান্তে লতাকে বারবধূ হিসেবেই পেতে চায়। কিন্তু লতার কাছ থেকে প্রত্যাশিত সাড়া পায় না সে। কারণ, প্রতিদিনের গৃহবধূর অভিনয়ে, লতা চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে তারকেশ্বরের ভাড়া করা বারবধূ পঞ্চীবিবি।

এদিকে সদ্য পরিচিত পরিবারগুলোর সঙ্গে হৃদ্যতা বৃদ্ধির সুবাদে এবং প্রতিদিনের মেলামেশায়, প্রসাদ এক বিধবা এবং শিক্ষিতা যুবতী আভার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। দোটানায় পড়ে প্রসাদ। একদিকে ভাড়া করে আনা লতা, অন্যদিকে বিধবা যুবতী প্রণয়ী আভা। লতা বারবধূ, পতিতা। তার কোন অন্য পরিচয় নেই। আভার আছে সামাজিক পরিচয়। আভাকে নিয়ে সসম্মানে সমাজে থাকা যায়, লতাকে

নিয়ে নয়। তাই লতাকে তার প্রাপ্য, প্রয়োজনে কিছু বেশী দিয়ে মুক্তি পেতে চায় প্রসাদ। লতাকে বলে —

> না, তোমাকে দিয়ে আর বেশী নাটুকে খেলা করাতে চাই না। অনেক করেছ, বেশ ভালভাবেই করেছ। কিন্তু তোমার দিক থেকেই ভেবে দেখ, চিরকাল তো এভাবে চলতে পারে না, তাতে তোমারই বা লাভ কি ?[১৩৪]

শেষ রাত। ভোর হলেই টাকার হিসেব বুঝে নিয়ে বরাকর ছেড়ে চলে যাবে লতা। আশাহত লতা কল্পনায় দেখে — 'বিধবা আভার মাথায় নতুন করে সিঁদুরের দাগ পড়বে, এই বাড়ীর ঘরে ঘরে আভার সংসারপনার চুড়ি শাখা রাজবে ঠুং ঠুং মিষ্টি শব্দ করে।'[১৩৫] ক'দিনের অভিনয়ে সামাজিক মর্যাদায় সংসার করার যে স্বপ্নটায় প্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল লতা, হঠাৎ সেই স্বপ্নভঙ্গের সুস্পষ্ট প্রস্তাবে রায়বাঘিনীর মতই প্রতিশোধ স্পৃহায় ক্রোধোন্মত্ত হয়ে ওঠে সে। লতার মধ্যে তখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, বারবধূ পঞ্চীবিবি। সে ভাবে — 'একবার যাচিয়ে দেখলে হয়। রেশমী পায়জামাটা পরে, বেনী দুলিয়ে, চোখে সুর্মা লেপে, একপাত্র হুইস্কি নিয়ে যদি কোলের উপর চড়ে বসি, চরিত্তিরওয়ালার মুরোদটা দেখি একবার। কিন্তু ছিঃ।'[১৩৬]

কিন্তু সত্যিই তা আর পারে না পঞ্চীবিবি। বরং প্রতিশোধের কথা ভেবে লজ্জিত হয় সে। কারণ, পঞ্চীবিবি নিজের অজান্তেই গৃহবধূ লতা হয়ে গিয়েছে মনে-প্রাণে। বিদায় মুহূর্তে যথেষ্ট টাকা লতার হাতে তুলে দিয়েও উৎকন্ঠায় থাকে প্রসাদ। লতার বিদ্রোহের সামান্য বিস্ফোরণে প্রসাদের সামাজিক মর্যাদার বেলুন চুপসে যেতে পারে যে কোন সময়। নরম গলায় প্রসাদ জানতে চায় — 'আমার ওপর মনে কোন রাগ পুষে রাখলে না তো লতা ? আমি তো তোমাকে কখনো ঠকাইনি, ক্ষতি করিনি।'[১৩৭] এক লাঞ্ছিতা গৃহবধূর মত ভীরু অভিমানে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে লতার উত্তর — 'না, তুমি ক্ষতি করনি; আভা ঠাকুরঝি আমার এই সর্বনাশটা করে ছাড়লো।'[১৩৮]

গল্পের এই শেষ বাক্যটিতে লতার মুখে 'ঠাকুরঝি' শব্দটির প্রয়োগ যথেষ্ট অর্থবহ। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মতে —

> স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে যে বারবণিতা ক্রমশ স্ত্রী বলেই নিজেকে ভাবতে শুরু করেছে, তার মুখে ওই – ঠাকুরঝি শব্দটা বসিয়ে দিয়েই লেখক আমাদের বুঝিয়ে দেন, জানিয়ে দেন যে, বারবণিতার মানসিকতা বলে আলাদা কোন মানসিকতা নেই। সাধারণ মানুষ যাকে বারবণিতা বলে ভাবতে অভ্যস্ত, ভিতরে-ভিতরে সেও আসলে স্বামী-সন্তান-সংসারলিপ্সু একটি নারীই।[১৩৯]

গল্পটিতে প্রধান দুটি নারী চরিত্র, লতা এবং আভা। লতা বারবধূ থেকে গৃহবধূতে উত্তরণের জন্য আন্তরিক প্রয়াস চালিয়েছে। অন্যদিকে বিধবা যুবতী, তথাকথিত শিক্ষিতা আভা, প্রসাদ ও লতার মধ্যে প্রকৃত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক রয়েছে জেনেও, ছলাকলা এবং চটুলতায় প্রসাদকে কাছে টেনে নিয়েছে, সজ্ঞানে একটি সুখী সংসারকে বিদ্ধস্ত করেছে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে।

একজন সমাজ বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে সুবোধ ঘোষ এই দুটি চরিত্র চিত্রণে এই সত্যই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে কুলললনা হলেই তার কুলরক্ষার তাগিদ থাকে না। নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অবলীলায় সে অন্যের সাজান সংসার নষ্ট করতে পারে। আবার অন্যদিকে সমাজের চোখে হেয় একজন বারবধূ তার এক সঙ্গলিপ্সুর সামাজিক মর্যাদা রক্ষায় নিজেকে নিঃস্ব করে দেয় লোকচক্ষুর অন্তরালে। তারপরও তাকে

মাথা নীচু করে ফিরে যেতে হয় আদিম পেশায়। সভ্য, মধ্যবিত্ত সমাজের একশ্রেণীর মানুষের এই অসভ্য-আচরণের বিরুদ্ধেই অঙ্গুলী নির্দেশ করেছেন লেখক অভিমানী লতার সর্বশেষ উক্তিটি দিয়ে। সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য্য লতার এই উক্তিটি সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন — '...মানুষের নীড় ভাঙাবার কাজে অসংবৃতকামা কুলললনার বিরুদ্ধে অনভিজাত বারবধূর এই অভিযোগ ক্ষমাহীন ধিক্কারে ভদ্রসমাজকে ব্যঙ্গ করে উঠেছে।'[১৪০]

মধ্যবিত্ত চরিত্রের কঠোর সমালোচক সুবোধ ঘোষের বিভিন্ন ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত মানুষের লোভ, অকারণ অহমিকা, নীচতা, স্বার্থপরতা এবং সর্বোপরি হীনমন্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে – সুবোধ ঘোষের কলমে মধ্যবিত্তের এই বিচার একপেশে নয়ত ? প্রশ্ন ওঠে মধ্যবিত্ত চরিত্রের ভাল কোনো দিক-ই কি নেই ? সুবোধ ঘোষের চোখে কি মধ্যবিত্ত হৃদয়ের সংবেদনশীলতা বা উদারতার কোন উদাহরণই চোখে পড়ে নি ? – এ প্রশ্নের উত্তর আমরা পাই তার 'গ্লানিহর' গল্পে।

লেখক নিজেই জাহাজে চেপে এডেন যাত্রী। প্রচন্ড ভিড়ে ডেকের এক প্রান্তে ছোট্ট একটি ঘরে আস্তানা গাড়লেন। মুখোমুখি অন্য একটি খুপড়িতে তাঁর সহযাত্রী একটি বাঙ্গালী পরিবার। মিষ্টার গাঙ্গুলী, তার স্ত্রী এবং তাদের ছোট ছোট দুই ছেলে। বড়টি পাঁচ বছরের, নাম পটল; ছোটটি হামাগুড়ি দেয় – পল্টু। একটি বাঙ্গালী পরিবারকে সহযাত্রী হিসেবে পেয়ে, লেখকের মনে যে স্বস্তি এবং আনন্দের দোলা লেগেছিল, তা প্রথমেই বড় ধাক্কা খায় মিষ্টার গাঙ্গুলীর অতি নির্লিপ্ত আচরণে। তার স্ত্রীও এক হাত ঘোমটা টেনে লেখকের সঙ্গে এক কঠোর ব্যবধান বজায় রেখে চলেছেন।

সহযাত্রী গাঙ্গুলী পরিবারের সঙ্গে আলাপচারিতা না জমলেও, পাঁচ বছরের পটল এবং তার শিশু ভাইটির সঙ্গে লেখকের সু-সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। পটলের কাছ থেকেই লেখক জানতে পেরেছেন মিস্টার গাঙ্গুলী হাপানি, কাশিতে খুবই অসুস্থ। তিনি সুদূর কেপ -এ চাকরী করেন এবং পরিবার নিয়ে সেখানে যাচ্ছেন। লেখক আরো লক্ষ করেছেন, পতিব্রতা গাঙ্গুলী গিন্নির স্বামী সেবার নিষ্ঠা। ঘোমটা দেওয়ার পেছনে গাঙ্গুলী গিন্নীর নিজ দেশের সামাজিকতা ও কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা এবং স্বামী সেবার মধ্য দিয়ে তার আন্তরিক কর্তব্যবোধে লেখক মুগ্ধ। মনে মনে ভদ্রমহিলাকে সমীহ করতে শুরু করেছেন তিনি।

হঠাৎই দৃশ্যপট পালটে যায়। একদিন গাঙ্গুলী গিন্নীর চেহারাটা দেখে তাকে চিনতে পারেন লেখক। চমকে ওঠেন তিনি। —

> দেখছি। স্থিরদৃষ্টি নিয়ে দেখছি এ মহিলাকে। মহিলা ? মিসেস গাঙ্গুলী ? পটলের মা ?
>
> চোখ দুটোকে লোহার শিক দিয়ে যেন নির্মমভাবে খুঁচিয়ে দিল। এ তো মহিলা-টহিলা নয় ! এ যে আমাদের ভৈরবমালীর মেয়ে, মালতী।
>
> এই মালতী, যে জেঠামশায়ের বাড়ীর ঝি ছিল। কথাবার্তা নেই হঠাৎ জেঠিমার গয়না চুরি করে পালাল শিশির বেয়ারার সঙ্গে। ধরা পড়ে জেলে গেল। ফিরে এসে ঘর নিল কাশীর এক কুখ্যাত পাড়ায়। তার প্রণয়ের সেই শিশির বেয়ারা তারই হাতে খুন হল একদিন। তারপর থেকে সে ফেরার। পুলিশ এতদিন খোঁজাখুঁজি করেও হদিস পায়নি। ...সব জানি। আমি ওর সাক্ষ্যাৎ চিত্রগুপ্ত। ওর পাপ-জীবনের সব ঘটনার ফর্দ আমার প্রায় মুখস্ত আছে।[১৪১]

স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার লেখক অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। একবার ভাবছেন পুলিশে খবর দেবেন, একবার ভাবছেন সোজা জিজ্ঞাসা করবেন – 'ভাল চাস তো মাগি জেঠিমার গয়নাগুলো ফিরিয়ে দে।

তা হলে ছেড়ে দেব, নইলে রেহাই নেই। আবার ভাবছেন জিজ্ঞাসা করবেন – 'শিশিরকে খুন করলি কেন ?' অথবা কান ধরে জিজ্ঞাসা করলে হয় 'এখনো পিরিতের ব্যবসাটা ছাড়তে পারলি না ? গাঙ্গুলীর কাঁচা মাথাটা না খেলে চলছিল না ?'— কিন্তু কি এক অজ্ঞাত সঙ্কোচে তাঁর মনের সব উদ্ধত বাচলতা স্তব্ধ হয়ে গেল। লেখকের অন্তরে তখন আশু কর্তব্য নিয়ে দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব। একদিকে মালতীর প্রতি তাঁর স্বাভাবিক ক্রোধ, অন্যদিকে দুটি সরল শিশু পটল ও পল্টুর ভবিষ্যত স্বপ্নভঙ্গের আশংকা।

> কর্তব্য আর স্থির হল না। এক অলক্ষ্য ভীরুতা এসে শেষ কথাটাকেও একেবারে চাপা দিয়ে দিল। বলা আর হল না।
> ...ভাবছি — মালতী আর গাঙ্গুলী। কোথায় তারা ? আদিম নীহারিকার মত সব অন্ধকারের বোঝা নিয়ে তারা মুছে গেছে অনেকদিন। আজ যাদের দেখছি তারা কেউ নয়। তারা শুধু পটলের মা আর পটলের বাবা।[১৪২]

এই গল্পে মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি লেখক, মধ্যবিত্তের সহজাত স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেশ এর উর্দ্ধে উঠে ছোট্ট, দুই শিশুর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে যে উদারতার পরিচয় দিলেন, তাতে প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত সমাজকেই আত্মগ্লানি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। গ্লানিহরে লেখক মধ্যবিত্তের গ্লানি হরণ করেছেন বৈকি। মধ্যবিত্তের কঠোর সমালোচক সুবোধ ঘোষ ব্যতিক্রমী এই গল্পটিতে প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্তের হৃদয়বত্তারই জয়গান করেছেন। মধ্যবিত্ত চরিত্র বিশ্লেষণের বিচারে তাই 'গ্লানিহর' নি:সন্দেহে ভিন্নধর্মী। গল্পটি ভিন্নধর্মী আরো এ কারণে যে সুবোধ ঘোষ মধ্যবিত্তের বিরুদ্ধে সর্বত্রই আক্রমণাত্মক নন, বরং উপযুক্ত ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহানুভূতিশীল।

বিভিন্ন লেখকের গল্প-উপন্যাস পাঠ করে একটা সিদ্ধান্ত আমরা অবশ্যই পৌঁছোতে পারি যে কথাসাহিত্যিকেরা প্রত্যেকই কম-বেশী মনস্তত্ত্ব নিয়ে কারবার করেন। বিভিন্ন চরিত্রের নর-নারীর অন্তরের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁদের একটি ধারণা বা উপলব্ধি অবশ্যই থাকে। আর সে জন্যই তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রগুলো পাঠকের মানসচোখে এক সুস্পষ্ট অবয়ব ধারণ করে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। যে লেখকের মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান যত বেশী এবং তার প্রয়োগ যত নিপুন, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রও তত সজীব।

তবে, এ কথাও ঠিক, রসোত্তীর্ণ গল্প উপন্যাস রচনার জন্য লেখকের মনস্তত্ত্ব বিষয়ে অগাধ চর্চা থাকাটা কখনোই সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির প্রাথমিক সর্ত হতে পারে না। সুবোধ ঘোষ কিন্তু মনস্তত্ত্ব বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশুনো করেছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর পান্ডিত্য ছিল অসাধারণ। সুবোধ ঘোষের এই অতিরিক্ত গুণটি এবং তাঁর গল্পে অধীত এই জ্ঞানের যথোপযুক্ত প্রয়োগ তাঁর বেশ কিছু গল্পকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। মনস্তত্ত্ব বিষয়ক একটি প্রবন্ধ 'অকাজের কাজ' এ সুবোধ ঘোষ লিখেছেন —

> মানসিক দ্বন্দ্ব ব্যতীত কোন ব্যবহারিক স্খলন অসম্ভব। কিন্তু যে-ইচ্ছার সংঘাত মানসিক দ্বন্দ্বের জনক তা মনের অগোচর। এই অজ্ঞানতা অলক্ষ্যে ব্যক্তিসত্তাকে পীড়িত করে। ক্রমে এই দাবী এসে বর্তায় সজ্ঞানের উপর। এই অজ্ঞান মনের বাসনাপুঞ্জের তাড়নায় চেতনমন বা সজ্ঞান একটি বিশিষ্ট চিন্তার পথ ধরে অগ্রসর হয়। এই চিন্তার লক্ষ্য হল এমন কতকগুলি প্রত্যয় সৃষ্টি করা যা মনের ক্ষোভ ও ক্ষুধা শান্ত করে। এই হ'ল অতিপ্রত্যয়ের সৃষ্টিক্রম। একে সজ্ঞান কর্তৃক অজ্ঞানকে উৎকোচদান বলা যেতে পারে। দেবতা, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, পরলোক, অমরতা প্রভৃতি মতবাদের ভিন্নার্থ বলতে গেলে অবদমিত ইচ্ছার তুষ্টির জন্য সজ্ঞান চিন্তায় আহৃত বিবিধ ও বিচিত্র উপঢৌকন। পুরাণ কাহিনী ও রূপকথার সৃষ্টির মূলে এই অজ্ঞান মনের উদ্ভট কল্পনাবিলাসের আবেদন রয়েছে। মানুষের বাস্তব-পীড়িত রুদ্ধ আবেগপুঞ্জের মুক্তি প্রয়াস,

যার প্রেরণায় সে সৃষ্টি করেছে এই সব কল্পরাজ্য – তার 'সব পেয়েছির দেশ।' শেষের সেদিন ভয়ঙ্করের বিভীষিকা চিত্ত পরিমন্ডলে যে ছায়াপাত করেছে তারই তাড়নায় সচেতন মন গড়ে তুলেছে তার জরামৃত্যুহীন স্বর্গ, অমৃত ও অনন্তযৌবন। সুতরাং অতিপ্রত্যয়ের মূলে রয়েছে (ব্যবহারিক প্রমাদ বিধায়ক দ্বন্দ্বশীল ইচ্ছাসমষ্টির অস্তিত্ব সম্বন্ধে) 'অজ্ঞাত জ্ঞান' ও 'জ্ঞাত অজ্ঞানতা' (Conscious ignorance এবং Unconscious Knowledge)[১৪৩]

মনোবিজ্ঞানের এ ধরণের অনেক বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণজাত বিশ্বাস সুবোধ ঘোষ পরিবেশন করেছেন তাঁর গল্পে। 'গরল অমিয় ভেল' এমনই একটি গল্প।

এই গল্পে সুবোধ ঘোষ নারী অন্তরের এক স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার বা স্বভাবধর্মের কথাটি তুলে ধরেছেন। যৌবন সমাগমে প্রায় প্রত্যেক নারীই এমন একটি সুখের ভাবনা ভেবে রোমাঞ্চিত হতে চান যে, অন্তত কোন একজন পুরুষ তাকে প্রার্থনা করে। নিদেন পক্ষে তাকে দেখে কোন একজন পুরুষের চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটে। এই আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সেই নারী হৃদয়ের প্রেম বা ভালবাসার কোন সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। হয়ত সেই পুরুষটির সঙ্গে তার ভালবাসা তো দূরের কথা, সামন্যতম দুর্বলতাও নেই। তবু সে একজন পুরুষ প্রার্থিতা। এই ভাবনাটুকু একজন নারীর অন্তরে যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে, সেই আত্মবিশ্বাসই তাকে বাহ্যিক রঙ রূপ নির্বিশেষে, শুধুমাত্র নারীত্বের গর্বে গরবিনী করে তোলে।

একইভাবে, যদি কখনো কোন নারী সম্পূর্ণভাবে পুরুষ উপেক্ষিতা হন, অথবা নিজেকে পুরুষ উপেক্ষিতা বলে ভাবতে শুরু করেন, তবে তার মানসিক অবস্থা এবং সেই অবস্থাজনিত প্রতিক্রিয়া যে কি পর্যায়ে পৌঁছোতে পারে তার পরিচয় আমরা পাই গল্পটির মালা বিশ্বাস চরিত্রে।

মালার চেহারা আদৌ চিত্তাকর্ষক নয়। সে কালো, মোটা। মুখে তার বসন্তের দাগ। অভিনব সাজে সেজে সে অনেকক্ষণ রাস্তার ধারে বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে, শহরের পথে ঘুরে বেড়ায়। এটা তার শুধু দেখার নেশা নয়, বরং 'দেখা দেওয়ার নেশা'। কিন্তু কোন পুরুষের কাছেই সে 'প্রার্থিতা' হয়ে উঠতে পারে না। রাণী ঝিলের মাঠে মেয়ে-পুরুষ সবাই বেড়াতে যায়। সেখানে ছোট একটি কালো পাথরের টিলা। সেই কালো পাথরের বুকে হঠাৎই একদিন ফুটে উঠল শহরের এক যুবতী পূর্ণিমা বসুর সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য। শহরের মানুষ পেল এক পরচর্চার বিষয়। বয়স্কজনেরা সমালোচনা করলেন, অভিযোগ জানান হল পুলিশকে। কিন্তু সবারই চোখ ও মন পড়ে রইল ঐ কালো পাথরের বুকে যদি নতুন কোন মন্তব্য ফুটে ওঠে তার অপেক্ষায়।

শহরবাসীর ঐ আকাঙ্ক্ষায় সাড়া দিয়েই যেন পূর্ণিমার পর ঐ কালো পাথরে একের পর এক ফুটে উঠল, সুমিতা, সুধা ও প্রীতির নাম। মন্তব্যগুলো বিভিন্ন হলেও প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঐ চারজন যুবতীর প্রণয়ের কথাই উল্লেখিত হয়েছে। মালতী সবিস্ময়ে লক্ষ করল, পাথরের বুকে নাম ফুটে ওঠার পর ঐ চার যুবতীই যেন এক বিশেষ মর্যাদা উপভোগ করছে। তারাই যেন শহরের একমাত্র দ্রষ্টব্য, সবার চোখ তাদের দিকে, সবার মুখেই তাদের কথা। আরো মজার কথা লজ্জিত না হয়ে, পূর্ণিমা, সুমিতা, সুধা, প্রীতিরা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছে পাথরে লেখা ঐ মন্তব্যজনিত উদ্ভুত পরিস্থিতি। মালা তার চটকদার সাজ-সজ্জা ছেড়ে অতি সাধারণ সাজ-পোষাকে শেষবারের মত অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাতেও ব্যর্থ হয়। অবশেষে মালা এই আত্মগ্লানি থেকে মুক্তি পেতে চুপিসারে ঐ কালো পাথরের বুকে নিজহাতে লিখে দিয়ে আসে —

মালা বিশ্বাস, তোমায় দূর থেকে সেলাম করি। এক, দুই তিন চার ...
থাক্, বেচারাদের নাম আর করবো না। কত পতঙ্গের পাখা পুড়ে গেল।

আর সংখ্যা বাড়িও না। তোমার চিঠির তাড়া রাণীঝিলের জলে ভাসিয়ে দিয়ে এবার সুস্থির হও।[১৪৪]

মালা বিশ্বাসের এই শিলা লিখনের মধ্য দিয়ে লেখক একজন মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে দেখিয়েছেন যে প্রতিটি নারী অন্তরেই সচেতন বা অচেতন ভাবে পুরুষ কাঙ্ক্ষিতা হয়ে ওঠার এক অদম্য ইচ্ছা কাজ করে। সেই ইচ্ছাপূরণে অনেক নারী চরিত্র অনেক বেপরোয়া সিদ্ধান্ত নিতেও পিছু-পা হয় না।

কৌন্তেয় গল্পটি সুবোধ ঘোষের মনস্তাত্ত্বিক গভীরতার আর এক নিদর্শন। পৃথিবীর সর্বদেশে সর্বকালে প্রতিটি মানুষ আজীবন পিতা-মাতার যে পরিচয় বয়ে বেড়ায়, সে পরিচয় সর্বক্ষেত্রেই শ্রুতিনির্ভর, নিষ্পাপ শিশুর সরল বিশ্বাস সঞ্জাত। গর্ভধারিনীর সাক্ষ্য-প্রমাণ মিললেও পিতৃপরিচয়ের প্রমাণ মাতার স্বীকৃতিতেই। সাধারণভাবে এ নিয়ে বড় কোন সমাজিক সমস্যা নেই। কিন্তু যদি কোন সুযোগ সন্ধানী, মানুষের জীবনের এই প্রথম বিশ্বাসের জায়গাটিতে সুকৌশলে আঘাত হানতে পারে, তবে অনেক শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, আধুনিক অন্তরও যে বেসামাল হয়ে পড়তে পারে, লেখক তা অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে এই গল্পটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

মিস্ সুহাসিনী পল, হৃত গৌরব, হতদরিদ্র এক বৃদ্ধা। ভিক্ষাবৃত্তিকেও এক অভিজাত রূপ দেবার চেষ্টায় সে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভিক্ষা নয়, 'চ্যারিটি' আশা করে। দু-এক আনা পেয়েও যায়। হঠাৎই একদিন তরুণ ইঞ্জিনীয়ার মাধব দত্তর বাড়ি গিয়ে আট আনা পায় সুহাসিনী। লোভ বাড়ে তার। আবার যায় সে বাড়িতে। মাধব অনুপস্থিত। মাধবের মা 'ঠগ্-জোচ্চোর' বলে তাকে তাড়িয়ে দেয় বাড়ি থেকে। ধূর্ত, প্রবঞ্চক সুহাসিনী এই অপমানের চরম প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রস্তুত হয়।

একদিন বাড়ি ফেরার পথে মাধবকে রাস্তায় ধরে সুহাসিনী। চোখের জলে যতটা সম্ভব বিশ্বাসযোগ্য করে বুড়ি মাধবকে জানায় যে সেই মাধবের প্রকৃত গর্ভধারিনী। মাধব তার 'জীবনের প্রায় ত্রিশ বছর আগে এক ভুল ভালবাসার লজ্জা'। মাধব এ কথা বিশ্বাস করতে না পারলেও, তার বুক কেঁপে ওঠে। তাড়াতাড়ি দশটি টাকা বের করে দিয়ে বিদায় করতে চায় বুড়িকে। যে সুহাসিনী এক আনার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়, সে দশ টাকার অপার আকর্ষণ ত্যাগ করে, মাধবের মনে আশংকাটা আরো উস্কে দিয়ে চলে যায়।

বিশ্বাস না করলেও, চিন্তাটা ছাড়তে পারে না মাধব। গল্প শুনে মাধবের মায়ের চোখেও আতঙ্কের ছায়া কেঁপে ওঠে। আক্ষেপ করেন – 'মানুষের জন্মের ঠিকানাই ভুল করিয়ে দিতে চায় — এ কী ভয়ঙ্কর বুড়ি রে বাবা!' সুহাসিনী আর মাধবের বাড়ির পথ মারায় না। একদিন মাধবই বুড়িকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে ডাকে। সুহাসিনী মাধবের দুর্বলতার গন্ধ পেয়ে, নকল মাতৃত্বের সুধা বর্ষন করে, মাধবকে তার দারিদ্র্য-জর্জর আস্তানায় নিয়ে গিয়ে চা-খাবার খেতে দেয়। ফেরার পথে বুড়িকে পঁচিশ টাকা দিতে চায় মাধব, যদিও সে সুহাসিনীকে বলে গল্পটি সে বিশ্বাস করেনি। কালবিলম্ব না করে সুহাসিনী ছোঁ মেরে টাকাটা তুলে নিয়ে পালায়।

জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে উদ্ভট এক তথ্য শুনিয়ে সুহাসিনী মাধবের অন্তরে এমন এক জায়গায় আঘাত করেছে, যার ফলে মাধবের বিশ্বাসের ভিতটাই টলে উঠেছে। মাধবের রুচি, শিক্ষা, আধুনিকতা কিছুই সুহাসিনীর পরিকল্পিত প্রবঞ্চনাকে পুরোপুরি রুখতে পারেনি। — অন্তরের গভীরে বিচরণের অসাধারণ দক্ষতায় সুবোধ ঘোষ দেখিয়েছেন মানুষের জীবনের গভীরে বিশ্বাসের ভিত কতটা নড়বড়ে। গল্পটিতে সুহাসিনী পল প্রধান চরিত্র হলেও, শিক্ষিত মাধবের মানসিক দ্বন্দ্বই গল্পটির মূল আকর্ষণ, যা পূর্বাপর পাঠককে উৎকন্ঠিত করে রাখে।

একটি-দুটি নয়, অনেক গল্পেই সুবোধ ঘোষ তাঁর অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক পান্ডিত্যের প্রমাণ রেখেছেন। নিশিচক্রবাকী, একতীর্থা, অর্কিড, দেবতারে প্রিয় করি, শরীরিনী গল্পগুলোতে মনস্তাত্ত্বিক সুবোধ ঘোষের প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়।

নিশিচক্রবাকী গল্পে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নারী-চরিত্র রয়েছে। চার সন্তানের জননী পূরবী, উচ্চবিত্ত রায় বাড়ির নি:সন্তান কর্তা-মা, মাধবী এবং পূরবীর বড় জা। পূরবী অতি দরিদ্র, মাধবী কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন এবং বড়-জা অবস্থাপন্ন ঘরের গৃহিণী। পূরবী-ধীরাজের নিত্য অভাবের সংসারে, তাদের সন্তানদের কষ্ট দেখে ধীরাজের দাদা বিজয়বাবু পূরবীর কন্যা রানুকে নিয়ে যান নিজ সংসার প্রতিপালণের জন্য। একইভাবে বড়ছেলে নীলুকে নিয়ে যায় পূরবীর দাদা হেমন্তবাবু এবং মেজ-ছেলে সুকুকে নিয়ে যায় পূরবীর দিদি সুমিতাদি। একমাত্র ছোট ছেলে সন্তুকে নিয়েই ধীরাজ-পূরবীর দরিদ্র সংসার।

রিক্ততা আর নি:স্বতার সংসারে ধীরাজ-পূরবী তাদের তিনটি সন্তানের প্রতিপালণের এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট। উভয়েই একমত যে তাদের মেয়ে ও ছেলে দুটির ভাগ্য ভালই বলতে হবে – কারণ তারা প্রত্যেকেই সচ্ছল সংসারে আপনজনের কাছে থেকে মানুষ হতে পারছে। অন্যদিকে নি:সন্তান কর্তা-মা মাধবী, পূরবী যখনই এক একটি সন্তানকে অন্যের হাতে তুলে দিয়েছে, তখনই এসে জানতে চেয়েছে পূরবীর কটি সন্তান ! পূরবী প্রতিবারই জানিয়েছে তার সন্তান চারটি।

গল্পটির মনস্তাত্ত্বিক দিকটি প্রকট হয়েছে শেষ পর্বে, যখন ধীরাজ আর পূরবী তাদের মেয়ে রানুর বিয়েতে ধীরাজের দাদা বিজয়ের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। বিয়ের দিন বিয়েবাড়িতে পৌঁছে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পূরবীর মুখ - বিয়ের জাঁকজমক দেখে, মেয়ের সৌভাগ্য দেখে। সন্ধ্যায় বড়-জাকে খুঁজতে গিয়ে পূরবী দেখে, বড়-জা বিছানায় অঝোরে কাঁদছেন পূরবীর মেয়ে রাণুর আসন্ন বিদায় বেদনায়। বড়-জার এই চোখের জলে পূরবীর অন্তরে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। গর্ভধারিনী হওয়া সত্ত্বেও মেয়ের আসন্ন বিদায়ের কথা ভেবে কাঁদতে না পারায় এক 'সৌভাগ্যহীন শূন্যতা' তার অন্তরকে গ্রাস করে। পূরবী উপলব্ধি করে সে শুধুই একজন নিমন্ত্রিতা। তাই অভ্যাগতের মত সে শুধু হেসেছে।

এক সর্বগ্রাসী শূণ্যতায় পূরবী তার ছোটছেলে সন্তুকে আঁকড়ে ধরে। ঠিক তখনই মাধবী এসে একইভাবে পূরবীর কাছে জানতে চায় 'তোমার কটি ছেলেপুলে' কিন্তু এবার পূরবীর উত্তর ভিন্ন। সন্তুকে জড়িয়ে ধরে সে বলে – 'একটি, একটি। এই একটি আর কেউ নেই।' কারণ, পূরবী উপলব্ধি করতে পেরেছে যে কেবলমাত্র গর্ভে ধারণ করেই মা হওয়া যায় না। আবার গর্ভে ধারণ না করেও, প্রতিদিনের মমতায়, ভালবাসায়, লালনে-পালনে একটি নারী অন্তর প্রকৃত মাতৃত্বের সুধায় পরিপূর্ণ হতে পারে। আর তাই পূরবী আঁকড়ে ধরে তার কনিষ্ঠ সন্তান সন্তুকে।

এই গল্পে মাধবী যেন পূরবীর বিবেকের প্রতিমূর্তি। নিজের সন্তানকে প্রতিবারই অন্যের হাতে তুলে দেবার পর, পূরবীর অন্তরে ঝড় উঠেছে প্রশ্নের – কটি সন্তান তার ? প্রতিবারই জোর-গলায় 'চারটি সন্তান' উত্তর দিয়ে যেন নিজের বিবেকেরই কন্ঠরোধ করেছে। কিন্তু শেষবার বিবেকের প্রশ্নে, পূরবী স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, তাঁর একটিই সন্তান, চারটি নয়। কারণ, তার তিনজন গর্ভজাত সন্তান যারা অন্যের ঘরে মানুষ হয়েছে, তাদের সঙ্গে পূরবীর নাড়ীর যোগ ছিন্ন হয়েছে, অন্তরের টানও হয়েছ শিথিল।

একতীর্থা এক ভিন্ন ধরণের মনস্তাত্ত্বিক গল্প। বিধবা ও নি:সন্তান স্কুল শিক্ষিকা বিণা দিদিমণির প্রৌঢ় বয়সের সখ চারটি ছাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে প্রতি শনিবার সিনেমা দেখা। ছাত্রীরা গৌরী, লীলা, শান্তি আর অর্চনা। সিনেমায় কোন মিলনাত্মক দৃশ্য এলেই দিদিমণির নির্দেশে চারজন সঙ্গী ছাত্রীকেই পর্দা থেকে চোখ নামাতে হয়। সেই দৃশ্য শেষ হলে দিদিমণির সংকেতে ছাত্রীরা আবার ছবি দেখে। একে একে

গৌরী, লীলা এবং শান্তির বিয়ে হয়ে গেলে তারাও দিদিমণির সঙ্গে মিলনাত্মক দৃশ্য দেখার ছাড়পত্র পায়। একমাত্র চোখ নামিয়ে থাকতে হয় অর্চনাকে। অর্চনা তের বছরে বিয়ে হয়ে সাড়ে তের বছরে বিধবা। বর্তমানে তার বয়স উনিশ। গৌরী, লীলা ও শান্তি শ্বশুরবাড়িতে থাকার জন্য এক শনিবারে বীনা দিদিমণি অর্চনাকে নিয়েই ছবি দেখতে যায়।

ছবির দৃশ্যে তখন এক কুলবতী সধবা নারী 'ব্যাধিজীর্ণ' মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীকে উপেক্ষা করে, পাশের ঘরেই এক যুবক সন্ন্যাসীর আলিঙ্গনে ধরা দিচ্ছে। পরবর্তী দৃশ্য অনুমান করে অর্চনা তার অভ্যাসমত ছবির পর্দা থেকে চোখ নামায়। কিন্তু এবার দিদিমণি অর্চনাকে চোখ নামাতে বারণ করে। বলে – 'চোখ নামাতে হবে না। মাথা ওঠাও। ছবি দেখ' এখানেই গল্পটির সমাপ্তি।

বীণা দিদিমণি গল্পটির কেন্দ্রিয় চরিত্র। একদিকে তিনি যেমন ছাত্রীদের অভিভাবকত্ব করেছেন, অন্যদিকে সদ্য বিবাহিতা ছাত্রীদের বরের চিঠি পড়ে নিজের বুভুক্ষু বৈধব্য জীবনের তৃষিত অন্তরে ক্ষণিক তৃপ্তিলাভের চেষ্টা করেছেন। সিনেমা দেখতে গিয়ে অবিবাহিতাদের মিলনদৃশ্য দেখতে নিষেধ করে তিনি যেমন বিবাহিতের অধিকার সম্পর্কে সঙ্গী ছাত্রীদের অবহিত করেছেন; ঠিক তেমনই গল্পের শেষ অংশে ঊশিশ বছরের বিধবা তরুণী, অর্চনাকে মিলন দৃশ্য দেখার অনুমতি দিয়ে তাকে নিজের স্বগোত্র করে তুলেছেন। কারণ, দেরীতে হলেও বীণা দিদিমণি বুঝেছিলেন, অর্চনা বালবিধবা হলেও সাবালিকা এবং সমাজের কোন অনুশাসনই জীবনের চেয়ে বড় নয়। আগাগোড়া হাল্কাচালের এই গল্পটিতে সুবোধ ঘোষ একজন শিক্ষিতা, নি:সন্তান এবং বিধবা নারীর মনস্তত্ত্বের গুরুগম্ভীর বিষয়টি পরিবেশন করেছেন নিজস্ব ভঙ্গীতে।

অর্কিড গল্পে মধুপুরের বোটানিস্ট প্রণব বসু এবং তার স্ত্রী করুণা, দুজন দুই প্রান্তের বাসিন্দা। বোটানিস্ট বসু কাজ-পাগল আর করুণার সময় কাটেনা। প্রণবের ধ্যান জ্ঞান, স্বপ্ন, সাধনা সবই অর্কিড, ফুল আর নিত্য নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষাকে ঘিরে। রোজগার নেই অথচ সংসারের খরচ আছে। করুণার অবস্থা খুবই করুণ। একটি সামান্য লতা-পাতার জন্য তার স্বামীর যে ভালবাসা, উদ্বেগ ঝরে পড়ে, তার এক সামান্য ভগ্নাংশও করুণার কপালে জোটে না। হাড়িতে টান পড়ে। সংসারের সে সব খবর রাখে না বোটানিস্ট। প্রণব যখন করুণার কাছে জানতে চায় গতকাল সে ভাত খেয়েছিল কিনা, করুণা বাধ্য হয়ে মিথ্যা কথা বলে – 'হ্যাঁ খেয়েছিলে'। তাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে অবোধ শিশুর মত কাজে চলে যায় প্রণব। করুণা এবং তার আত্মীয় বন্ধুদের কাছে বোটানিষ্ট প্রণব, পাগল ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ এই কঠিন আর্থিক অবস্থাতেও ভাল চাকুরীর সুযোগ পেয়ে তা প্রত্যাখ্যান করার মত সাহস রাখে প্রণব।

এরই মাঝে প্রণব এক নতুন অর্কিড উদ্ভাবণ করে, স্ত্রী করুণার নামে অর্কিডটির নাম রাখে 'কালান্থিস করুণাইনা'। ইতোমধ্যে বিলেত ফেরত, বিত্তবান গুণাকর আসে প্রণবের বাড়িতে। বিলেতে দুজনেই পরিচয় থাকলেও, গুণাকর তার নিয়মিত আসা যাওয়ায়, কাজ-পাগল প্রণবকে দূরে রেখে, ক্রমশ করুণার কাছের মানুষ হয়ে ওঠে। সংসারের একান্ত বেহাল অবস্থায় একদিন করুণা গুণাকরের কাছে পাঁচ হাজার টাকা চেয়ে বসে। গুণাকর পরদিনই ঐ টাকা নিয়ে আসবে জানায়। কিন্তু পরদিন গুণাকরের জুতোর শব্দ শুনেই কি এক আশংকায় কেঁপে ওঠে করুণার অন্তরাত্মা। সে পেছনের দরজা দিয়ে নেমে কাজ-পাগল স্বামীর কাছে, তার গবেষনা ক্ষেত্রে গিয়ে উপস্থিত হয়। প্রণব অবাক এবং উৎফুল্ল হয়। সে করুণাকে দেখায় তার উদ্ভাবিত অর্কিড – কালান্থিস করুণাইনা। দেখে করুণা বলে – 'খুব ভাল অর্কিড'।

বিবাহিত জীবনে এই প্রথমবার প্রণবের কাজের প্রতি করুণার সামান্য একটু প্রশংসায়, প্রণবের উদ্ভাবনের প্রতি করুণার একটু সমর্থন প্রকাশের ফলে, বোটানিস্ট প্রণবের বিশ্বাস, চিন্তা-চৈতন্য আলোড়িত

হয়। বিস্মিত প্রণব ছলছল চোখে স্ত্রী করুণাকে প্রশ্ন করে —

– এ কথা এতদিন বলনি কেন ?
– বলে কি লাভ হতো ?
– আমার লাভ হতো।
– তোমার লাভ ?
– হ্যাঁ, বুঝতে পারতাম তুমি আমাকে পাগল মনে কর না।

এদিকে করুণাকে ঘরে না পেয়ে গুণাকর প্রণবের গবেষণাক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়। অবাক হয় করুণাকে তার পাগল-স্বামীর কাছে অন্তরঙ্গভাবে থাকতে দেখে। গুণাকরের প্রশ্নের উত্তরে করুণা পরিস্কার জানিয়ে দেয়, তার আর টাকার প্রয়োজন নেই। গুণাকরের বিস্ময় চরমে পৌঁছোয় যখন প্রণব বলে- এবার তার একটা 'চাকরি-বাকরি' নিতে হবে।

এই গল্পে দাম্পত্য জীবনের একটি বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক দিকের উপর আলোকপাত করেছেন সুবোধ ঘোষ। তিনি পরিস্কারভাবে বলতে চেয়েছেন যে দাম্পত্য জীবনকে সুখের করতে হলে একটু পারস্পরিক শ্রদ্ধা একান্ত আবশ্যক। এই শ্রদ্ধা আসতে পারে জীবনসঙ্গীর পেশা ও ভাবনাকে একটু সদর্থক সমর্থন জানিয়ে। একটু উৎসাহ যুগিয়ে।

'দেবতাকে প্রিয় করি' গল্পটিতে একজন পরিণত মানুষের ঈশ্বরানুসন্ধানের আন্তরিক চেষ্টার সঙ্গে, জাগতিক মায়ার দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয়েছে। দেবতাকে প্রিয় করতে গিয়ে প্রিয়ই দেবতা হয়ে উঠেছে এই গল্পে।

সনাতনবাবু অনেক খেটে অনেক শোক-সন্তাপ সহ্য করে, জীবনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে, নিজেকে সুখ-দুঃখ থেকে সরিয়ে নিয়ে ঈশ্বর সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। তিন ছেলে ও দুই মেয়ের মধ্যে বেঁচে আছে মাত্র একটি ছেলে হরেন। হরেন অধ্যাপক এবং বিবাহিত। সংসার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন সনাতনবাবু কঠোরভাবে নিজ বৃত্তেই অবস্থান করেন। তাঁর আরাধ্য দেবতা 'নারায়ণ'ই তাঁর চিন্তা-চেতনার একমাত্র বিষয়। সংসারে সুখ-দুঃখের কোন তরঙ্গ যাতে তাঁকে স্পর্শ করতে না পারে, সে জন্য হারান এবং তার স্ত্রী কমলা অত্যন্ত সজাগ। এরই মধ্যে হারানের ছেলে জন্ম নিল। সনাতনবাবুর ইচ্ছায় নবজাতকের নামকরণ করা হল-'নারায়ণ'। ছোট্ট ছেলেটির নাম ধরে ডাকলেও যাতে আরাধ্য দেবতা নারায়ণের নাম তাঁর কানে পৌঁছোয়, আরো বেশী করে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পরেন, সেজন্য এ নামকরণ। সনাতনবাবু চোখ বন্ধ করলেই তাঁর অন্তরে দেখতে পান শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী নারায়ণকে। সনাতনবাবু মাঝে মাঝেই দেখতে পান, তার ছোট্ট নাতি, তিন বছরের নারায়ণ বাড়ির বকুলতলায় ধুলো-মাটি নিয়ে খেলছে। একদিন কান্নার রোল আর বিলাপের সুরে সনাতনবাবু বুঝতে পারেন যে তাঁর নাতি নারায়ণ এ পার্থিব শরীর ত্যাগ করেছে। ঈশ্বর সাধনায় অটল সনাতনবাবু আরো গভীরভাবে মনোসংযোগ করেন আরাধ্য দেবতা নারায়নের চিন্তায়। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করলেন, দেবতা নারায়ণ আর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম নিয়ে তাঁর অন্তরে আবির্ভূত হচ্ছেন না বরং তার হৃদয়ে ফুটে উঠছে বকুলতলার ধুলো-মাটি মাখা নাতি নারায়ণের শিশু মুখ।

একদিন দেবতাকে প্রিয় করার জন্য যে নাতির নাম নারায়ণ রাখা হয়েছিল, সে নাতিই যেন কি এক অসীম ক্ষমতায় ঈশ্বরের আসনে জাঁকিয়ে বসেছে। প্রিয়ই হয়ে গিয়েছে দেবতা। চেতন মনে নাতির মৃত্যুকে আমল না দিলেও, সনাতনবাবুর অবচেতন মনে যে ছোট্ট নাতির মুখ আঁকা হয়ে গিয়েছিল, সেই মুখ-ই বারবার তাঁর অন্তরে উঁকি দিচ্ছে আরাধ্য দেবতার জন্য সংরক্ষিত প্রকোষ্ঠে। সংসারী মানুষের, সংসারে থেকে, সংসারেরই ঘটনা প্রবাহকে অস্বীকার করে ঈশ্বরানুসন্ধানের একনিষ্ঠ চেষ্টার ফলে, চেতন

ও অবচেতন মনের যে দ্বন্দ্ব, তা লেখক বাস্তবসম্মতভাবে বিশ্বাসগ্রাহ্য করে তুলেছেন তাঁর অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক প্রজ্ঞায়।

শরীরিনী পুরোপুরি মনস্তত্ত্ব নির্ভর গল্প। দেবতাকে প্রিয় করি-তে লেখক বাস্তব সংসারকে হৃদয়ের দেবতার তুলনায় এগিয়ে রেখেছেন এবং শরীরিনীতে বাস্তববাদী সুবোধ ঘোষ পরিষ্কার ঘোষনা করেছেন শিল্পের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই শিল্পী। লেখকের দৃষ্টিতে মানুষ এবং মানুষের সংসারকে বাদ দিয়ে ঈশ্বর বা শিল্প একান্ত অর্থহীন। এখানেই সুবোধবাবু বাস্তববাদী এবং অবশ্যই মানবতাবাদী।

শোভন সেন তার স্টুডিওতে মডেল নীতা মিত্রের বিভিন্ন ভঙ্গীর ছবি আঁকেন। শোভন সেন যখন নগ্না নীতার ছবি আঁকেন, তখন নীতা শুধুই একটি শরীর। নীতার উন্মুক্ত শরীরের শিল্পসুলভ ভঙ্গীকে ক্যানভাসে নিঁখুত ভাবে ধরে রাখাই শোভনের কাজ। মডেল হিসেবে নীতাকে পেয়ে খুবই সন্তুষ্ট শিল্পী শোভন। তবে, শোভন নীতাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময় ছবি আঁকার উপযুক্ত একটি শরীরমাত্র ভাবে, এর বেশি কিছু নয়।

একবার শোভন অসুস্থ হয়ে পড়ায়, নীতা কিছুক্ষণের জন্য পোষাক পরিহিত অবস্থায় শোভনের সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ পায়। শোভনের ইচ্ছায় তাকে কফি তৈরী করেও খাওয়ায়। আচমকা শোভন প্রশ্ন করে বসে পরদিন এসে নীতা কি এমনি ভাবে তার জন্য কফি তৈরী করবে ? নীতার হ্যাঁ বাচক উত্তরে, শোভন আরো এক ধাপ এগিয়ে প্রশ্ন করে বসে, এমন ভাবেই চিরকাল যদি কফি তৈরী করতে হয় তবে ? — নীতা তার বুকের ভেতর সব আলোড়ন আর উচ্ছাস চেপে রেখে জানায় – 'চিরকাল কোরব'। কিন্তু পরদিনই শোভনকে আবার দেখা গেল রঙ-তুলি হাতে ষ্টুডিওতে। ষ্টুডিওতে শোভন শুধুই এক শিল্পীস্বত্ত্বা, রক্ত, মাংসের এবং প্রাণের সজীবতায় পরিপূর্ণা নারীর প্রতি তার কোনও দুর্বলতা নেই। নীতাকে এক চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের মত, বিবস্ত্রা হয়ে, শিল্পীর নির্দেশমত বিশেষ ভঙ্গীতে উপস্থিত হতে হয় তার শিল্প সৃষ্টির তৃষ্ণাকে নিবারণ করতে। মানুষ শোভনকে কেন্দ্র করে যে এক ঝলক স্বপ্ন নীতার অন্তরে জেগে উঠেছিল, তা মিলিয়ে যেতে দেরী হয় না।

শোভনের আচরণের এই বৈপরীত্য এবং নীতার আশাহত হওয়ার ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করে লেখক গল্পটির মধ্যেই মন্তব্য করেছেন —

> বোধহয় দেখতে ভুলে গিয়েছিল নীতা, ইনি মস্ত বড় এক শিল্পী, শুধু ছবি আঁকেন আর ছবিকে ভালবাসেন। কোথায় কবে কার হাত থেকে এক পেয়ালা কফি নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন, সেটা কি আর এরকম এক খেয়ালী মানুষের পক্ষে মনে রাখবার মত কোন ঘটনা ? বয়কে ডাকতে ইচ্ছে হয়নি বলেই নীতাকে কফি তৈরী করতে বলেছিলেন। বয়ের কাজ নীতার হাত দিয়ে করিয়ে নেওয়া হয়েছে, এই মাত্র।[১৪৫]

এরই মধ্যে নীতার বিয়ে ঠিক হয়। বিয়ের দিন উপস্থিত হয় শোভন। বিয়ের সাজে নীতাকে দেখে বিস্মিত হয়। চার মাস পর শোভনের চিঠি পেয়ে দেখা করতে আসে নীতা। শোভন চায় নীতা আবার, অন্তত একবার, উন্মুক্ত শরীরে তার ষ্টুডিওতে উপস্থিত হোক। রাজী হয়নি নীতা। শোভন নীতার স্বামীকে তার মডেল জীবনের কথা জানিয়ে দেবার হুমকি দিলেও, নীতা সম্মত হয় না, বেআব্রু হয়ে শোভনের নির্দেশিত ভঙ্গীমায় ষ্টুডিওতে দাঁড়াতে। নীতার স্পষ্ট বক্তব্য 'আমি মেয়ে মানুষ', শুধু একটি শরীর নয়। বিবাহিতা নীতার আরো যুক্তি – 'এ শরীর আমার শরীর নয়'।[১৪৬]

একজন বিবাহিতা নারী, পুরুষের অর্ধাঙ্গিনীও বটে। প্রাক্-বিবাহিত জীবনে একজন নারী তার নিজ দেহের স্বত্ত্বাধিকারী হলেও, বিবাহ পরবর্তী জীবনে তার দেহের ওপর স্বামীর যে অধিকার জন্মে, একজন

নারী হিসেবে স্বামীকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে নি নীতা।

নীতার এই মানসিক পরিবর্তন, শোভনের মানসিকতায়ও পরিবর্তন এনেছে। আর তাই গল্পের শেষাংশে দেখা যায় শোভন তার সৃষ্ট লুব্ধকের যৌবনোন্মাদ মূর্তিটিতে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছে। লুব্ধকের চেহারা দেখে এবার শোভনের মনে হয়েছে —

> অনেক ভুল রয়ে গিয়েছে মূর্তিটার গঠনে। চিবুকের মধ্যে একটা মুর্খতা যেন ঢিবির মত উঁচু হয়ে রয়েছে। ওটা চৌরস করে দিতে হবে। আর দু'চোখের মধ্যে শুধু ওরকম একটা জ্বলজ্বলে লোভও ঠিক নয়। একটু স্নিগ্ধতা চাই। ভুরু দু'টোকে আরো একটু নামিয়ে দিয়ে, চোখের খাঁজটা আর একটু টান করে দিতে হবে।[১৪৭]

শিল্প, শিল্পী এবং শিল্পবস্তু সম্পর্কিত এই মনস্তাত্ত্বিক গল্পে সুবোধ ঘোষ মানুষকেই সর্বোচ্চভাগে তুলে ধরেছেন।

সুবোধ ঘোষ শুধুমাত্র জন্মসূত্রেই ভারতীয় ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন যথার্থ ভারত প্রেমিক। ভারতবর্ষের সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর যেমন যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসা ছিল, তেমনই বিষয়গুলি নিয়ে তিনি প্রতিনিয়ত চর্চা করতেন। ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীর যে কোন ভাল-মন্দ সম্পর্কে তিনি ছিলেন সরব।

এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা সুবোধ ঘোষ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন ভারতবর্ষের শ্রমিক, কৃষক, আদিবাসী এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষের সমস্যাগুলো। প্রায় চার দশক ধরে আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিকতা করার সময় এই সমস্যাগুলো নিয়ে তিনি অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এই প্রবন্ধগুলো পাঠ করলেই ভারত ও ভারতবাসী সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়।

আনন্দবাজার এবং দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর এ ধরণের প্রবন্ধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য — ভারত রাষ্ট্রজীবন প্রভাত, ভারতীয় ফৌজের রূপান্তর, কৃষক মজুর ও শ্রেণীতত্ত্ব, প্রজাতন্ত্র ভারতের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট, সমাজবাদের পথে, এ যুগের ভারতবর্ষ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটিরশিল্প, গণতন্ত্রের জিজ্ঞাসা, ভারতের সমাজিক নবনির্মাণ, সংস্কৃতির অগ্রগতি, সমন্বয়ের ভারতভূমি প্রভৃতি।

সমন্বয়ের ভারতভূমি প্রবন্ধে সুবোধ ঘোষের অকৃত্রিক জাতীয়তাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি বলেছেন —

> সকল ধর্মই সত্য, এই বাণী একান্তভাবে ভারতেরই বাণী। আড়াই হাজার বছর পূর্বের ভারতের গিরিগাত্রে খোদিত অশোকের অনুশাসন হতে সুরু করে সেদিনের দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণ পর্যন্ত, সকল মনীষী সাধক ও মহাপুরুষের বাণীতে ঐ তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে। তাই ভারতীয় সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বাণীতে এমন আবেদন সহজেই ধ্বনিত হয় – I see in my mind's eye the future perfect India rising out of this chaos and strife, glorious and invincible, with Vedanta brain and Islam body.
>
> নানা মত নানা ভাষা ও নানা পরিধান, কিন্তু এই বিবিধের মধ্যেও এক মহান মিলনের রূপ ভারতের জীবনে সত্য হয়েছে তার সমন্বয়সাধিনী শক্তির গুণে। ভাষার ভেদ ভারতে জাতীয় ঐক্যের বাধা না হয়ে বরং মিলনেরই সূত্র হয়ে উঠেছে। এ সত্যের স্বীকৃতি ভাষাতাত্ত্বিকের বিবরণীতে পাই — A man could almost walk for 1500 miles from Dibrugarh to Goa,

without being able to point to a single stage where he had passed from one language to another [Linguistic Survey of India, report]

এ তো সত্যই 'এক দেহে লীন' হয়ে থাকারই মত সার্থক সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত। ভারতের এই সব বিভিন্ন ভাষার মধ্যে প্রাচীর খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং মনে হয়, ভারতের ভাষা যেন একই গঙ্গার জলধারা। একটি প্রবাহ সারাদেশের মনোভূমির ওপর দিয়ে চলেছে। কোথাও পাথর, কোথাও মাটি, তাই শুধু কলধ্বনির বৈচিত্র্য।[১৪৮]

এ যুগের ভারতবর্ষ প্রবন্ধে, ভারতপথিক সুবোধ ঘোষ উপসংহারে লিখেছেন —

প্রাচীনতম সভ্য দেশ ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, ইতিহাসে এ ঘটনা নতুন। যেভাবে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো, তাও ইতিহাসে নতুন। অর্থাৎ অহিংস পন্থায় সংগ্রাম দ্বারা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন, অভিনব ঐতিহাসিক ঘটনা বৈকি। ইংলন্ডের ইতিহাসেও এই ঘটনা অভিনব। শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনার দ্বারা ক্ষমতা হস্তান্তর করে এক বিরাট দেশ ও জাতীকে স্বরাষ্ট্র সম্পন্ন করে দেওয়া, ইতিহাসে এ ঘটনা ব্রিটিশের বৃহত্তম গৌরবের অধ্যায়। বৃহত্তম প্রজাতন্ত্রের আবির্ভাব, পৃথিবীর ইতিহাসে এই ঘটনাও নতুন। ব্রিটিশ কমনওয়েলথও যে তার পুরাতন নীতি বর্জন করে নতুন হয়ে গেল। বিরাট সংখ্যক এসিয়াবাসী আজ কমনওয়েলথের মধ্যে এসেছে। পূর্বে কমনওয়েলথ ছিল শ্বেতাঙ্গদের কমনওয়েলথ। সিংহল, ভারত ও পাকিস্তানকে নিয়ে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের শ্বেতাঙ্গত্বই বদলে গেছে। তার ওপর, প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রকেও কমনওয়েলথের সদস্য বলে স্বীকার করায় নতুন উদাহরণ দেখা দিল।

এতগুলি ঐতিহাসিক নতুন ঘটনা ভারতবর্ষকেই কেন্দ্র করে ঘটেছে। এর তাৎপর্য বুঝতে কি এখনো আমাদের দেরী হবে? ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে বর্তমান যুগকেই যে নতুন রূপে গ্রহণ করার পথে নিয়ে চলেছে। নিজেদের এই মহত্ব অনুভব করতে যদি কুন্ঠিত হই, তবে ভুল হবে। জাতীর ইতিহাসকে অসম্মান করা হবে।[১৪৯]

ভারতীয় ফৌজ সম্পর্কে সুবোধ ঘোষ ছিলেন খুবই শ্রদ্ধাশীল। ভারতীয় ফৌজের রূপান্তর প্রবন্ধের শেষাংশে তিনি বলেছেন —

স্বাধীনতা লাভের পর জাতীর ঐতিহাসিক পটভূমিও বদ্‌লে গেছে এবং জাতীয় প্রয়োজনও বহুদূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু জাতীর বিভিন্ন সমাজ ও বিভাগ এই প্রয়োজনের অনুরূপ সাড়া দিয়ে এগিয়ে যায়নি, বরং পিছিয়ে আছে। একমাত্র যে সমাজ জাতীর এই নতুন ঐতিহাসিক প্রয়োজনের অনুরুপ বদ্‌লে গিয়ে নতুন মন, রুচি আদর্শ সংগঠন নিয়ে এগিয়ে যেতে পেরেছ, সেই সমাজটি হলো ভারতীয় ফৌজ। ঘটনাটি তাই ধাঁধার মত মনে হয়, যারা পিছিয়ে ছিল তারাই এগিয়ে গেল এবং যারা এগিয়ে ছিল তারা রইল পড়ে।[১৫০]

সুবোধ ঘোষের সাংবাদিকতা এবং সাহিত্যসৃষ্টি চলেছিল সমান্তরালভাবেই। তিনি একদিকে যেমন লিখেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ অন্যদিকে নিত্য নতুন বিষয় সন্ধান করে রচনা করেছেন ছোটগল্প ও উপন্যাস। যেহেতু প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, সুবোধ ঘোষ এবং কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ একই মানুষ, সেহেতু বিভিন্ন প্রবন্ধের পাশাপাশি তাঁর সৃষ্ট অনেক ছোটগল্পেও দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এবং দেশবাসীর

প্রতি গভীর মমত্ব প্রতিফলিত হয়েছে। জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ এই বিশেষ ধরণের গল্পগুলির মধ্যে বৈরনির্যাতন, শিবালয়, কালাগুরু, চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

বৈরনির্যাতন গল্পে দিলীপ দত্ত একজন বৈমানিক। অসমসাহসী, স্বাস্থবান দিলীপ, ইংরেজের বায়ুসেনায় এক পদস্থ অফিসারের কাজ পেয়ে উড়ে চলেছে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে, ওয়াজিরিস্থানে বিদ্রোহী পাঠানদের শায়েস্তা করতে।

বোমারু বিমান নিয়ে উড়ে চলেছে দিলীপ। মাটি ছেড়ে ওপরে উঠে তার মনে পড়ে আপনজনদের কথা, শোভার কথা, ডোনার কথা। দুজনের স্বপ্ন আদর্শ ভিন্ন হলেও, দুজনই ভালোবেসেছিল দিলীপকে। শোভা বুঝিয়েছিল, বায়ুসেনার এই কাজটি একটি চাকুরীমাত্র, এতে গর্ব করার কিছু নেই। গান্ধীজীর অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী শোভা দিলীপকে অনুরোধ করেছিল বায়ুসেনার চাকরীটি গ্রহণ না করতে। কারণ, তার মতে, মানুষকে হত্যা করে বীরত্ব প্রমাণ হয় না। অন্যদিকে ডোরা নন্দী দিলীপের বায়ুসেনার অন্তর্ভুক্তিকে যথেষ্ট গর্বের বিষয় বলেই মনে করে। সে চায় দিলীপ, কৃতকার্য হয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করুক। দিলীপ যেন ডোনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতেই বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে চলেছে শত্রু এলাকার জন-জীবনকে বোমার ঘায়ে গুড়িয়ে দিতে।

একটি লোকালয় পেরিয়ে, খাড়া পাহাড়ের মাথায় চোখে পড়ে এক জীর্ণ বৌদ্ধ স্তূপ। দিলীপের মনে পড়ে যায় ভারতের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল সাংস্কৃতিক প্রসারের কথা। আকাশ থেকে, সুন্দর মাটির পৃথিবীকে দেখে, কিছুতেই বোঝা যায় না সেখানে কত হিংসা জমা হয়ে আছে। ওয়াজিরিস্তানে ঢুকতেই দিলীপের মনে পড়ে, ঠাকুর্দার আমলের দরজী, রসিদ খলিফার কথা, যে আজও বেঁচে আছে। এই ওয়াজিরিস্তানেই রসিদের বাড়ি। ঐ বুড়ো রসিদের কাছেই দিলীপ জামার ছাঁট নিয়ে আব্দার করত, আবার তার কাছে বসেই গল্প শুনতো।

ছোটবেলায় যে ওয়াজিরিস্তান তার কাছ রূপকথার দেশ মনে হত, সেই ওয়াজিরিস্তান আজ তার পায়ের নীচে, ধ্বংশের অপেক্ষায়। আচ্ছন্ন দিলীপ ওয়াজিরিস্তানের পাঠানদের কিছুতেই শত্রু ভাবতে পরে না। দিলীপের অন্তরে জেগে ওঠে এক 'ভারতবোধ'। 'বিদ্যুতের-ঘন্টি বেজেছে, কাজের অর্ডার এসেছে, দিলীপ কিছুই জানে না। ঐ বিমানেরই দুজন সহকর্মীর চোখে তখন সংহারের আনন্দ। 'শুধু দিলীপের অন্তরাত্মা যেন ধরা-পড়া চোরের মত আসরের এক কোনে মাথা গুজে পড়ে রইল'।[১৫১]

আচ্ছন্ন দিলীপ ওয়াজিরিস্তানের পাঠানদের শত্রু ভাবতে পারে না। দিলীপের এই আচ্ছন্নতার মূল কারণ, তার এক বিশেষ 'ভারতবোধ' যা তাকে পাঠাণদের ওপর আক্রমণ করতে বিরত রেখেছে। দিলীপ উপলব্ধি করেছে যে আক্রমণ নয়, ঐতিহাসিক মননশীলতা এবং হৃদয়বত্তাই ভারতের ঐতিহ্য। দিলীপ দত্তর জীবনে, ডোরা নয় শোভারই জয় হলো।

এক বোমারু বিমানের শত্রু শহর আক্রমণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে, সুবোধ ঘোষ ভারতবর্ষের এবং ভারতবাসীর অন্তরাত্মার শাশ্বত রূপটি তুলে ধরেছেন।

বৈরনির্যাতনের দিলীপ আর শিবালয়ের অনন্তরাম দুই ভিন্ন গোত্রের মানুষ হলেও ভারত-ঐতিহ্যবোধে দুজনে অভিন্ন। গান্ধীবাদে উদ্বুদ্ধ লেখকের সৃষ্ট এই দুটি চরিত্রই অহিংসার আদর্শকে অন্তর থেকে সমর্থন করে। বায়ুসেনা দিলীপ ওয়াজিরিস্তানের পাঠানদের শত্রু ভেবে আক্রমণ করতে পারে না, অন্যদিকে অনন্তরাম তার প্রিয় রামচরিতমানসের বাণীর সঙ্গে অহিংস আন্দোলনকারীদের প্রতিজ্ঞার অদ্ভুত মিল খুঁজে পেয়ে আত্মাহুতি দেয়।

শিবালয় গল্পে অনন্তরামের পারিবারিক প্রেম প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথ বেয়ে দেশপ্রেমে উন্নীত হয়েছে।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে মানুষের সেবায় নিয়োজিত অনন্তরাম তার স্ত্রী প্রমীলাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। অনন্তরামের দূর সম্পর্কের ভাই কৈলাশ, যে মদ্যপ হিসেবেই পরিচিত ছিল, ক্রমে মদ্যাসক্তি ছেড়ে, আত্মশুদ্ধি করে, অনন্তরামের বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং ক্রমে তার স্ত্রী প্রমীলার মন জয় করে নেয়। প্রমীলা কৈলাশের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি শিবালয় স্থাপনের সংকল্প গ্রহণ করে। অনন্তরাম, যার জীবনের সব সুখ-দুঃখে তুলসীদাসের রামচরিত একমাত্র অবলম্বন, স্ত্রী প্রমীলার এই সংকল্পের কথায় অবাক হয়। কৈলাশ ও প্রমীলা শিবালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর; অন্যদিকে অনন্তরাম তার রামচরিত মানসের পাতায় অন্তর যন্ত্রনার মুক্তি খোঁজে।

হঠাৎই দেশের সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাধীনতার লক্ষ্যে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। যন্ত্রনাকাতর অনন্তরামের সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন উন্মুখ হয়ে শোনে স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা, উৎসুক হয়ে দেখে আন্দোলনের প্রস্তুতি, অসংখ্য মানুষের মিছিল। একদিকে অনন্তরামের শান্ত সংসারে এক অবৈধ প্রেমের অশান্তি অন্যদিকে ভারত-সংসারে গান্ধীজীর ডাকে অহিংস স্বাধীনতা আন্দোলনের ঝড়। শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে কাছারির দিকে। আন্দোলনকারীদের কন্ঠে গর্জে ওঠে – 'কংগ্রেস জিন্দাবাদ!' 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। 'জান হাজির হ্যায়, অগর কর দো ইসারা গান্ধী'।

অনন্তরাম তার একমাত্র অবলম্বন রামচরিতমানসের বানী – তুমি যদি ইসারামাত্র কর, তাহলেই এ প্রাণ উৎসর্গ করতে আমরা রাজি আছি। এর সঙ্গে আন্দোলনকারীদের প্রতিজ্ঞার এক অদ্ভুত মিল খুঁজে পায়। স্বাধীনতা যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দেবার লগ্নে, অনন্তরাম রামচরিত বন্ধ করে আলোর নেশায় মত্ত পতঙ্গের মতো ছুটে যায়, ইংরেজের গুলিতে আত্মাহুতি দিয়ে প্রথম শহীদ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। অনন্তরামের আত্মাহুতির বেদীমূলেই, এক নতুন উপলব্ধিতে গড়ে উঠল প্রমীলা-কৈলাশের শিবালয়।

এই গল্পে ব্যক্তিপ্রেম অন্তঃসলিলা; দেশপ্রেম এসেছে প্রকাশ্যে এবং দ্রুতগতিতে। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই অহিংস আত্মদান প্রতিপক্ষের হৃদয় জয় করে নিয়েছে। শিবালয়ে গান্ধীবাদী সুবোধ ঘোষ গান্ধীজীর অহিংস নীতিরই জয়গান করেছেন।

চতুর্থ-পাণিপথের যুদ্ধ গল্পে সুবোধ ঘোষের ভারতীয়তা ও জাতীয়তাবোধ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি গল্পটিতে পরিস্কারভাবে বলতে চেয়েছেন, দেশের আদিবাসীদের বাদ দিয়ে ভারতবর্ষ কখনো তার পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। পরাধীন ভারতে আদিবাসীদের অবজ্ঞাভরে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে, খ্রীষ্টান ধর্মযাজকরা যখন আদিবাসীদের ধর্মান্তকরণের অভিযানে মেতে উঠেছিল, তখন সাধারণ ভারতবাসী অবজ্ঞাভরে যে ভাবে আদিবাসীদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছিল, তা যেমন লজ্জার তেমই আত্মঘাতি। কারণ আদিবাসীরা পূর্বাপর ছিল ভারত সংসারের এক অকৃত্রিম এবং অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

গল্পটিতে একদিকে রয়েছে, ব্রিটিশ রাজত্বকালে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের দ্বারা ভারতের আদিবাসীদের ধর্মান্তকরণের অভিযান, অন্যদিকে অবহেলিত আদিবাসীদের করুণ পরাজয়ের কাহিনী। পাণিপথের যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে অনেক পালাবদলের কারণ। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে হিন্দু ও রাজপুতদের নিরপেক্ষতা অবলম্বনের ফলে মোঘল শক্তির কাছে মারাঠা শক্তির পরাজয় ঘটে। ছোট ছোট রাজ্যে বিক্ষিপ্ত ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার মারাঠার প্রচেষ্টা বিফল হয়। এই ঘটনার ফলেই ব্রিটিশ তার শক্তিবৃদ্ধি করে এবং ক্রমশ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কায়েম করা সম্ভব হয়। এই একই নিরপেক্ষতা, প্রকারান্তরে বিশ্বাসঘাতকতা, আদিবাসীদের খ্রীষ্টান ধর্মাযাজকদের কাছে পরাজিত করেছে। আর তাই লেখক এই গল্পটির নামকরণ করেছেন – 'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ'।

উত্তম পুরুষে বর্ণিত এই গল্পটির নায়ক, এক আদিবাসী যুবক স্টিফান হোরো। আত্মবিশ্বাসী এই

যুবক গল্পটিতে পূর্বাপর এক প্রতিবাদী চরিত্র। হকি স্টিকের অভাবে খালি পায়ে খেলা, ফাদার লিন্ডনের শত প্রচেষ্টা এবং নজরদারীকে উপেক্ষা করে আদিবাসী নেতা সোখার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, ইত্যাদি বিষয়গুলোতে তার এই প্রতিবাদী চরিত্র স্পষ্ট হয়েছে। মিসনারী স্কুলে পড়াশুনোয় স্টিফানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে যে, মেধার ক্ষেত্রেও, অবজ্ঞায় সরিয়ে রাখা আদিবাসীরা আত্মাহঙ্কারী মধ্যবিত্ত বাঙালী ছাত্রদের তুলনায় কম যায় না। ইংরাজীতে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় যখন স্টিফানের প্রতি শিক্ষকদের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছে, তখনই স্টিফান, ইংরাজী ছেড়ে, সংস্কৃতকে অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে এবং সংস্কৃতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে, মেধায় তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করে।

এই স্টিফান যখন তার আদিবাসী স্বত্ত্বা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি বজায় রাখার জন্য খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, তখন বাঙালী ছাত্ররা অনেক ক্ষেত্রে তাকে মানসিকভাবে সমর্থন করলেও, মধ্যবিত্তের স্বভাবজাত কারণে, তার সমর্থনে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে পারেনি। নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের সঙ্গে আদিবাসীদের ঐতিহ্য রক্ষার সংগ্রামকে এক পাণিপথের যুদ্ধের চরিত্রদান করেছে, যা লেখক 'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

স্টিফান আদিবাসী যুবতী চিরকি মুর্মুর প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়েছে। আদিবাসী সংস্কৃতির অমোঘ টানে, ফাদার নিন্ডনের ঘেরাটোপ থেকে বারবার পালিয়ে চিরকির সঙ্গে মিলিত হয়েছে, মাদল বাজিয়ে নেচেছে, আদিবাসী নেতা সোখার সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়েছে। বাঙালী সহপাঠিরা, স্টিফানের পক্ষে বিপক্ষে শুধুই সমালোচনা করেছে এবং তার কর্মকান্ডতে তাড়িয়ে তাড়িয়ে উত্তেজনা উপভোগ করেছে।

গল্পের শেষাংশে আমরা দেখি, – ফাদার লিন্ডন বৃদ্ধ সোখাকে যাবজ্জীবন দীপান্তরে পাঠালেন, স্টিফানের প্রণয়ী চিরকিকে করলেন ধর্মান্তরীতা। স্টিফান আত্মসমর্পন করেনি। সে ইংরেজ শাসকের বিচারে জেলখানায় বন্দী, যক্ষায় আক্রান্ত। নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান স্টিফান হোরো পরিচিত হয় রুনু হোরো হিসেবে। রুনু হোরো এখন একজন বিরসাইট। সে বলে – 'আমি বিরসা ভগবানের শিষ্য'। সহপাঠি, দারোগা লেখক যখন জানতে চান – কে সে বিরসা ভগবান, হোরা জানায় --

> সে আমাদের গান্ধী ছিল ঘোষ। আমি তাঁকে চোখে দেখিনি, আমার বাবার মুখে তাঁর কথা শুনেছি। ইংরাজের জেলখানার অন্ধকারে একজন কয়েদীর মতো মরে গিয়েছে আমাদের বিরসা ভগবান।[১৫২]

লেখকের আত্মগ্লানিতেই গল্পটি শেষ হয়েছে। দারোগার চেয়ারে বসে শিক্ষিত, পদস্থ মধ্যবিত্ত বাঙালী অনুশোচনা করে ভাবে —

> কাউকে মুখ ফুটে বলতে লজ্জা করবে, একটা ভুলের স্মৃতি কিছুক্ষণের জন্য কাটার মতো মনের মধ্যে বিঁধছিল। হয়ত আমরাই একেবারে নিরপেক্ষ থেকে চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধে স্টিফানকে হারিয়ে দিয়েছি। আর স্টিফানও সেই পরাজয়ের দুঃখে বনবাসে চলে গেল।[১৫৩]

গল্পটিতে আদিবাসীদের প্রতি লেখকের মমত্ব, পরাধীন ভারতে আদিবাসীদের প্রতি ইংরেজ শাসকের অত্যাচার এবং নিজ ধর্ম, কৃষ্টি, সংস্কৃতির প্রতি আদিবাসীদের গভীর শ্রদ্ধা এবং আপোসহীন সংগ্রাম পাঠককে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে যে, আদিবাসীদের বাদ দিয়ে ভারতবর্ষ কখনই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। এখানেই সুবোধ ঘোষের ভারতীয়তা, এখানেই তাঁর জাতীয়তাবোধ।

সুবোধ ঘোষের অনেক গল্পেই তাঁর সমাজ সচেতনতার নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। তবে কয়েকটি গল্পে তাঁর এই সমাজ সচেতনতা অত্যন্ত প্রখর। এ ধরণের গল্পগুলোর মধ্যে 'পরশুরামের কুঠার' এবং

তমসাবৃতা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তরে বিধ্বস্ত চল্লিশের দশক যেমন এক সমাজিক সংকটে উচ্চকিত, তেমনই নতুন অর্থনৈতিক বিন্যাসে জনজীবন বিভ্রান্ত। এই সংকটময় আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত হয়েছে সুবোধ ঘোষের বহুপঠিত ছোটগল্প — পরশুরামের কুঠার।

গল্পটির মূল চরিত্র ধনিয়া। প্রকৃতপক্ষে এ ধরণের নারী চরিত্রের উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন। ধনিয়া অন্তত ছয়টি শিশুর জন্ম দিয়েছে এবং প্রত্যেককেই তুলে দিয়েছে অনাথ আশ্রমে। ধনিয়া বারবার মা হয়েছে, কিন্তু সন্তানের প্রতি তার কোন মমত্বের বাঁধন নেই। ধনিয়া এতই বহুভোগ্যা যে, সে নিজেও তার সন্তানদের পিতার নাম জানে না। অবৈধ মাতৃত্বের জন্য স্বামীহীনা ধনিয়ার কোন লজ্জা নেই, অনুশোচনা নেই। দু-তিন বছর পর পরই প্রায় নিয়মিতভাবে ধনিয়া সন্তান প্রসব করে 'জেনানা হাসপাতালে'। ধনিয়ার এ কীর্তি-কাহিনী ক্রমবর্ধমান নয়াবাদের শহুরে মানুষদের অজানা নয়। কিন্তু তাদের অনেকের বাড়িতেই তার ডাক পড়েছে, অবশ্যই অনোন্যপায় মধ্যবিত্তের স্বার্থরক্ষার কারণে। শহরের অনেক বাড়িতেই মায়েদের রোগ এবং অপুষ্টির জন্য ধনিয়াকে এক বিচিত্র কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। ধনিয়া ঐ সব অসমর্থ মায়েদের শিশুসন্তানকে দু'বেলা নিয়মিত স্তন্যপান করায়, অতি সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। এদিকে বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন শুরু হয়েছে। অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের অগ্রগতিতে বাজারে এসে পৌঁছেছে গুড়ো দুধ। এই গুড়ো দুধের কল্যাণে, ভদ্র, সভ্য সংসারে ধনিয়ার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। নিজেদের সংসারে ধনিয়ার আর আবশ্যকতা না থাকায়, নয়াবাদ শহরের কর্তাব্যক্তিরা ধনিয়াকে বাধ্য করে পতিতাপল্লীতে গিয়ে থাকতে। এই কর্তাব্যক্তিদের বেশ ক'জন সন্তানই যে ধনিয়ার স্তন্যপানে, পুষ্ট ও বর্ধিত, সে কথা মনে রাখার প্রয়োজন বোধ করে নি তারা। পরশুরামের মতই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ হত্যা করেছে ধনিয়ার মাতৃত্বকে।

সভ্য সমাজ ছেড়ে পতিতাপল্লীতে উঠে যাওয়ার আগে ধনিয়া শেষবারের মত দেখা করে তার একান্ত আশ্রিত, আশি বছরের অথর্ব বৃদ্ধ প্রসাদী ডোমের সঙ্গে। শত অভাবেও ধনিয়া প্রসাদীকে নিয়মিতভাবে এক থালা ভাত যোগান দিত। কিন্তু সেদিন কপর্দকহীন ধনিয়া কোমর-ভাঙা প্রসাদীকে কোন খাবার দিতে পারেনি। ক্ষুধার্ত প্রসাদীকে ধনিয়া তার স্তন্যপানে তৃপ্ত করায়।

পতিতাপল্লীতে গিয়ে ধনিয়া তার চল্লিশোর্ধ দেহটাকে যথাসাধ্য কামোদ্দীপক করে জানালায় গিয়ে গ্রাহকের সন্ধানে দাঁড়ায়। ধনিয়া দেখে নিষিদ্ধ ঐ এলাকার যে নব্য যুবকেরা নারীদেহ লোভে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের মধ্যে রয়েছে তারই স্তন্যপানে বর্ধিত ঘোষালবাবুর ছেলে, খাজাঞ্চীবাবুর ছেলে। যেন সভ্য সমাজকে এক চরম শিক্ষা দেবার তাড়নায়, এক 'বিদঘুটে আনন্দের জ্বালায়' ধনিয়া আরো অসম্বৃত বেশে তারই মাতৃদুগ্ধে পালিত সন্তানদের কাম প্রবৃত্তিকে উসকে দিয়ে আমন্ত্রণ জানায় তার ঘরে।

গল্পটিতে একটি বিষয় স্পষ্ট যে ধনিয়ার যৌন-জীবনে, শুদ্ধাচার, বা শৃঙ্খলা বলে কিছু ছিল না। কিন্তু তবু সে কোনভাবেই নিজেকে পেশাদার যৌনকর্মী হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়নি। টাউন পুলিশকে ঘুষ দিয়েও পতিতাদের তালিকায় নিজের নাম লেখানোটা ঠেকাতে চেয়েছে ধনিয়া। তার আশ্রিত প্রসাদী চাচাকে ধনিয়া কেঁদে বলেছে —

— হ্যাঁ চাচা। আমার জাত নেই, আমি নাকি রাণ্ডী!

— ছি ছি, এ কি বলছিস।

— হ্যাঁ চাচা আমাকেও নাম লেখাতে হয়েছে। কাল থেকে বাজারে থাকতে হবে।

— আরে না, তুই তো লছমী

– না চাচা, আমার স্বামী নেই।
– কোন গাইয়ের স্বামী নেই, তারা কি লছমী নয় ?
– তা বললে চলে না, আমি তো গাই নই।[১৫৪]

এই কথপোকথনে ধনিয়া নিজেকে একজন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। কিন্তু তার কর্তব্যহীন, মমত্বহীন মাতৃত্বের অভিশাপ তাকে, নিজ সন্তানের উপভোগ্যা করে তুলেছে। প্রকৃতপক্ষে এই সন্তানেরা মাতৃসমা ধনিয়াকে উপভোগ করে, পরশুরামের মতই মাতৃহত্যা করেছে।

গল্পটির রসোত্তীর্ণতা ও সাফল্য নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। সাধারণভাবে অনেকেই গল্পটির সপ্রশংস আলোচনা করেছেন এবং সমাজিক অবক্ষয়ের রূপটি প্রত্যক্ষ করে সচকিত হয়েছেন। সাহিত্য সমালোচক অশোক রায় লেখকের বক্তব্য উপলব্ধি করে বলেছেন —

> আর একবার ভাবালো – মনুষ্যত্ব অর্থের কাছে, লোভের কাছে, নিজেকে বারনারীর মত করে তুলেছে। এই হলো শিক্ষা ! এই হলো সভ্যতা ! এই হলো যুদ্ধের অবদানে পৃথিবী জুড়ে মূকবধির হাহাকার।[১৫৫]

জগদীশ ভট্টাচার্য সভ্য সমাজের অসামাজিক আচরণের অভিযোগটি অনুধাবণ করে বলেছেন – 'সমাজবদ্ধ মানুষের হাতে মানুষের এই পশুর চেয়েও অধিক অসম্মান যতটা শোচনীয় ততটাই অমানুষিক !'[১৫৬] বিভিন্ন সমালোচকদের এ ধরণের সপ্রসংশ অভিমতের পরেও আমার মনে হয়েছে গল্পটির বেশ কিছু ঘটনা যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে নি। প্রথমত পর পর ছয়টি সন্তানকে জন্মের ক'দিন পরেই আশ্রমের হাতে তুলে দিয়ে, সেই সন্তানদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকার এমন নির্মম উদাহরণ সচরাচর চোখে পড়ে না। তাই ঘটনাটি অস্বাভাবিক মনে হয়। দ্বিতীয়ত – নিজ সন্তানদের অনাথ আশ্রমে তুলে দিয়ে, মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরে, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্যের শিশুদের নিয়মিত স্তন্যপান করানোটা পেশা হিসেবে দেখার অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই নেই। ঘটনাটি অস্বাভাবিক মনে হয়। তৃতীয়ত – অভাবের জন্য ভাত দিতে না পারায়, চাচা প্রসাদীকে স্তন্যপান করানোটা, বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। ধনিয়া যদি অন্যকে দেহদান করে সেই উপার্জিত অর্থে প্রসাদীর অন্নসংস্থান কোরত, তবে তা বিশ্বাস করতে অসুবিধা হতো না, বরং স্বাভাবিক মনে হত এবং তাতে গল্পের ও লেখকের মূল বক্তব্যের কোন ক্ষতিসাধন হতো না বরং ধনিয়ার মনুষ্যত্ব সন্ধানের একটি সুযোগ থাকত।

গল্পটি পাঠ করে আরো মনে হয়েছে যে সুবোধ ঘোষ যেন বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে সমাজের আর্থ সামাজিক ভাঙা-গড়া নিয়ে এক কঠোর সমালোচনা করার সিদ্ধান্ত মনে রেখেই গল্পটি লিখেছিলেন। তাঁর বক্তব্য অটুট রাখার প্রয়াসে এমন কিছু প্রায়-অসম্ভব ঘটনার অবতারণা করেছেণ, যার ফলে তাঁর বক্তব্য এবং গল্পের ঘটনাক্রম একে অন্যের পরিপুরক হয়ে উঠতে পারেনি। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তনে সমাজে পরশুরামদের আত্মপ্রকাশে লেখক যতটা চিন্তিত, গল্পের মূল চরিত্র ধনিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে ততটাই নির্লিপ্ত। ফলে লেখকের বক্তব্য মাথায় ঢুকলেও, হৃদয়ের গভীরে ততটা ছায়াপাত করতে পারে নি। এ বিষয়ে, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটুকু উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি বলেছেন —

> ধনিয়ার জীবনসমস্যা যোগসূত্রহীন তথ্যের বাহুল্যে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাহার শেষ জীবনের অস্বাভাবিক পরিণতির দিকে এই নি:সম্পর্ক ঘটনাগুলি একযোগে অঙ্গুলি সংকেত করে নাই। মাতৃত্বের কর্তব্যের প্রতি অবহেলা করিয়া সে যে সম্ভাব্য সন্তানেরই কামোপভোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একদল মাতৃহন্তা পরশুরামেরই সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা তাহার জীবনের চরম ট্রাজেডি

নয়, একটা গৌণ অসুবিধা মাত্র। সে যেমন সন্তান-পরিত্যাগেও উদাসীন, তেমনি সন্তানের লোলুপ বাহুবিস্তারেও অবিচল রহিয়াছে। এই ঘৃণিত সম্ভাবনার ন্যক্কারজনক শিহরণ ধনিয়ার মন হইতে পাঠকের মনে সংক্রামিত হয় নাই। লেখক যেন গল্পের একেবারে উপসংহারে খিড়কির দরজা দিয়া ইহাকে প্রবেশ করাইয়াছেন।[১৫৭]

এই একই আর্থ-সামাজিক সমস্যা নিয়ে লেখা তমসাবৃতা গল্পে সম্পদের অসম বন্টন যে কিভাবে মানুষকে বিপর্যস্ত করে সভ্যতার আলো থেকে আদিম অন্ধকারে ঠেলে দেয়, তার করুণ বিবরণ রয়েছে। এই গল্পে লেখক দেখিয়েছেন সংকট মুহূর্তে মানুষের মধ্যে উঁচু-নীচুর ভেদাভেদ কিভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

গ্রামের নাম ধুলাগড়া। বাউরি চাষী ও বোষ্টম তাঁতিদের বাস। হতদরিদ্র উভয়েই। তাঁতিরা চাষীদের তুলনায় নিজেদের অভিজাত মনে করে। নেংটি সর্বস্ব চাষীদের কাছে আভিজাত্য বজায় রাখতে তাঁতিরা কাঁধে রঙিন গামছা রাখে। আর্থিক অনটন গ্রাস করে গ্রামটিকে। এরই মধ্যে গ্রামে দেখা দেয় তীব্র বস্ত্র সংকট। কোনমতে পেটে খাবার পড়লেও, গায়ে কাপড় জোটে না। পুরুষেরা কানি পড়ে মাঠে কাজ করলেও, মেয়েদের লজ্জা ঢাকার উপায় নেই। গল্পটিতে পরিণতিহীন একটি প্রেমের কাহিনীও রয়েছে। এক বাউরি চাষীর বিধবা মেয়ে জবা ও সদ্য চৌকিদারের চাকরী পাওয়া, তাঁতির ছেলে মোহনবাঁশি পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত। বেশভুষার বিচারে গ্রামের অন্যদের তুলনায়, জবা ও মোহন অভিজাত এবং তাদের রুচিও অনেক মার্জিত। প্রকৃতপক্ষে, এই কারণেই তারা একে অন্যকে ভালবেসেছে। চাকুরী পেয়ে মোহনের যেন গোত্রান্তর ঘটেছে। গ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখের অভাব-অভিযোগের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। যা কিছু সম্পর্ক তা জবার সঙ্গে। ফলে, আশাহত হয় গ্রামের উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ।

জবা ক্ষেতে কাজ করতে যায় না। প্রায় উলঙ্গ, শুধুমাত্র একফালি কাপড় ঝোলানো পুরুষদের সঙ্গে মাঠে কাজ করতে তার সম্ভ্রমে বাধে। নিজের একমাত্র পরিধেয় কাপড়টির অবস্থাও সঙ্গীন। কেঁচে-ধুয়ে পরিস্কার করলেও কাপড়টি ফেঁসে যায়, ছিঁড়ে যায়, মাঝে মাঝে শুকনো পাতার মত জায়গায় জায়গায় খসেও পড়ে। ঘর ছেড়ে আর বাইরে বেরোতে পারে না সে। এদিকে, জবা আর মোহনের প্রেমকে কেন্দ্র করে চাষী ও তাঁতিরা একে অন্যের বিরুদ্ধে চাপা বিক্ষোভে ফুঁসতে থাকে। ঘরবন্দী জবা রাতের অন্ধকারে কানি পড়ে থাকতে বাধ্য হয়। মোহন চুপি চুপি এসে জবার এ চেহারা দেখে আঁতকে ওঠে। জবার অনুমতি আদায় করে, পরদিনই তার জন্য শাড়ি আনবে বলে বিদায় নেয় মোহন।

এরই মধ্যে জবা দেখতে পায়, গ্রামের মেয়ে-বৌরা গায়ে শুধুমাত্র অন্ধকারের পোষাক জড়িয়ে এগিয়ে চলেছে মাঠে রোপাই এর কাজে। যেন মুক্তির পথ খুঁজে পেয়ে, জবাও বিবস্ত্র হয়ে যোগ দেয় সেই মিছিলে। এদিকে মোহন তার কথামত শাড়ি নিয়ে এসে কোথাও জবাকে না পেয়ে, রাতের শেষ প্রহরে এক গাছতলায় এসে বসে। অবাক হয়ে দেখে মেয়েরা নিরাবরণ দেহে গ্রামে ফিরে আসছে রোপাই এর কাজ শেষ করে। ভোরের আলো ফোটার আগেই পৌঁছোতে হবে নিজ নিজ ঘরে।

> ওরা আসছিল — বিবসনা মৃত্তিকাবধূর দল। টুকরো টুকরো কানি চট কাঁথা — মধ্যদিনের যত রুচি-পরমাদ, আজ রাত্রের মত পরম অবহেলায় ওরা ঘরেই ফেলে রেখে এসেছে, ওদের লজ্জা ঘিরে রেখেছে লক্ষ কালোসূতোর জালে তৈরী এই নিঃসীম অন্ধকারের পরিচ্ছদ।[১৫৮]

অন্ধকারের পরিচ্ছদ পরিহিতা নারীদেহের এই মিছিল সমস্ত রিক্ততার ঊর্ধে উঠে এক অদ্ভুত

ছন্দে এগিয়ে চলেছে। – 'ওদের বেণী-ভাঙা রুক্ষ চুলের ভার পিঠের ওপর ঘষা খেয়ে শব্দ করছে। নিরাবণ দেহের প্রতিটি পেশী মাংসের নুপুরের মত অদ্ভুত শব্দ করে বেজে চলে যাচ্ছে'।[১৫৯]

গল্পটি ভারতের শ্রমজীবী মানুষের অদ্ভুত সহনশীলতার এক দৃষ্টান্ত। শত দু:খ, কষ্ট মেনে নিয়ে তারা নিজ কর্তব্য পালন করে এগিয়ে চলে এক আশ্চর্য জীবনীশক্তিতে। গ্রামবাসীরা বিদ্রোহ করে নি। দু:সহ দুর্দশাকে জীবনের অঙ্গ বলে মেনে নিয়েই এগিয়ে গেছে জীবনের পথ ধরে। সমাজের কাছ থেকে সম্ভ্রমটুকু বাঁচানোর জন্য এক টুকরো কাপড় না পেয়েও চাষী মেয়ে বৌরা রোপাই-এর কাজ বন্ধ করেনি। এই প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় বলেছেন —

> ইহারা বিদ্রোহ করে নাই, বিদ্রোহ ইহাদের ধাতে নাই – বোধহয় যেন, বসুমতীর অঞ্চলতলেই ইহারা শেষ আশ্রয়ের জন্য প্রতীক্ষমাণা। রিক্ততার এমন করুণ ও গ্লানিকর চিত্র বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে বিরল।[১৬০]

প্রসঙ্গক্রমে, সুবোধ ঘোষের এই 'তমসাবৃতা' গল্পটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দু:শাসনীয়'র সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। দুটি গল্পের একই প্রেক্ষাপট, একটিই সমস্যা। তমসাবৃতায় গ্রামের মেয়ে-বৌরা কাপড়ের অভাবে – 'বিবসনা মৃত্তিকাবধূর দল'; দু:শাসনীয়তে —

> সারাটা দিন, সূর্যের আলো যতক্ষন উলঙ্গিনী করে রাখে, ছায়াগুলি বাড়ীর ভিতরে বা ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। কোন কোন ছায়া থাকে একেবারে অন্ধকার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে, বাপ ভাই স্বামী শ্বশুরের সামনে বার হতে পারে না – স্ত্রীলোক-সুলভ লজ্জায়। কোন বাড়ীতে কয়েকটি ছায়া থাকে একসঙ্গে, মা, মাসী, খুড়ী, পিসী, মেয়ে, বোন, শাশুড়ি, বৌ ইত্যাদি বিভিন্ন সম্পর্ক সে ছায়াগুলির মধ্যে – এক একজন তারা পালা করে বাইরে বেরোয় কারণ, বাইরে বেরোবার মতো আবরণ একখানিই তাদের আছে।[১৬১]

তমসাবৃতার গ্রাম ধুলাগড়া এবং দু:শাসনীয়র গ্রাম হাতিপুরের একই চেহারা। দুটি গ্রামেই মেয়েদের লজ্জা নিবারণের কাপড় নেই। দুটি গ্রামই ভোগে সভ্যতার সংকটে। গল্প দুটির পরিপ্রেক্ষিত এবং বিষয়বস্তু এক হলেও এই দুই সমসাময়িক গল্পকারের আদর্শ-ভাবনার বৈসম্য লক্ষ করার মত।

তমসাবৃতায় গ্রামের মানুষ দু:সহ কষ্ট সহ্য করেছে, কিন্তু বিদ্রোহ করেনি। দু:শাসনীয়তে মানুষ বিদ্রোহ করেছে। আব্দুল আজিজ, সুরেন ঘোষ, বঙ্কু এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা মারপিট ও দাঙ্গাহাঙ্গামার জেরে হাজতবাস করেছে। গল্পটিতে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ধনী দরিদ্রের বৈসম্যও ফুটিয়ে তুলেছেন। — 'ঝিলের ধারে বাঁধানো সড়কে নানারঙা শাড়ী পরা মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বাবুরা কজন হাওয়া খাচ্ছেন'।

তমসাবৃতায় কেন্দ্রীয় চরিত্র, এক বিধবা যুবতী জবা। দু:শাসনীয়তে অন্যতম প্রধান চরিত্র আনোয়ারের যুবতী স্ত্রী, রাবেয়া। জবার একার পক্ষে যা ছিল লজ্জার, বিবসনাদের মিছিলে নিজেকে মিশিয়ে নিয়ে, তাই হয়ে উঠেছে স্বাভাবিক।

> ঝুমকোর বেড়ার ধার দিয়ে যেন অনেকগুলি ছায়ামূর্তি দল বেঁধে যাচ্ছে। পায়ের শব্দে চমকে উঠলো জবা। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর জবার ভীত বিস্মিত ও অলস চোখের ঝাপসা দৃষ্টি ক্রমে স্বচ্ছ হয়ে এল। মুক্তির পথ পাওয়া গেছে, খোলা পড়ে রয়েছে। সবাই সে পথে চলেছে। রাত্রিচর পাখির মত উল্লাসে যেন ডানা ঝাপটে ঝুমকোর বেড়াটা ডিঙিয়ে গিয়ে জবা তাদের সঙ্গে মিশে গেল।[১৬২]

রাবেয়া কিন্তু জীবনের এই গ্লানি সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে —

কাপড় যে দিতে পারে না এমন মরদের পাশে আর শোবে না বলে রাবেয়া একটা বস্তায় কতকগুলি ইঁট পাথর ভরে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে গলার বস্তার মুখটা দড়ি জড়িয়ে এঁটে বেঁধে পুকুরের জলের নীচে, পাঁকে গিয়ে শুয়ে রইল।[১৬৩]

সুবোধ ঘোষ জীবনের কঠিনতম সংকটের মুহূর্তেও মানুষকে জীবনের পথে হাঁটিয়েছেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্লানিকর জীবনের বোঝা বয়ে বেড়ানোর পরিবর্তে আত্মহত্যাকেই শ্রেয় জ্ঞান করেছেন। জবা এবং রাবেয়ার জীবনে সংকট এসেছে একই ভাবে। একজন সমস্যাকে অবজ্ঞা করে এগিয়ে গিয়েছে, অন্যজন আত্মহত্যা করেছে। নারী জীবনের সম্ভ্রম রক্ষার তাগিদে কোন পদ্ধতিটি সঠিক, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে, সন্দেহ নেই। কিন্তু একই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হবে, যে দু'জনের গল্পে নির্মোহ বাস্তবতা থাকলেও, সুবোধ ঘোষের বাস্তবতা জীবন সম্পর্কে এক নতুনতর শিল্পচেতনায় উন্নীত। রাবেয়ার আত্মহত্যা এক বিশ্বাসযোগ্য বাস্তব ঘটনা, কিন্তু জবার বিবসনাদের মিছিলে অংশগ্রহণ, শিল্পীর তুলিতে আঁকা এক নতুন জীবনবোধ।

সুবোধ ঘোষ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবাদর্শ এবং রচনাশৈলীর পার্থক্য সম্পর্কে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে —

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে আছে মার্কসীয় বিশ্বাস-প্রণোদিত জীবনজিজ্ঞাসা ও চিত্র। আছে কূটৈষণা, অর্ন্তগূঢ় জটিলতা ও মনোগহনের আঁধারের গল্প যা মার্কসীয় জীবনাদর্শ থেকে দূরবর্তী। সুবোধ ঘোষের গল্পে আছে বাস্তবতার এক নোতুন চেহারা যা পূর্বেকার সব বাস্তব আলেখ্যকে নিস্প্রভ করে দেয়। ...মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়ে লেখক হিসাবে খাঁটি হয়ে উঠতে পেরেছেন বা তার প্রয়াস করেছেন বলে বিশ্বাস প্রকাশ করেন; আর সুবোধ ঘোষ গান্ধীবাদে আস্থা স্থাপন করে ভারতের সনাতন শাশ্বত রূপ আবিষ্কারে প্রয়াসী হয়েছেন। ...বিজ্ঞান-বুদ্ধি, সত্য-এষণা, বস্তু-জিজ্ঞাসা তাঁদেরকে গোড়া থেকেই ভাবাতুরতার হাত থেকে রক্ষা করেছে; দুজনেই মার্কস ও ফ্রয়েড পড়েছেন। তবে শেষ পর্যন্ত মানিক ও সুবোধ ঘোষের জীবন-জিজ্ঞাসা ও তার উত্তর-সন্ধান ভিন্ন পথ নিয়েছে।[১৬৪]

সাত

ভারত প্রেমকথা

'ভারত প্রেমকথা' সুবোধ ঘোষ রচিত মহাভারতের কুড়িটি প্রণয় আলেখ্যের এক কালজয়ী সংকলন। দেশ পত্রিকায় যখন একটির পর একটি আলেখ্য প্রকাশ হতে শুরু করে তখন থেকেই পাঠক সমাজে এর আকর্ষণ অনুভূত হতে থাকে। ১৯৫৫ সালে এই কুড়িটি প্রণয় কাহিনীর সংকলন 'ভারত প্রেমকথা' নামে প্রকাশিত হয়। 'ভারত প্রেমকথা' প্রসঙ্গে আলোচনার প্রাক্কালে এই রচনা সম্পর্কে লেখকের নিজের বক্তব্য সম্মুখে রাখাটা একান্ত আবশ্যক বলে মনে করি। এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুবোধ ঘোষ 'নতুন করে পাব বলে' শীর্ষক মুখবন্ধে বলেছেন —

> আদিযুগ আর নবতম যুগ, রূপের দিক দিয়ে এই দুয়ের মধ্যে ভিন্নতা আছে, কিন্তু এই ভিন্নতা নিশ্চই বিচ্ছেদ নয়। নবতমের মধ্যে হোক, আর পুরাতনের মধ্যে হোক, শিল্পীর মন সেই এক চিরন্তনেরই রূপের পরিচয় অন্বেষণ করে থাকে। শিল্পীর সাধনা হলো নতুন করে পাওয়ার সাধনা। শুধু পথ চাওয়াতেই আর চলাতেই শিল্পীর আনন্দ নয়, নতুন করে পাওয়ার আনন্দও শিল্পীর আনন্দ। আদিযুগের রূপকে এই জগতে আর একবার পাওয়া যাবে না ঠিকই, কিন্তু আদিযুগের রূপকে নতুন করে কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা শিল্পী ছাড়তে পারেন না। কারণ, সেই পুরাতন রূপের সঙ্গে একটি অখন্ড আত্মীয়তার ডোরে বাঁধা রয়েছে নবতম যুগের মানুষেরও জীবনের রূপ।
>
> জীবনের রূপ সম্বন্ধে এই অখন্ডতার বোধ হলো কবি, শিল্পী ও সাধকের মহানুভূতি এবং এই মহানুভূতিই মানুষজাতির শিল্পে ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেখানে সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট ও সুন্দর আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে, সেখানেই আমরা পেয়েছি ক্লাসিক গৌরবে মন্ডিত সাহিত্য ও শিল্প। ক্লাসিকের রূপ ও ভাব খন্ডকালের মধ্যে সীমিত নয়। কালোত্তর প্রেরণার শক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে আছে কবি বাল্মীকির রামায়ণ এবং ব্যাসদেবের মহাভারত। বিশেষ কোন জাতির জীবনের রীতিনীতি ও ঘটনা অথবা বিশেষ কোন যুগের ইতিহাসের উত্থান-পতনের ঘটনাকে আশ্রয় করে রচিত হলেও বিশ্বের ক্লাসিক সাহিত্যকীর্তিগুলির মধ্যে মানবজীবনের চিরকালীন আনন্দ হর্ষ ও বেদনার ব্যাকুলতা বাঙ্ময় হয়ে রয়েছে। ভোরের সূর্যের মত এই মহাপ্রাণময় কাব্য ও শিল্পরীতিগুলি মানুষের মনের আকাশে নিত্য নতুন আলোকের প্রসন্নতা ছড়ায়। তাই প্রতি জাতির সাহিত্যে দেখা যায় যে, নতুন কবি ও শিল্পীরা জাতির অতীতের রচিত মহাকাব্য গাথা সঙ্গীত ও শিল্পরীতি থেকে প্রেরণা আহরণ করেছে।[১৬৫]

ভারত প্রেমকথায় পরিচিত পৌরাণিক চরিত্রগুলোর পাশাপাশি বেশ কিছু অপেক্ষাকৃত অপরিচিত চরিত্রও প্রেমোপাখ্যানের জন্য নির্বাচন করেছেন লেখক। মুখবন্ধের শেষাংশে লেখক বলেছেন —

> মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানগুলির বৈচিত্র আরও বিস্ময়কার। উপাখ্যানগুলি যেন প্রণয়তত্ত্বেরই মনোবিশ্লেষণ। সাবিত্রী-সত্যবান, নল-দময়ন্তি, দুস্মন্ত-শকুন্তলা ইত্যাদি লোকসমাজের অতি পরিচিত উপাখ্যানগুলি ছাড়াও এমন আরও বহু উপাখ্যান মহাভারতে আছে, যেগুলি লোকসমাজে তেমন কোন প্রচার লাভ করে নি। এই সব অল্প পরিচিত উপাখ্যানও প্রেমের রহস্য-বৈচিত্র্য ও মহত্বের এক একটি বিশেষ রূপের পরিচয়। ভারত প্রেমকথার

> বিশটি গল্প এই রকমই বিশটি মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানের পুনর্গঠিত অথবা নবনির্মিত রূপ। উপাখ্যানের মূল বক্তব্য অক্ষুন্ন রেখে এবং মূল বক্তব্যকে স্পষ্টতর অভিব্যক্তি দান করার জন্যই মাঝে মাঝে নতুন ঘটনা কল্পিত হয়েছে।[১৬৬]

ভারত প্রেমকথায় মহাভারতের কাহিনী থেকে যে কুড়ি জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা এবং দম্পতিকে লেখক বেছে নিয়েছেন, তদের মধ্যে অধিকাংশই বহু-চর্চিত নয়। মহাভারতীয় এই কুড়ি জোড়া নারী—পুরুষ পরীক্ষিত-সুশোভনা, সুমুখ ও গুণকেশী, অগস্ত ও লোপামুদ্রা, অতিরথ ও পিঙ্গলা, মন্দপাল ও লপিতা, উতথ্য ও চান্দ্রেয়ী, সংবরণ ও তপতী, ভাস্কর ও পৃথা, অগ্নি ও স্বাহা, বসুরাজ ও গিরিকা, গালব ও মাধবী, রুরু ও প্রমদ্বরা, অনল ও ভাস্বতী, ভৃগু ও পুলোমা, চ্যবন ও সুকন্যা, জগৎকারু ও অস্তিকা, জনক ও সুলভা, দেবশর্মা ও রুচি, অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা এবং ইন্দ্র ও শ্রুবাবতী।

ভারত প্রেমকথার প্রথম কাহিনী পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা। সুশোভনা লজ্জা-ঘৃণা-ভয় মুক্ত এক অতি আধুনিকা যুবতী। কয়েক হাজার বছর আগে, মহাভারতীয় যুগে, সুশোভনা পুরুষকে কেবলমাত্র ভোগ্যপণ্য হিসেবেই জ্ঞান করেছে। কিন্তু এই সুশোভনাই পরীক্ষিতের একনিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ প্রেমের কাছে অবশেষে আত্মসমর্পণ করেছে। আন্তরিক প্রেমের একনিষ্ঠতা যে সমস্ত বাধা ও অনাচারকে, অসম্ভব দৃঢ়তায়, বশীভূত করতে পারে পরীক্ষিৎ চরিত্র তার প্রমাণ।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে এই কাহিনীটির সঙ্গে সুবোধ ঘোষের বহুপঠিত গল্প 'ঠগিনী'র এক অদ্ভুত মিল রয়েছে। অল্প বয়সের এক পাঠক চিঠি লিখে লেখককে প্রশ্ন করেছিল – 'আপনার ঠগিনী আর পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা কিন্তু একই গল্প, দু-রকম করে লিখেছেন, তাই না ?' 'সেদিনের আলোছায়া-য় লেখক এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, –'শুনে চমকে উঠেছিলাম, কারণ আমি লেখক হয়েও কোনদিন ভেবে দেখিনি কিংবা বুঝতেই পারিনি যে, ওই দুই গল্প জীবনের একই অনুভব ও হৃদয়বৃত্তির দুই ভিন্ন সাজের দুই রূপ।'[১৬৭]

সুমুখ ও গুনকেশী উপাখ্যানে, গুনকেশী ভালবেসেছে সুমুখকে। সুমুখের প্রাণসংশয় কালে গুনকেশীর প্রেম আত্মশক্তিতে ভরপুর হয়ে উঠেছে। তার প্রেমের শক্তি যেন সংকটাপন্ন সুমুখের চারপাশে এক দুর্ভেদ্য নিরাপত্তা বলয়ের সৃষ্টি করেছে। গুনকেশীর শক্তি তার 'দুই চক্ষুর দুই অতিনশ্বর অশ্রুবিন্দু'।

সংবরণ ও তপতী মহাভারতীয় চরিত্র হলেও সুবোধ ঘোষ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁর আধুনিক মানসিকতায় একটি বিবাহিত দম্পতির সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ভগবান আদিত্যের আত্মজা তপতী এবং তার স্বামী সংবরণ উভয়েই সমদর্শিতার আদর্শে বিশ্বাসী। সংবরণ তপতীকে আরো বেশি করে ভালবাসতে গিয়ে, প্রজা, রাজ্যপাট ভুলে একেবারেই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল। মোহান্ধ সংবরণকে কর্তব্য সচেতন করতে তপতী স্বামীর ভুলগুলো তার চোখের সম্মুখে তুলে ধরেছে, সচেতনভাবে স্বামীকে আঘাত দিয়েছে স্বামীরই মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায়। ধীরে ধীরে অনেক আঘাতে, অনেক দুঃখ বরণে সংবরণের মোহভঙ্গ হয়েছে, আর তখনই সংবরণ-তপতী তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে সমদর্শিতার যথার্থ মূল্য বুঝতে পেরেছে।

নারীর স্ত্রী ও লোকমাতার দ্বৈতরূপটি সেকালেও ছিল, একালেও আছে। তবে এ দ্বৈতরূপটি একালের মত সেকালে এত ব্যাপক ছিল না। মূল কাহিনীটিতে একটি উপভোগ্য প্রণয় উপাখ্যান রচনার জন্য বিবিধ বিষয়ের সম্ভাবনা অবশ্যই ছিল। কিন্তু সুবোধ ঘোষ পুরুষের 'লোকপালক' ও নারীর 'লোকমাতার' অত্যাধুনিক ধারণাকেই উপাখ্যানটির মূল বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পারস্পরিক ভালবাসা এবং দেহজ কামনাই যে বিবাহিত জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়, সমাজের কল্যাণে, অন্য মানুষের উন্নতিতে,

সমাজের শ্রী বৃদ্ধিতেও যে এক বিবাহিত দম্পতির বিশেষ ভূমিকা থাকে এবং থাকা উচিত, লেখক এই সত্যটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন উপাখ্যানটিতে।

মন্দপাল ও লপিতা কাহিনীটিতে কল্যাণী নারীর প্রকৃত সৌন্দর্য তার মাতৃমূর্তিতেই সার্থকতা লাভ করেছে। লপিতা তার আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ করাকে এবং অন্তহীন কামনার তৃপ্তি সন্ধানকেই তার নারী জীবনের মোক্ষ জ্ঞান করে। সংসার, সন্তান তার কাম্য নয়। মন্দপালের স্ত্রী জরিতা কিন্তু সন্তান স্নেহেই তৃপ্তি খুঁজে পায়। মন্দপাল প্রথমে লপিতার ভোগ-লালসার জীবনের আদর্শে উৎফুল্ল হয়ে ত্যাগ করে জরিতাকে। কিন্তু ক্রমে তার পিতৃহৃদয় সন্তানস্নেহে বুভুক্ষু হয়ে ওঠে। মন্দপাল ফিরে এলো স্ত্রী জরিতা ও সন্তানদের মাঝে। লপিতার প্রেয়সী মূর্তি, জরিতার মাতৃমূর্তির কাছে পরাজিত হয়। মন্দপাল উপলব্ধি করেছে প্রেয়সীমূর্তি অপেক্ষা শ্রেয়সী মাতৃমূর্তিতেই একজন নারী তার অন্তর সৌন্দর্যে সর্বাধিক সমুজ্জ্বল।

গালব ও মাধবী উপখ্যানে, মাধবী রাজা যযাতির কন্যা। মাধবীর স্বামী গালব এক শুষ্কহৃদয় জ্ঞানতাপস। ঋষি গালব স্ত্রী মাধবীকে ব্যবহার করেছিলেন তাঁর সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য। অপমানিতা মাধবী সন্ন্যাসিনী হলেন। পরে গালব উপলব্ধি করলেন নিজের ভুল। অনুশোচনায় গিয়ে উপস্থিত হলেন রাজা যযাতির কাছে। কিন্তু মাধবীকে আর ফিরে পাওয়া হলো না। জড়সাধনার অন্তঃসার-শূন্যতা উপলব্ধি করার পর গালবের হৃদয়ে মাধবীর অভাব অনুভূত হয়েছে। প্রেম জয়ী হয়েছে। কিন্তু এই প্রেম মিলনান্ত হয়ে উঠতে পারেনি।

জনক ও সুলভা উপাখ্যানে রাজা জনক সুলভার স্বয়ম্বর সভায় যোগ দেননি নিজের আদর্শ বজায় রাখতে। জনকের আদর্শকে শিরোধার্য করে সুলভাও সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে বাস্তব দূরত্ব থাকলেও, হৃদয়ের নৈকট্য কখনো বিঘ্নিত হয়নি। জনক ও সুলভার পারস্পরিক প্রেম প্রকাশ হয়ে পড়ে যখন মুখোমুখি উপস্থিত হয়। আদর্শনিষ্ঠ দুজনেই তাদের মোহ কাটিয়ে উঠে, আদর্শকে সম্মুখে রেখেই জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে এগিয়ে যায়। তাদের প্রেম মিলনে যেমন পূর্ণতা পায়নি, আবার অতৃপ্তিতেও তাদের জীবন বিষময় হয়ে ওঠেনি। মানবিক জীবনবোধের আদর্শে তাদের জীবনপথ আলোকিত হয়েছে। উপাখ্যানটিতে জীবনের আদর্শবোধ এবং দেহাতীত প্রেম এক সমান্তরাল পথ ধরেই এগিয়েছে, একের সঙ্গে অন্যের বিরোধ হয়নি।

জরৎকারু ও অস্তিকা এক প্রেমহীন দাম্পত্য জীবনের করুণ উপাখ্যান। অস্তিকা স্বেচ্ছায় বৃদ্ধ তপস্বী জরৎকারুকে বিয়ে করেছে নাগ-জাতিকে রক্ষা করার জন্য। বিবাহিত জীবনে স্বামী, স্ত্রী কেউ কারো ওপর আকর্ষণ বোধ করেনি, প্রেমের প্রত্যাশাও করেনি। জরৎকারু অস্তিকার গর্ভসঞ্চার সুনিশ্চিত করে বিদায় নেয়। অস্তিকার নাগ-জাতিকে রক্ষা করার পরিকল্পনা সফল হয়, কিন্তু বিফল হয় তার নারী জীবনের সযত্ন লালিত আশা আকাঙ্ক্ষা। পরহিতার্থে নিজের জীবনকে নিঃশেষ করে দিয়ে, আত্মবলিদানের এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে, অস্তিকা এই উপাখ্যানে।

অগস্ত ও লোপামুদ্রা উপাখ্যানে লেখক একদিকে যেমন নারী অন্তরের ছলনাময়ী রূপটি তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে পারস্পরিক হৃদয় বিনিময় যে প্রেমের প্রাথমিক সর্ত, তাও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অগস্ত লোপামুদ্রাকে গ্রহণ করেছিলেন শুধুমাত্র সন্তান সৃষ্টির জন্য। লোপামুদ্রার প্রেমের প্রতি সামান্য উৎসাহও দেখাননি অগস্ত। কিন্তু একদিন যখন অগস্ত প্রণয়প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালেন লোপামুদ্রার সম্মুখে তখন তাকে বিস্মিত হতে হয়েছিল। যে অলংকার বিচ্ছেদে অত্যন্ত শোকাতুরা হয়ে পড়ত, সেই লোপামুদ্রার কাছে স্তূপীকৃত অলংকার নিয়ে এলেও সে ফিরে তাকায় না। অপমানিত হয় অগস্ত। এই ভাবে অপমানের এবং আত্মগ্লানির আগুনে পুড়ে অগস্তর প্রেম যখন শুদ্ধ ও খাঁটি বলে লোপামুদ্রার কাছে বিবেচিত হয়েছে, তখনি দুটি হৃদয়ের মিল হয়েছে, প্রেম জয়ী হয়েছে।

উতথ্য ও চান্দ্রেয়ী উপাখ্যানে উতথ্যের স্ত্রী চান্দ্রেয়ী এক অবৈধ প্রেমে সাড়া দিয়ে বরুণকে ভালবেসেছে। তবে বিবাহিতা চান্দ্রেয়ীর এই পরকীয়া প্রেমের মূল কারণ, স্বামী উতথ্যর উপেক্ষা এবং চান্দ্রেয়ীর প্রতি নির্লিপ্তি। কিন্তু বরুণের প্রতি চান্দ্রেয়ীর আসক্তির কথা জানতে পেরে উতথ্য চান্দ্রেয়ীর প্রতি নতুন করে আকর্ষণ অনুভব করে এবং স্বাভাবিক কারণেই বরুণের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে পড়ে। উতথ্যর অভিশাপ থেকে বরুণকে রক্ষা করতে, চন্দ্রেয়ী স্বামীর কাছে ধরা দেয় এবং স্বামীকে অকপটে তার পদস্খলনের কথা জানায়। উতথ্য চান্দ্রেয়ীকে গ্রহণ করে। চান্দ্রেয়ীর সত্যবাদিতাই তাকে উতথ্যের কাছে ক্ষমাযোগ্য করে তুলেছিল। লেখক দেখিয়েছেন, সত্যনিষ্ঠা কিভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট মানুষকে তার জীবনের লক্ষ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

ভৃগু ও পুলোমা উপাখ্যানেও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রেমের অভাবে, দাম্পত্য জীবনে ঘোরতর সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ভৃগুর ভালবাসার অভাবে পুলোমা তার পূর্বাশ্রমের প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হয়েছে গর্ভে ভৃগুর সন্তানকে ধারণ করেও। সন্তান প্রসবের পর, নবজাতকের পিতৃ পরিচয় লাভের জন্য পুলোমা, স্বামী ভৃগুর কাছে ফিরে আসে। ভৃগু ভালবেসেই গ্রহণ করে স্ত্রী পুলোমাকে। মূল বিষয়টি মহাভারত থেকে সংগৃহীত হলেও লেখক প্রয়োজনানুসারে কাহিনীটির কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত 'পৌরানিক অভিধান' অনুযায়ী পুলোমা নামধারী এক রাক্ষস, ভৃগুর স্ত্রী পুলোমাকে হরণ করে। রাক্ষস বরাহ রূপ ধারণ করে পুলোমাকে হরণ করে মহাবেগে প্রস্থান করলে, পুলোমার সন্তান গর্ভচ্যুত হয়। সূর্যতুল্য তেজোময় এই শিশুকে দেখেই রাক্ষস পুলোমা ভস্মীভূত হয়। চ্যবন ও সুকন্যা উপাখ্যানেও মহাভারতের মূল কাহিনীটির কিছু রদ-বদল ঘটানো হয়েছে। মূল উপাখ্যানে আছে —

> চ্যবন ভৃগু ও পুলোমার সন্তান। রাজা শর্যাতির কন্যা, সুকন্যা। সুকন্যা এক বল্মিকস্তূপে দুটি উজ্জ্বল পদার্থ দেখতে পেয়ে বালিকাসুলভ চাপল্যবসে তাতে কাঁটা বিঁধিয়ে দেয়। ঐ উজ্জ্বল পদার্থদুটি ছিল তপস্যারত চ্যবনের দুটি চোখ। অন্ধ চ্যবনের ক্রোধ প্রশমিত করতে, রাজা শর্যাতি সুকন্যাকে চ্যবনের হাতে সম্প্রদান করেন। একদিন যৌবনদীপ্তা সুকন্যাকে স্নানের পর নগ্নাবস্থায় দেখে অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাকে প্রস্তাব দেয় জরাগ্রস্থ বৃদ্ধ চ্যবনকে ত্যাগ করে তাদের একজনকে গ্রহণ করতে। তারা আরো প্রস্তাব দেন তারা দেবচিকিৎসক হওয়ার সুবাদে চ্যবনকে যুবক ও রূপবাণ করে দেবেন, তারপর সুকন্যা চ্যবন এবং তদের দুজনের মধ্যে যে কোন একজনকে বেছে নিতে পারে। সুকন্যা যদি সম্মত হয়। যদিও অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং চ্যবন একই আকৃতি নিয়ে উপস্থিত হয়, তবুও সুকন্যা চ্যবনকে চিনতে পেরে তাকেই বরণ করে। সন্তুষ্ট চ্যবন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপানের অধিকারী করেন।[১৬৮]

সুবোধ ঘোষের উপাখ্যানে কিন্তু সুকন্যা অশ্বিনীকুমার রেবন্তের যৌবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরে বেরন্তকে দিয়ে চ্যবনের জরামুক্তি ঘটিয়ে চ্যবনকেই গ্রহণ করে স্বামীরূপে। সুকন্যা চ্যবনের চোখে বেদনার আভাস লক্ষ্য করে।

এখানে লক্ষ করার বিষয়, মহাভারতের এই কাহিনীতে কোথাও হৃদয় বিনিময় বা প্রেম নেই। কয়েকটি ঘটনার সন্নিবেশ হয়েছে মাত্র। কিন্তু সুবোধ ঘোষের উপাখ্যানে, প্রেম এসেছে সুকন্যা-রেবন্তকে ঘিরে। আবার স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের শাশ্বত প্রেমের নীতিনিষ্ঠতাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যখন সুকন্যা চ্যবনকেই স্বামী হিসেবে মেনে নিয়েছে। মূল কাহিনী সামান্য রদ-বদল ঘটিয়ে, মহাভারতীয় কাহিনীটিকে সুবোধ ঘোষ এই উপভোগ্য প্রেমোপাখ্যানে উন্নীত করেছেন।

দেবশর্মা ও রুচি উপাখ্যানটির বিষয়বস্তু মহাভারতের 'অনুশাসন পর্ব' থেকে সংগৃহীত। মহাভারতের এই কাহিনীটিতে ঋষি দেবশর্মা পরমাসুন্দরী রুচিকে বিবাহ করেছেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র গভীরভাবে কামনা করতেন রুচিকে। দেবশর্মার প্রিয় শিষ্য বিপুলের প্রতিবন্ধকতায় ইন্দ্রের মনোকামনা শেষপর্যন্ত চরিতার্থ হয়নি।

প্রণয় রসে পরিপূর্ণ এই উপাখ্যানে আমরা লক্ষ করি রুচি প্রথম থেকেই পরকীয়া প্রেমে আসক্ত। রুচির প্রথম প্রেম পুরন্দরকে ঘিরে। গুরুপত্নীকে স্ত্রী ধর্মের বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করার জন্য দেবশর্মার শিষ্য, বিপুল পরিকল্পিতভাবে রুচির সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে এবং তাকে পুরন্দরের মোহ থেকে মুক্ত করে। রুচির হৃদয় জয় করে, বিপুল তাকে তার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দেয় যে গুরুপত্নীকে পরপুরুষকামিতা থেকে রক্ষা করার জন্যই প্রেমের অভিনয় করেছে মাত্র। রুচি তার ভুল বুঝতে পেরে স্বধর্মে স্থিত হয়। ভারত প্রেমকথার এ উপাখ্যানটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে বিপুল চরিত্রটির জন্য। মহাভারতের কাহিনীতে রুচির সঙ্গে বিপুলের উদ্দেশ্যসাধক এই প্রেমের অংশটি অনুপস্থিত। অথচ সুবোধ ঘোষ সংযোজিত প্রেমের এই অংশটুকুই উপাখ্যানটিকে রসোত্তীর্ণ করেছে। বিশেষত গুরুপত্নীকে ব্যাভিচার থেকে রক্ষা করার জন্য বিপুলের কর্তব্য সচেতন বলিষ্ঠ ভূমিকা পাঠককে শ্রদ্ধান্বিত করে তোলে।

অনল ও ভাস্বতী উপাখ্যানে ভাস্বতী ভালবেসেছে সুবর্চারূপী অনলকে। প্রকৃত অনলকে নয়। অনল তার সুবর্চারূপের প্রতি ভাস্বতীর প্রেম-ভালবাসা নিয়ে যথেষ্ট কৌতুক করেছে এবং সে জন্য তাকে যথেষ্ট মূল্যও দিতে হয়েছে। স্বামী হিসেবে অনল ভাস্বতীর দেহ লাভ করেছে ঠিকই, কিন্তু তার মনের খোঁজ পায়নি।

ভাস্কর ও পৃথা উপাখ্যানটি মহাভারতের অতি পরিচিত কাহিনী। যদুবংশীয় রাজা শূরের কন্যা পৃথা। রাজা শূর নিঃসন্তান কুন্তিভোজকে এই কন্যা দান করেন। পালক পিতার নামানুসারেই পৃথার নাম হয় কুন্তী। একদিন মহর্ষি দুর্বাসা কুন্তিভোজের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করলে কুন্তীর পরিচর্যায় সন্তুষ্ট হন এবং তাকে একটি আমোঘ মন্ত্র শিখিয়ে দেন। এই মন্ত্রবলে কুন্তী যে দেবতাকে স্মরণ করবেন, সেই দেবতাই তার সম্মুখে উপস্থিত হবেন এবং সেই দেবতার প্রসাদে কুন্তীর পুত্রলাভ হবে। কৌতুহলবশে কুন্তী ভাস্কর (সূর্য) কে আহ্বান করেন এবং পুত্রবতী হন। তবে সূর্যের বরে কুন্তীর কুমারীত্ব অক্ষুন্ন থাকে। মহাভারতের এই অংশটি নিয়ে সুবোধ ঘোষ উপাখ্যানটিতে দেখিয়েছেন কেবলমাত্র রূপের মোহ, কৌতুহল এবং অপরিণামদর্শিতার কুফল কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে। মহাভারতের এই ক্লাসিক রূপটি অনেক কবি সাহিত্যিককেই কাব্য ও সাহিত্যসৃষ্টিতে উৎসাহিত করেছ। রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' এর এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

বসুরাজ ও গিরিকা উপাখ্যানে মহাভারতের মূল কাহিনীটির এক ক্ষুদ্রাংশ গ্রহণ করে সুবোধ ঘোষ অত্যন্ত উপভোগ্য এই প্রণয় কাহিনীটি রচনা করেছেন। এই উপাখ্যানে লেখক সুচিন্তিতভাবেই যেন বোলতে চেয়েছেন যে শুধুমাত্র জন্ম-পরিচয়ের জন্যই কেউ ঘৃণার পাত্র হতে পারে না। এক ধর্ষনের ঘটনার ফলে জন্ম গিরিকার। সেই গিরিকাকে সসম্মানে গ্রহণ করতে চায়নি বসুরাজ। পরে গিরিকার রূপে ও আচরণে মুগ্ধ হয়ে তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছেন। বসুরাজের গিরিকাকে প্রথমে প্রত্যাখান এবং পরে সাগ্রহে বরণ-এই অংশটুকু সুবোধ ঘোষ তার উপাখ্যানে বিস্তৃত করেছেন মহাভারতীয় কাহিনীটির একটি সূত্রকে সফল প্রণয় কাহিনীর রূপ দিতে।

পৌরানিক অভিধানে আছে শুক্তিমতী নদীকে একটি পর্বত কামান্ধ হয়ে ধর্ষন করে। বসুরাজ পদাঘাতে সেই পর্বতকে বিদীর্ণ করেন। এই ঘটনায় শুক্তিমতীর একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। শুক্তিমতী এই পুত্র কন্যাকে বসুরাজের হস্তে অর্পন করেন। রাজা সেই পুত্রকে সেনাপতি এবং

কন্যা গিরিকাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন।[১৬৯]

অতিরথ-পিঙ্গলা প্রণয় উপাখ্যানে বারাঙ্গনা পিঙ্গলা যথার্থই ভালবেসেছিল রাজা অতিরথকে। কিন্তু অতিরথ উপেক্ষা করেছে সেই প্রেমকে। পরে যখন অতিরথ পিঙ্গলাকে লাভ করতে উতলা হয়ে উঠেছে, তখন পিঙ্গলা তার প্রেম-ভালবাসার সাধনায় ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে। অতিরথের অন্তর যখন পিঙ্গলার প্রতি প্রেমে উদ্বেল হয়ে উঠল তখন সে পেল তপস্বী পিঙ্গলাকে। ঈশ্বর প্রেমের আনন্দে উদ্ভাসিত পিঙ্গলার অন্তরে তখন ব্যক্তিগত প্রেম-ভালবাসার কোন অর্থ নেই। অতিরথও ঈশ্বর প্রেমের মাহাত্ম উপলব্ধি করে এবং বুঝতে পারে রাজগর্বের অসারতা এবং নিজেও বেছে নেয় এক তপস্যার জীবন।

অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা, মহাভারতীয় এই চরিত্র দুটি, সুবোধ ঘোষের উপাখ্যানে সংযম ও নিষ্ঠাকে একটি সুস্থ ও সুন্দর দাম্পত্য জীবন যাপনের প্রাথমিক সর্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। স্বাভাবিক কারণে অষ্টাবক্র ও সুপ্রভার প্রণয় এবং প্রণয়ান্তে বিবাহ উপাখ্যানটির মূল বক্তব্য হলেও, লেখক মহাভারতীয় কাহিনীর বাইরে গিয়ে নতুন কোনও বিষয়ের অবতারনা করেন নি। কারন প্রয়োজন হয় নি। লেখক কাহিনীটিতে একটি বিষয় স্পষ্ট করেছেন যে নারী-পুরুষের জীবনে আসক্তি অবশ্যাম্ভাবী। সুস্থ দাম্পত্য জীবনের জন্য প্রয়োজন এই আসক্তির প্রতি নিষ্ঠা যা প্রেমের সৌন্দর্য ও শুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য একান্ত সহায়ক। অষ্টাবক্র এবং সুপ্রভা নানাভাবে তাদের সংযম প্রমাণ করেছে। উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রেমের একনিষ্ঠতায়, একে অন্যকে কাছে না পেয়ে যখন মৃত্যুকেই শ্রেয় জ্ঞান করেছে, ঠিক তখনই তাদের সমস্ত পরীক্ষার সাফল্য মেনে নিয়ে সুপ্রভার পিতা ঋষি বদান্য মেয়ের সঙ্গে অষ্টাবক্রর বিয়ে দিয়েছে।

মহাভারতীয় উপাখ্যানে দক্ষের কন্যা স্বাহা অগ্নিকে কামনা করতেন। সপ্তর্ষিদের যজ্ঞানুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে অগ্নি সপ্তর্ষিদের স্ত্রীদের দেখে কামার্ত হন। স্বাহা পর পর ছয় জন ঋষিপত্নির রূপ ধারণ করে অগ্নির সঙ্গে মিলিত হন। কিন্তু বশিষ্ঠ পত্নী অরুন্ধতীর তপ:প্রভাবে স্বাহা তার রূপ ধারণ করতে পারেন নি। মহাভারত থেকে শুধুমাত্র এই তথ্যটুকু গ্রহণ করে, সুবোধ ঘোষ অত্যন্ত উপভোগ্য প্রণয় কাহিনীটি রচনা করেছেন। মহাভারতের কাহিনীতে স্বাহা কামতাড়িতা এক প্রণয়ী। অগ্নি তাকে প্রত্যাখ্যান করার ফলে, যে কোন মূল্যে অগ্নিকে লাভ করার জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করে অগ্নির সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছে। দ্বিতীয়ত অগ্নি কখনো স্বাহার প্রতি প্রেমাকর্ষণ অনুভব করে নি।

কিন্তু সুবোধ ঘোষের উপাখ্যানে, স্বাহা কামতাড়িতা নয়, বরং নারীর প্রেম ধর্মের প্রতি আদর্শনিষ্ঠ। ছয়জন ঋষিপত্নীর রূপ ধারণ করে স্বাহা এই উপাখ্যানেও অগ্নির সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, কিন্তু তার এই মিলন তার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য নয় বরং অগ্নিকে এক 'ভয়ানক কলুষের আক্রমণ' থেকে রক্ষা করার জন্য। অগ্নির পদস্খলনের আশংকার স্বাহার অন্তর্বেদনা বর্ণনা করে সুবোধ ঘোষ লিখেছেন 'কে উদ্ধার করবে অগ্নিকে? সুন্দর পাবকের জীবনের শুচিতাকে এই ভয়ানক কলুষের আক্রমণ থেকে কেমন করে রক্ষা করা যায়? এই প্রশ্নে যেন স্বাহা ভাবনার অন্ধকারে রুদ্ধ স্বপ্নের মত সারাক্ষণ বেদনা সহ্য করতে থাকে'।

ছ'জন ঋষিপত্নী অনসূয়া, সম্ভুতি, শ্রদ্ধা, প্রীতি, গতি ও সন্নীতির বেশ ধরে স্বাহা অগ্নির কাছে ধরা দিলেও বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীর রূপ পরিগ্রহ করে অগ্নির কাছে যাবার সময় যে বাধা আসে তা তার বিবেক থেকেই। মহাভারত অনুসারে অরুন্ধতীর তপ:প্রভাবে নয়, স্বাহা নিজেই অগ্নির সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে তার নিজ কৃতকর্মের ভুল বুঝতে পেরে নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্যের জন্য সবাইকে ছেড়ে একাকী চলে গেছে। এই উপাখ্যানটি রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে যখন দেখা যায়, গল্পের শেষাংশে অগ্নি স্বাহার প্রেমের একনিষ্ঠতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে লাভ করার জন্য উতলা হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বাহা তখন সংসার ত্যাগ করেছে।

প্রেম এসেছে কিন্তু মিলনে তার পরিসমাপ্তি ঘটে নি।

রুরু ও প্রমদ্বরা উপাখ্যানেও সুবোধ ঘোষ নারীর প্রেমধর্মের আদর্শনিষ্ঠার জয়গান করেছেন। এই উপাখ্যানে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে একজন নারীর প্রেমের প্রতি আদর্শনিষ্ঠা 'ক্ষণ-প্রণয়ের' প্রেমিককেও আদর্শনিষ্ঠ প্রেমের পথে চালিত করতে পারে।

অপ্সরী ঘৃতাচী এবং প্রমতির ক্ষণপ্রণয়ের সন্তান রুরু। প্রমদ্বরা গন্ধর্ব পিতা বিশ্বাবসু ও অপ্সরা মাতা মেনকার ক্ষণপ্রণয়ের সন্তান। প্রমদ্বরা মহর্ষি স্থূলকেশের পালিতা কন্যা। প্রমদ্বরা উপবনপথে দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখেছে রুরুকে। প্রমদ্বরা স্বীকারোক্তি —

> আপাকে প্রণাম করার সৌভাগ্য কোনদিন হয়নি এই প্রণয়ভীরু কুমারীর। কিন্তু আপনার পদস্পর্শপূত পথধুলি তুলে নিয়ে এই কুমারী নিজ হাতেই তার শূন্য সীমন্তসরণি লিপ্ত করেছে। আপনি পূজ্য, আপনি প্রিয়, আপনিই এই আশ্রমচারিণীর চিরকালের প্রেমের আস্পদ।[১৭০]

রুরুও প্রথম দর্শনেই প্রমদ্বরার দেহবল্লবীর শৈল্পিক সৌন্দর্যে অভিভূত হয়েছে। কিন্তু বিরোধ বেধেছে উভয়ের প্রেমের আদর্শে। প্রমদ্বরা চেয়েছে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে তার প্রণয়কে চিরদিনের চিরন্তন রূপ দিতে, রুরুর আসক্তি ক্ষণপ্রণয়ের সম্ভোগে। উভয়েই নিজ নিজ প্রণয়ধর্মের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপিত করেছে। শেষে বাধ্য হয়েই যে কোন প্রকারে প্রমদ্বরাকে লাভ করার জন্য রুরু প্রমদ্বরার বিবাহ প্রস্তাব মেনে নিয়ে ফিরে গিয়েছে। প্রমতি নিজে এসে মহর্ষি স্থূলকেশের কাছে পুত্র রুরুর জন্য তার পালিতা কন্যা প্রমদ্বরার পাণি প্রার্থনা করেছে, বিবাহ স্থির হয়েছে। বিবাহের দিন রুরু তার পরিকল্পনামত আবার উপবনপ্রান্তে সাক্ষ্যাৎ করে প্রমদ্বরার সঙ্গে এবং জানায় তার এক মনগড়া স্বপ্নের কাহিনী। রুরু জানায় সে স্বপ্ন দেখেছে যে শুভ রজনীর মিলনোৎসবে তারা দুজন পরম তৃপ্তিলাভের পর দুই ভিন্ন দিকে প্রস্থান করেছে, কেউ কারো জীবনের বন্ধন হয়ে ওঠে নি। রুরু জানায় এ শুধু তার স্বপ্ন নয়, সংকল্প। উত্তরে প্রমদ্বরা জানায়, সেও স্বপ্ন দেখেছে মিথ্যা হবে রুরুর সংকল্প। উদ্দেশ্যসাধনে ব্যর্থ রুরু চিরবিদায় নিয়ে ফিরে যায়।

বাড়ি ফিরে তার বিস্মৃত অতীত স্মরণ করে বেদনাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রুরু। মনে পড়ে তার অপ্সরী মা কিভাবে তাকে সদ্যোজাত অবস্থায় ত্যাগ করে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গেই প্রমদ্বরার প্রণয়াদর্শের পূনর্মূল্যায়ন করে রুরু উপলব্ধি করে যে প্রমদ্বরা 'অমাতা হবার অভিশাপ থেকে বাঁচতে চায়, সন্তানের পালয়িত্রী আর প্রেমিকের গৃহিনী হতে চায় প্রমদ্বরা'।

সিদ্ধান্ত বদলে, প্রমদ্বরার প্রেমে চিরদিনের জন্য ধরা দিতেই ছুটে যায় রুরু। কিন্তু গিয়ে দেখে এক সর্পদংশনে প্রমদ্বরার মৃত্যু আসন্ন। এক দেবদূতের আকাশবানীতে রুরুকে জানানো হয় যে রুরু যদি তার আয়ুর অর্ধেক প্রমদ্বরাকে দান করে, তবেই একমাত্র, প্রমদ্বরাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব। ক্ষণপ্রণয়ের আসক্তি মুক্ত হয়ে, প্রমদ্বরাকে বিবাহিত স্ত্রী হিসেবে লাভ করার একান্ত কামনায় রুরু, সাগ্রহে রাজি হয় সেই প্রস্তাবে এবং তার অর্ধায়ু দান করে প্রমদ্বরাকে সুস্থ করে এবং তাকে বিবাহিত স্ত্রীর মর্যাদা দান করে।

রুরুর কামজাত প্রবৃত্তি পরাজিত হয় প্রমদ্বরার প্রণয়নিষ্ঠার কাছে। আজকের এই অতি আধুনিক যুগে যখন নারী পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে নানা ভাঙা-গড়া এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে সমাজে, তখন প্রকৃত প্রেমের চিরন্তন আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করে, লেখক সুবোধ ঘোষ তার এক কঠিন সামাজিক কর্তব্য পালন করেছেন। আর সেজন্যই 'রুরু প্রমদ্বরা' গল্পটির বক্তব্য ও আদর্শ আজকের আধুনিক জীবনে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

ইন্দ্র ও শ্রুবাবতী ভারত প্রেমকথার সর্বশেষ প্রণয়োপাখ্যান। এই উপাখ্যানে সুবোধ ঘোষ মর্ত্যের নর-নারীর প্রেমকে স্বর্গের অনন্ত সুখ ও অপার ঐশ্বর্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর বলে প্রতিপন্ন করেছেন।

ঋষি ভরদ্বাজের তপস্বিনী কন্যা শ্রুবাবতী ইন্দ্রের পরিচয় না জেনেও প্রথম দর্শনেই তাকে ভালবেসেছে। শ্রুবাবতীর প্রেমের উত্তরে ইন্দ্র তাকে স্বর্গলোকে স্থায়ী আসন দিতে চেয়েছে, কিন্তু শ্রুবাবতী সেই বরকে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে, মর্ত্যের প্রেমিক হিসেবেই ইন্দ্রকে পেতে চেয়েছে তার আত্মবিশ্বাসী প্রেমের একনিষ্ঠতায়। অহংকারী ইন্দ্র শ্রুবাবতীর এই উচ্চাভিলাসে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছে। শ্রুবাবতী জানিয়েছে যে, সে ইন্দ্রর জন্য আমৃত্যু অপেক্ষা করবে এই মর্ত্যভূমিতেই। তপস্বিনীর এই প্রণয়-প্রতিজ্ঞার ওপর কোন গুরুত্ব না দিয়েই ইন্দ্র প্রস্থান করেছে স্বর্গে।

বেশ কিছুদিন পর নিছক কৌতুহল চরিতার্থ করবার জন্যই ইন্দ্র আবার মর্ত্যে নেমে এসেছে শ্রুবাবতীর প্রণয় প্রতিজ্ঞার পরিণতি চাক্ষুস করার জন্য। ইন্দ্র বিস্মিত হয়েছে শ্রুবাবতীর অটল প্রেমনিষ্ঠা দেখে। নানাভাবে এমন কি ছদ্মবেশ ধরেও অনেকভাবে পরীক্ষা করেছে শ্রুবাবতীর প্রেমনিষ্ঠার। প্রতিবারই দেবরাজকে বিস্মিত করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে শ্রুবাবতী। স্বর্গলাভের অশ্বাস এমনকি মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রের পত্নীত্ব লাভের আশ্বাসও শ্রুবাবতী প্রত্যাখ্যান করেছে অবলীলায়। কারণ স্বর্গের ইন্দ্রকে সে ভালবাসেনি। শ্রুবাবতী ভালবেসেছে মর্ত্যের মাটিতে পদচারণার ইন্দ্রকে।

বিভিন্নভাবে পরীক্ষার পর ইন্দ্র অবশেষে বিশ্বাস করেছে যে শ্রুবাবতী প্রকৃতই তাকে ভালবাসে। প্রসন্ন ইন্দ্র শ্রুবাবতীকে বর দিয়েছে – 'তুমি তোমার মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গিয়ে আমার পরিণীতা পত্নী হবে।' কিন্তু এই বর শ্রুবাবতীকে আদৌ প্রসন্ন বা উৎসাহিত করতে পারেনি। বেদনার্ত অন্তরে শ্রুবাবতী ইন্দ্রকে বলে —

> আমার জীবন হতে প্রতিক্ষার সবেদন আনন্দটুকুও আপনি ছিন্ন করে দিলেন বাসব। পারিজাতের ছায়া স্বর্গের নন্দনবনবীথিকাকে স্নিগ্ধ ও সুরভিত করে রাখুক, মর্ত্যের প্রেমিকা নারী তার প্রতীক্ষাহীন ইহজীবনের শূন্যতা নিয়ে এই নীলাশোকের ছায়ার কাছে বিলীন হয়ে যাবে। মর্ত্যের বক্ষে শেষ নিঃশ্বাস সঁপে দেবার আগে শুধু বলে যাব, চাই না স্বর্গ, স্বর্গাধীশকেও চাই না, আমি আমার মর্ত্যের বনবীথিকাচারী বাসবকে ভালবাসি।[১৭১]

এই ভাবেই শ্রুবাবতী মর্ত্যের মাটিতে মানুষের বেদনাবিধুর প্রেমকে স্বর্গের সর্বসুখপ্রদ প্রেম অপেক্ষা মহত্তর করে তুলেছে। স্বর্গকে মর্ত্যের কাছে করেছে পরাজিত।

সুবোধ ঘোষের 'ভারতপ্রেমকথা' বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। বহু হাজার বছর প্রাচীন মহাকাব্য থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে, প্রয়োজন অনুসারে সেই বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটিয়ে লেখক কাহিনীগুলোকে যুগপোযোগী করে পরিবেশন করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্ঠা যে সর্বার্থসাধক হয়েছে, এই আধুনিক কালেও যে কাহিনীগুলোর জনপ্রিয়তা এতটুকু কমেনি, তার প্রমাণ 'ভারত প্রেমকথার' অভূতপূর্ব বিক্রী সংখ্যা। ১৯৫৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত গ্রন্থটির একুশটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, যার মুদ্রণ সংখ্যা ৯৬,৮০০ টি। বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এটা অবশ্যই এক গর্বের কারণ। 'ভারত প্রেমকথা'র ভূমিকায় প্রমথনাথ বিশী বলেছেন —

> সুবোধবাবুর ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান ও শ্রদ্ধা বাংলা সাহিত্যের একটি আশার বিষয়। আর সেই জ্ঞান ও শ্রদ্ধার দ্বারা চালিত হইয়া তিনি মহাভারতের কাহিনীকে নিজের শিল্পসৃষ্টির বিষয় করিয়া তুলিয়াছেন।
>
> বলা বাহুল্য, শিল্প দৃষ্টির বলে সুবোধবাবু বুঝিয়াছেন যে, প্রাচীনের অনুকরণ

করিলে চলিবে না, প্রাচীনকে নবীন করিয়া তুলিতে হইবে। মনে রাখা উচিত যে ঐতিহ্য বিরহিত হইলেই সার্থক সৃষ্টি হয় না। সার্থক শিল্পসৃষ্টির মূলে স্বভাববিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়া আবশ্যক, ট্রাডিশন ও ফ্রীডম, সংস্কার ও স্বাধীনতা। 'ভারত প্রেমকথা'র গল্পগুলিতে স্বাধীনতা ও সংস্কারের অতি অপূর্ব মিলন হইয়াছে। আর সেই প্রেমকথাগুলি অতি উচ্চাঙ্গের শিল্পসৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে।[১৭২]

ভারত প্রেমকথার গল্পগুলির নায়ক-নায়িকারা সকলেই মহাভারতীয় চরিত্র। গল্পগুলো মহাভারতীয় প্রেমোপাখ্যানের নবনির্মিত রূপ হলেও, সুবোধ ঘোষ অত্যন্ত সচেতনভাবে এই ক্লাসিক সাহিত্যের পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিত অক্ষুন্ন রাখার তাগিদে এমন এক ধ্বনি সমৃদ্ধ ভাষারীতি গ্রহণ করেছেন যার ভেলায় চড়ে পাঠক অবলীলায় মহাভারতীয় যুগে পৌঁছে গিয়ে গল্পগুলোর রস আস্বাদন করতে পারে। ভারত প্রেমকথার এই অনবদ্য ভাষা সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী তাঁর ভূমিকার শেষাংশে বলেছেন —

ভাষার মৃদঙ্গ বাজিতেছে। এমন বর্ণাঢ্য, রূপাঢ্য ধ্বনিসুন্দর ভাষা বাংলা ভাষারই এক নতুন পরিচয় এবং বিপুল উৎকর্ষের সম্ভাবনাময় পথটি দেখাইয়া দিতেছে, মহাভারতীয় পরিবেশ রচনা এ ভাষারীতি ছাড়া অসম্ভব। বাংলা সাহিত্যে যখনই ক্লাসিকাল রস সৃষ্টি করিয়াছেন তখনই এই ভাষারীতিকে গ্রহণ করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছেন। ইদানীংকালে অধিকাংশ লেখক সে প্রয়োজন অনুভব করে না, তাই অ-ব্যবহারে, অপরিচয়ে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেই অজ্ঞানে এহেন ভাষারীতি নষ্ট হইতে বসিয়াছে। ভাষার নিজস্ব একটি মহিমা আছে, ভাষা কেবল ভাবের বাহন নয়।

বস্তুত, প্রকৃত গণ-সাহিত্যের উপাদান সঞ্চিত আছে ওই রামায়ণ ও মহাভারতে। 'ভারত প্রেমকথা' বঙ্গ-সরস্বতীর চিরকালীন অঙ্গভূষণ।[১৭৩]

আট

সুবোধ ঘোষের লেখক জীবনের অন্য একটি স্বতন্ত্রতাও লক্ষ করার মত। তিনি তখনই কলম ধরেছেন, যখন নিজ অন্তরে কিছু লেখার জন্য তাগিদ অনুভব করেছেন। প্রকাশকদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে বা লিখতে হবে বলেই, তিনি লেখেন নি। 'সেদিনের আলোছায়া'য় লেখক স্বীকার করেছেন —

> এই পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে মাঝে-মাঝে একটানা অনেক বৎসর এবং অনেক মাস বাদ গিয়েছে, গল্প লেখার ইচ্ছা ও চেষ্টা দুই-ই স্তব্ধ হয়ে যেন সাময়িক বিরাম উপভোগ করেছে। একবার একটানা পুরো চার বছর এবং একবার একটানা পুরো দু বছর একটিও গল্প লিখিনি।[১৭৪]

সুবোধ ঘোষের রচনায় সমাজের অতি সাধারণ মানুষ ভিড় করেছে। কারণ তিনি সম্ভবত সমাজের সেই অবহেলিত মানুষের মধ্যেই মানবিকতা এবং মনুষ্যত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন। মানশুল্কার 'লোকটা', যার কোন সমাজিক পরিচয় নেই, পুলিশ যাকে সমাজবিরোধী হিসেবে গ্রেপ্তার করেছে সে নারীমাংসলোভী সভ্য সমাজের মানুষের থাবা থেকে আগো-কে রক্ষা করেছে। অলীক গল্পের মূল চরিত্র অলীক যে ফাঁক খুঁজে নিমন্ত্রণ বাড়িতে ঢুকে অতিথির বেশে ভোজ খেয়ে বেড়ায় সে গরীব সংসারের একটি মেয়ের বিবাহ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে। ক্যাকটাস গল্পে মাইনে করা পাহারাদার দলবীর এক বৃদ্ধা 'চোর শাকবুড়ি'কে প্রচন্ড ঠান্ডায় ক্যাকটাসের গায়ে দেওয়া পাঁচগজ ফ্লানেলের টুকরো চুরি করতে দেখে বাঁধা দেয় না। কারণ পাহাড়ের প্রচন্ড শীতে বুড়ি কুঁকড়ে গিয়েছিল। নিজের তুলোর জামা দিয়ে ঢাকা দেয় ক্যাকটাস। তবু চাকরী যায় তার। চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধে অবহেলিত আদিবাসী সমাজের স্টিফান হোরো বিদেশী ইংরেজের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের আন্দোলনে রুনু হোরেতে নিজেকে পরিবর্তন করে সংগ্রামে আদর্শে অবিচল থেকেছে। শিবালয়ের অনন্তরাম জাতীয়তাবোধে এবং গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে হাসি মুখে প্রাণ দিয়েছে। এ ধরনের অনেক অবহেলিত মানুষের চরিত্র সুবোধবাবুর গল্পে মানবিকতার আদর্শে উজ্জ্বল। সেদিনের আলোছায়ায় লেখক নিজেই এইসব 'নিম্ন সাধারণ' মানুষকে 'উচ্চ সাধারণ' মানুষের আসনে বসিয়েছেন।

> শতশত যে সব মানুষের সংসর্গে আমার নানা রূপের ও রকমের জীবিকা কর্মের দিনগুলি কেটেছে তার সমাজবিজ্ঞ পন্ডিতের ভাষায় নিম্ন সাধারণ মানুষ। আমার শিক্ষায় ও অভিজ্ঞতায় তারা উচ্চসাধারণ মানুষ।[১৭৫]

আমরা জানি সুবোধ ঘোষ প্রথমদিকে রাজনীতিতেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমে মার্কসবাদে বিশ্বাস স্থাপন করে পরে সরে এসেছিলেন গান্ধীবাদে। কংগ্রেসের সংস্কৃতিক আন্দোলনেও তিনি একসময় পুরোভাগে ছিলেন। কিন্তু পরে সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে পুরোপুরি গুটিয়ে নেন। বিষয়টা এখানে প্রাসঙ্গিক এ জন্য যে তিনি মানুষকে ভালবেসে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেই রাজনীতিতে এসেছিলেন। মত বদল পথ বদল করে, এমনকি স্বপ্নের স্বাধীনতা লাভের পরেও দেশের সাধারণ মানুষের বাস্তব অবস্থার বিশেষ তারতম্য না হওয়ায় তিনি রাজনীতির সংশ্রব ত্যাগ করেছিলেন বললে অন্যায় হবে না। এ কথাও মনে করা অসঙ্গত হবে না যে জীবনের অন্তিম পর্বে তিনি মানুষের সম্পর্কে, মানুষের মনুষ্যত্ব সম্পর্কেও আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। সমস্ত জীবন ধরে তিনি মানুষের মধ্যে সরলতা, সৌন্দর্য, শৃঙ্খলাবোধ, সর্বোপরি প্রেম ও ভালবাসার সন্ধান করে ক্লান্ত ও হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলেন। জীবনের শেষ পর্বে তাঁর সেই স্বপ্নের সরল প্রেম-ভালবাসার খোঁজ পেয়েছিলেন বনের পশু ও উন্মুক্ত প্রকৃতিতে।

লেখকের মৃত্যুর পর মডার্ন কলাম প্রকাশিত 'ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো'র 'পশু প্রকৃতি প্রেম'

বিষয়ক তাঁর দশটি গল্প এই সত্য প্রমাণ করে। গ্রন্থটির প্রকাশিকা লতিকা সাহা তার মুখবন্ধে এই গল্পগুলি সম্পর্কে বলেছেন —

> প্রাণী-জগতের সরলতা ও সৌন্দর্য আর আধুনিক মানবসমাজের কুটিল স্বার্থপরতা—এই বাস্তব বৈপরীত্য লেখকের মনকে আলোড়িত করেছিল। বিচিত্র অঙ্গিকের গল্পগুলি সুবোধ ঘোষের সাহিত্যমানসের এই তীব্র বেদনারই প্রতিফলন। গল্পগুলির অন্যতম প্রধান চরিত্র রামতনু এক অর্থে লেখকের প্রতিভূ যার মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর প্রথম যৌবনের দিনগুলি। পশু সমাজের নিয়মানুবর্তিতা ও প্রেম অনেক ক্ষেত্রে যে মানুষের সঙ্গ ও আকর্ষণের চেয়ে শ্রেয় এই অপ্রিয় সত্যকে লেখক সুকৌশলে তাঁর গল্পগুলির মাধ্যমে প্রতিভাত করেছেন।[১৭৬]

'ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো' গ্রন্থে 'পশু প্রকৃতি প্রেম' অধ্যায়ে প্রকাশিত দশটি গল্প – তিনপাহাড়ীর বুড়ো বট, সিমারিয়ার বনবালা, একজন দ্বিতীয় জনমেজয়, মিঠুয়া জঙ্গলের সবই মিষ্টি, শ্রীমতী নিনা ভরদ্বাজ ও হরিণী, মধুগঞ্জের সুমতি, জগমোতির পাহাড়ী ময়না, জগনপুরের দীপালি রায়, ডায়েনা ও মালতী এবং হরেনবাবুর হরিণী মেয়ে।

এই দশটি গল্প ছাড়াও, বাবু রতন রায়ের ঘোড়া, জঙ্গল প্রেমিক উড সাহেব, 'বসুধৈব কুটুম্বকম্ এবং 'চেতনপুরার বিশপ হ্যাটো' গল্প চারটিতে সুবোধ ঘোষের পশুপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গল্প চারটি সহ মোট চোদ্দটি গল্পই ১৯৯৫ সালে 'ক্যাকটাস' গল্পসংগ্রহে প্রকাশিত হয়েছে।

'তিন পাহাড়ীর বুড়ো বট' গল্পে, তিনপাহাড়ীর জমিদারী একটি শালজঙ্গলে এসে ঠেকেছে। এই জঙ্গলের পরেই শুরু হয়েছে ঘন অরণ্য। জমিদার বলবন্ত রায়ের দারিদ্র্যজর্জর রুগ্ন চেহারা। শালজঙ্গলের মধ্যে অতি প্রাচীন এক বটগাছ, যেন বলবন্তের প্রাণ। সে বিশ্বাস করে ঐ বটগাছে ঝুলে থাকা অসংখ্য বাদুড় তার পূর্বপুরুষের এবং ইংরেজ শাসকের গুলিতে নিহত পালামৌ জেলার দেশভক্ত মানুষদের আত্মা। বলবন্তের আরো বিশ্বাস এই বটগাছই তার ও তার পুরুষানুক্রমিক জমিদারীর গৌরব ও আভিজাত্যকে বজায় রাখবে। কেউ যদি এই বটগাছকে অপমান করে তবে এই গাছ নিজেই তার প্রতিশোধ নেবে। বলবন্তের ঠাকুর্দা বলে গিয়েছিলেন এই গাছে সব সময়ই কেউ না কেউ ঝুলে থাকবে, তা সে বাদুড়ই হোক্ বা মানুষই হোক্।

গল্পে সুখলাল এবং জগদীশ অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। সুখলাল নিয়মিতভাবে এই বটগাছের বাদুড় ধরে বিক্রী করে। বাদুড় বিক্রীর পয়সায় নিত্য নতুন গয়না কিনে সে তার সুন্দরী স্ত্রীকে উপহার দেয়। জগদীশও সর্বতোভাবে এ কাজে সাহায্য করে সুখলালকে। বলবন্ত এ কাজে স্বাভাবিকভাবেই বাধা দেয় সুখলালকে। কিন্তু কোন বাধাই গ্রাহ্য করে না সুখলাল। তশীলদার রামতনুকে বলেও কোন ফল হয় নি। বটগাছে ঝুলন্ত বাদুড়ের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে।

একদিন বটগাছ শূন্য করে শেষ বাদুড়কে ধরে নিয়ে সুখলাল কি মনে করে অসময়ে বাড়িতে গিয়ে জগদীশ ও স্ত্রী মোহিনীকে আপত্তিজনক অবস্থায় দেখতে পেয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। জগদীশ ও মোহিনী পালায়, সুখলাল ঐ বটগাছেই ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে। বটগাছে ঝোলে সুখলালের লাশ। যদিও সুখলালের আত্মহত্যার পেছনে রয়েছে দাম্পত্য বিশ্বাসভঙ্গের ঘটনা, তবুও, কাকতালীয় হলেও, এই গল্পে বলবন্ত রায়ের বিশ্বাস ও বটগাছের মাহাত্মই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, প্রকৃতির প্রতি মানুষের বিশ্বাসনিষ্ঠাকে দৃঢ়তর করেছে।

সিমারিয়ার বনবালা'য় রামতনু, বন এবং বন সংলগ্ন গ্রামবাসীদের রক্ষার জন্য প্রত্যক্ষভাবে এগিয়ে

এসেছে। রামতনুরূপী লেখক দেখিয়েছেন কিভাবে শিক্ষিত এবং অর্থপিশাচ মানুষ জঙ্গলের প্রাকৃতিক ঘেরাটোপকে কাজে লাগিয়ে জঙ্গলের ভেতর গাঁজা এবং চরসের চাষ করে অর্থোপার্জনের নেশায় মেতে ওঠে। এই কুকর্ম যাতে প্রকাশ না হয়, সে জন্য ভন্ড চাঁদবাবু প্রচার করে যে বনের ভেতর এক নারীদেহলোভী ভালুক রয়েছে। বনগ্রামের মেয়েরা জঙ্গলে ঢুকতে ভয় পায়। অসীম সাহসী এক বনবালা জঙ্গলে প্রবেশ করলে ভালুকরূপী চাঁদবাবু তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বনবালা সাধ্যমত প্রতিরোধ করে। দুজনেই আহত হয়। চাঁদবাবুর দেহে আঘাতের স্পষ্ট চিহ্ন দেখে রামতনু চাঁদবাবুর ভন্ডামী সম্পর্কে নি:সন্দেহ হয় এবং তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। বাঁচে অরণ্য আর অরণ্য সংলগ্ন, সহজ, সরল, পরিশ্রমী গ্রামের মানুষেরা। ঘটনাটিতে লেখকের তৃপ্তি উল্লসিত হয়ে উঠেছে গল্পের শেষাংশে।

> একটা মস্ত টিয়ার ঝাঁক কলরব করে উড়ে গেল। গন্‌ঝু মেয়েটা আবার খিলখিল করে হেসে ওঠে, যার কোলে এখন কোন ঋক্ষশিশু নেই মুখের ওপর অল্প জ্যোৎস্নার প্রলেপ নেই, আর দুই কানেতে কৃষ্ণচূড়ার কোন মঞ্জরীও নেই। তবু ওকে একজন রূপসী বনবালা বলেই তো মনে হয়।[১৭৭]

'একজন দ্বিতীয় জনমেজয়' একটি বন্ধু সাপ এবং একজন ভন্ড সন্ন্যাসীর গল্প। গয়া জেলার দক্ষিণে চার-পাঁচটি মৌজা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে এক ভয়ানক জঙ্গল 'দানুয়া-ভালুয়া'। এই জঙ্গলের একটি মৌজা সিমারিয়া। যুবক রামতনু এস্টেটের তসীলদার। এক বাঙালী দম্পতি মধুবাবু এবং তার সুন্দরী স্ত্রী মনোরমা রামতনুকে তাদের পারিবারিক বন্ধু করে নেয়। এই দম্পতি-বিশেষত মনোরমা একটি গোখরো সাপের ভয়ে সর্বদাই আতঙ্কিত। সাপটিকে সবাই সন্ন্যাসী সাপ বলেই জানে। এই ভয়ের সুবাদেই তাদের বাড়িতে এক ভন্ড সন্ন্যাসী, হাসু ঠাকুর আস্তানা গেড়েছে। হাসু ঠাকুর কথা দিয়েছে এক সর্পযজ্ঞ করে সাপটিকে তাড়িয়ে মধুবাবুদের ভয়মুক্ত করবে। রামতণু প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছে হাসু ঠাকুরকে। সন্ন্যাসীরও মধুবাবুর বাড়িতে রামতনুর যাতায়াত পছন্দ নয়।

সুচতুর হাসু ঠাকুর মধুবাবুকে দিয়ে কার্বলিক অ্যাসিড ও বেজী আনায় এবং পাশাপাশি সর্পযজ্ঞেরও আয়োজন করে। বেজীটি ছোট বড় বেশ কয়টি সাপকে ছিন্ন ভিন্ন করল সঙ্গে মারল সন্ন্যাসী গোখরাটিকেও। কিন্তু এই গোখরাটি যে মনোরমার ভায়ের কারণ বাস্তু সাপটি নয়, তা প্রমাণ হল পরের একটি ঘটনায়। কিন্তু বেজীর সর্প-নিধনে মধুবাবু এবং মনোরমা ভাবল হাসু ঠাকুরের সর্পযজ্ঞেই বেজীটি সাপগুলোকে বিশেষত: সন্ন্যাসী গোখরাটিকে হত্যা করেছে। সরল এই বাঙালী দম্পতি সর্পভয় মুক্ত হল, তাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি বাড়ল সন্ন্যাসী হাসু ঠাকুরের ওপর।

এদিকে ভয়মুক্ত মধুবাবু দু-এক দিনের জন্য কোডারমা গেলেন বাড়িতে মনোরমা এবং হাসু ঠাকুরকে রেখে। সেদিন শেষরাতে মনোরমার আর্ত চিৎকারে রামতনুসহ অন্যান্যরা লাঠি হাতে ছুটে যায় এবং মনোরমার বন্ধ ঘরের জানালা ভেঙ্গে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে।

> টিম টিম করে একটা তেলের পিদিম জ্বলছে। বিছানার উপর বসে থর থর করে কাঁপছে মনোরমা। আর যেন একটা বিভীষিকার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।
>
> ঘরের ভিতরে মেঝের উপর এক ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছেন হাসু ঠাকুর, আর ভয়ানক ক্রুদ্ধ রুষ্ট ও বিরক্ত সেই সন্ন্যেসী গোখরো ফণা তুলে হাসু ঠাকুরকে থামিয়ে রেখেছে। এক পা এদিক ওদিক নড়তে পারছেন না হাসু ঠাকুর। নড়লেই ফণা তুলে ছোবল দিতে চায় নিষ্ঠুর দৃষ্টি সেই সন্ন্যেসী গোখরো।[১৭৮]

হাসু ঠাকুর উপস্থিত সবাইকে কাতর আবেদন জানায় তাকে বাঁচানোর জন্য। রামতনু হাসু ঠাকুরের

হাত শক্ত করে চেপে ধরতেই বাস্তু সাপটি মাথা নীচু করে, এবং আস্তে আস্তে স্থানটি ত্যাগ করে চলে যায়। রামতনু হাসুকে তার কাছারি ঘরে নিয়ে যায় বন্দী করে। ইতিমধ্যে কাছারীকে এসে হানা দেয় এক পুলিশ দল। তারা হাসু ঠাকুরকে বলৎকার, ডাকাতি এবং জোচ্চুরির পালাতক আসামীরূপে সনাক্ত করে।

গল্পটিতে লেখক দেখিয়েছেন কোন মানুষ নয় একটি গোখরা বাস্তু সাপ সময়মত উপস্থিত হয়ে, কাউকে হত্যা না করে, এক গৃহবধুকে তার সম্ভাব্য শ্লীলতাহানি থেকে রক্ষা করেছে। সাপটি হাসু ঠাকুরের ভন্ডতার মুখোষ খুলে দিয়ে, অহিংসভাবে মানুষের এক কঠিন সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছে। সভ্য সমাজের এক অসভ্য মানুষকে শায়েস্তা করেছে কোন মানুষ নয়, এক বিষধর সাপ।

'মিঠুয়া জঙ্গলের সবই মিষ্টি' এই পর্যায়ের গল্পগুলোর মধ্যে এটি একটু ভিন্নতর। জঙ্গলের গাছ, ফুল, পাখির কলতানে এমনকি জঙ্গলবস্তীর মানুষগুলো সবাই যেন একই সুরে বাঁধা। সর্বত্র অখন্ড শান্তি বিরাজ করে। বস্তির নামও মিঠুয়া। সব মিষ্টি, সবাই মিষ্টি, এক মিষ্টি বাতাবরন। রামতনু তসীলের কাজে এখানে বদলি হয়ে এসেছে। দুটি পরিবারের কথা এই গল্পে বলা হয়েছে। কাছারির ভান্ডারী যুগলবাবু এখানে সপরিবারে বিশ বছর ধরে রয়েছেন, অন্য পরিবারের কর্তা ভরতবাবু স্ত্রী পুত্র নিয়ে রয়েছেন ত্রিশ বছর ধরে। যুগলবাবুর বিশ বছরের মেয়ে বিমলা মিঠুয়ার পরবিেশের সঙ্গে একাত্ম। ভরতবাবুর ছেলে মনোহর রামগড়ে গুপ্ত কোম্পানির তদারক মুহুরির কাজ করে। পরেশনাথ এক সুবেশ শহুরে যুবক, মিঠুয়ার সব বাঁশঝাড় কিনে সপার্ষদ এসেছেন বাঁশের হিসেব নিকেশ করতে।

যদিও গল্পটি বিমলার বিয়ে সংক্রান্ত, তবুও আস্ত গল্পটি মিঠুয়ার বিভিন্ন ধরনের পাখির ডাক, এবং পাখিদের ডাকে মিঠুয়া বস্তীর মানুষের প্রতিক্রিয়া নিয়ে আবর্তিত হয়েছে।

যুগলবাবু মেয়ের বিয়ে নিয়ে তার দু:শ্চিন্তার কথা রামতনুকে জানায়। তার চিন্তা বিমলার বাইরে কোথাও বিয়ে হলে, অবশ্যই তার কাছে ফিরে আসবে, কারণ একমাত্র মিঠুয়া ছাড়া অন্য কোন যায়গার পরিবেশের সঙ্গে সে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারবে না।

যুগলবাবু হঠাৎ লক্ষ করে তার বাড়ির চালের ওপর পাখির বাসা ছেড়ে এক নীলকন্ঠ পাখি আকাশে অনেক উঁচুতে উড়তে থাকে। আনন্দিত হয়ে ওঠে যুগলবাবু। কারণ পাখিদের মধ্যে দীর্ঘদিন বাস করে তার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, নীলকন্ঠ পাখির এই আচরণ অত্যন্ত শুভ লক্ষণ। 'শিগগিরই এক শুভ ঘটনা ঘটবে'। এরপর একদিন সারাক্ষণ ধরে ডাকল এক কুটুম পাখি 'কুটুম আয়, কুটুম আয়'। আবার উল্লসিত হলেন যুগলবাবু এক কুটুম্বিতার আশায়। সন্ধ্যে হতেই যুগলবাবু রামতনুকে জানালেন কুটুম পাখির ডাক সার্থক হয়েছে। ভরতবাবু নিজে এসে তার ছেলে মনোহরের সঙ্গে বিমলার বিয়ের প্রস্তাব করেছেন।

এরমধ্যে পরেশনাথ বিমলার প্রতি আসক্ত হয়, একতরফাভাবেই। মনোহরের সঙ্গে বিমলার প্রস্তাবিত বিয়ে ভাঙার চক্রান্ত করে সে। যুগলবাবুকে এক বেনামী চিঠিতে সাবধান করে বলা হয়, বিয়ে চুড়ান্ত করার আগে তিনি যেন অবশ্যই জেনে নেন, মনোহরের ক্ষয়রোগ আছে কিনা। ভরতবাবুকে অন্য একটি বেনামী চিঠিতে বলা হয় যুগলবাবুরা জাতে ছোট। তাছাড়া বিমলা ডাইন বিদ্যা শিখে মনোহরকে বশ করেছে। স্বাভাবিকভাবেরই বিয়ের প্রস্তাব আর এগোতে পারে না। কিন্তু এই চক্রান্ত এক পাখির ডাকেই তুচ্ছ হয়ে পড়ে। দুই পরিবারের মানুষই একদিন শুনতে পায় একটি পাখি অনবরত ডাকছে — 'বৌ কথা কও'। পাখির এই ডাককে বিয়ের মাঙ্গলিক সংকেত মেনে নিয়ে দুটি পরিবার পরম নিশ্চিন্ত হয়ে বিমলা ও মনোহরের আশীর্বাদের দিন স্থির করে। বিয়েও হয়।

কিন্তু ফুলশয্যার দিন আবার এক বেনামী চিঠি ভরতবাবুর পরিবারকে ভাবিয়ে তোলে। এবারের

চিঠিতে বলা হল, বিমলার এক অদ্ভুত রোগ আছে সে কোনদিন মা হতে পারবে না। কিন্তু এ চিঠিও পরাস্ত হয়। এক হলদে বেনে বউ পাখি ডেকে ওঠে 'গৃহস্থের খোকা হোক'। এক অঘোষিত যুদ্ধে পরাজিত পরেশনাথ হাল ছাড়বার পাত্র নয়। সে বিমলাকে পুড়িয়ে মারার প্রস্তুতি নেয়। এক টিন কেরোসিন তেল নিয়ে বেরোবার মুখেই ডেকে উঠল অন্য এক পাখি, পেঁচা। 'তুই থুলি কি মুই থুলি'। পেঁচার গম্ভীর গলার স্বরে ভয়াল ভর্ৎসনার বুলিতে বুক কেঁপে ওঠে পরেশনাথের, আর্তনাদ করে ওঠে সে। রামতনু ছুটে যায়। রামতনুর জেরায় পরেশনাথ স্বীকার করে তার চক্রান্তের কথা। গভীর আগ্রহে পরেশনাথ জানতে চায়- 'তুই থুলি কি মুই থুলি' ডাকের অর্থ। রামতনু জানায়, পেঁচার এই ডাকের অর্থ 'তুই জিতলি কি মুই জিতলি'।

প্রকৃতপক্ষে, এই গল্পে সুবোধ ঘোষ জিতিয়ে দিয়েছেন, পাখির বোলকে, বনের পাখির সঙ্গে প্রকৃতিকে ভালবাসা একদল শান্তিপ্রিয় মানুষের একাত্মতাকে।

শ্রীমতী নিনা ভরদ্বাজ ও হরিণী গল্পে নর-নারীর প্রেমের সঙ্গে হরিণ ও হরিণীর প্রেমের তুল্যমূল্য বিচার করে আবারো লেখক বনের পশুকেই জিতিয়ে দিয়েছেন এক মনোগ্রাহী কাহিনীর মধ্য দিয়ে। প্রেমের ক্ষেত্রে মানুষের হৃদয়হীনতা কখনো কখনো যে বনের পশুকেও অতিক্রম করে যায়, এই সত্যটিই তিনি গল্পটির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

ছতরপুরা মৌজার ছতরপুরা জঙ্গল গল্পটির প্রেক্ষাপট। রামতনু এ মৌজারও তসীলদার। দুই অকৃত্রিম বন্ধু জগদীশ ও দিবানাথ নিনা ভরদ্বাজের প্রণয়প্রার্থী হয়ে একে অন্যের প্রধান শত্রু হয়ে উঠেছে। অপরূপা নিনা দুজনের সঙ্গেই প্রেমের অভিনয় করে। অগাধ পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী এই দুই যুবক পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে ওঠে নিনাকে জয় করতে। একদিন তারা দুজনেই কপর্দকশূন্য হয়। নিনা দুজনকেই আলাদাভাবে জানায় তিনমাসের জন্য সে লন্ডনে বেড়াতে যাবে এবং ফিরে এসেই সে বিয়ের বিষয়ে একটা 'হেস্তনেস্ত' করবে। তার এই সফরের জন্য পাঁচ হাজার টাকা একান্ত প্রয়োজন। দুজনকেই বলে টাকাটার জন্য চিন্তা না করতে — 'যে করেই হোক, আমার বিলেত যাবার ওই সামান্য টাকাটা জোগাড় হয়ে যাবেই'। জগদীশ সন্দেহ করে সে টাকাটা নিনাকে দিতে না পারলে দিবানাথ নিশ্চই সে সুযোগ নেবে। দিবানাথও একই সন্দেহ করে জগদীশকে।

দুজনেই ছতরপুরার নিজ নিজ অভ্র খনিটি তিন হাজার টাকা দরে বিক্রী করে একে অন্যকে না জানিয়ে নিনাকে এনে দেয় এবং প্রত্যেকেই অনুরোধ করে 'একটু সবুর' করতে বাকি দু'হাজার জোগাড় করে দেবে। নিনা সম্মত হয় অপেক্ষা করতে। জগদীশ ও দিবানাথ সহায় সম্বল হারিয়ে বাধ্য হয় চাকরী করতে। নিজ নিজ খনির হিসেব রাখে তারা মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে। ওরা পাশাপাশি বসে কাজ করে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, কারণ দু'হাজার টাকা জোগাড় করে নিনার কাছে দেওয়া প্রতিশ্রিতি রাক্ষা করা উভয়ের পক্ষেই একান্ত অসম্ভব।

একই ধরণের ত্রিকোন প্রেমের দৃশ্য ছতরপুরার জঙ্গলে। এক হরিণীর প্রেমে উন্মত্ত দুই চিতল হরিণ তাদের মাথায় প্রকান্ড দুটি শিঙ এর ঝাড় নিয়ে একে অন্যকে আক্রমণ করে, আর সুন্দরী হরিণীটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করে তার প্রেমিক যুগলের মারাত্মক হানাহানির দৃশ্য। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে হরিণ দুটি লড়তে থাকে বার-তের দিন ধরে। হঠাৎ একদিন তাদের শিঙ এর ঠেকাঠুকির শব্দ বন্ধ হয়। রামতনুরা গিয়ে দেখে দুজনের শিঙ এ এমনভাবে জড়াজড়ি হয়ে গিয়েছে যে শত টানাটানি ও ঝাঁকুনিতেও তা খলছে না। ওদের পক্ষে সরে যাওয়া কিংবা পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। ঠিক জগদীশ ও দিবানাথের মত। হরিণীর প্রেমে যুদ্ধরত দুই হরিণের এভাবে পরস্পরের সঙ্গে আটকে যাওয়া এবং নিরুপায় হয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা, জগদীশও দিবানাথের বাস্তব অবস্থারই প্রতিকী বর্ণনা। একটি বাঘ এসে শিকার

করল প্রেমিক যুগলকে। কিন্তু তখনও তাদের শিঙ-এর জট খোলেনি। সবাই সবিস্ময়ে লক্ষ করল সেই সুন্দরী হরিণী করুণ চোখে প্রত্যক্ষ করছে তার দুই প্রেমিকের করুণ পরিণতি। এরপরই হরিনীটি লাফ দিয়ে তার এক নতুন প্রেমিক হরিণের সঙ্গে গভীর বনে ছুটে পালাল।

দৃশ্যটি দেখে জগদীশ এবং দিবানাথ আশান্বিত হয়ে ওঠে। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে নিনা ভরদ্বাজও হয়ত হরিণীটির মতই একবার অন্তত: তাদের অবস্থাটা দেখতে আসবে। ইতিমধ্যে খনির মালিক ব্যবসায়ে মন্দার কারণে খনির কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। সামান্য চাকুরীটিও হারায় দুজন। তবুও তারা ছতরপুরায় বসে থাকে নিনার অপেক্ষায়। নিনা আসে তার পদস্থ স্বামীর সঙ্গে। ভদ্রলোকের শিকারের জন্য মাচান তৈরী করা হলো। নিনা আসে তার স্বামীর সঙ্গে। দুই বন্ধু অপেক্ষায় থাকে নিনাকে একবার দেখার জন্য। কিন্তু তাদের আশায় ছাই ঢেলে নিনা স্বামীসহ ফিরে যায় জঙ্গলের পাখিদের ছবি তুলে। জগদীশ, দিবানাথ এবার সত্যিই ছেড়ে যায় ছতরপুরা।

হরিনীটির মধ্যে তার প্রেমিক দুজনের জন্য যে সামান্য মমতা বা করুণা অবশিষ্ট ছিল, যার টানে করুণ চোখে সে প্রেমিক হরিণ দুটির কঙ্কাল দেখেছে একান্তে দাঁড়িয়ে, নিনার অন্তরে সেই মমত্বটুকুও অবশিষ্ট ছিল না। প্রেমের হৃদয়হীনতায় মানুষ হার মানিয়েছে পশুকে। মানবিক প্রেম পরাস্ত হয়েছে পশুর প্রেমের কাছে।

'জগনপুরের দীপালি রায়' এবং 'শ্রীমতী নিনা ভরদ্বাজ ও হরিণী' গল্প দুটির বক্তব্য মূলত এক। দুই গল্পেই মানুষের প্রেম তার হৃদয়হীনতার জন্য পশুর প্রেমের কাছে পরাজিত হয়েছে। উভয় গল্পেই লেখক সমাজবদ্ধ মানুষকে, জীবকুলে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার মানুষকে, তার হৃদয়ধর্মের জন্য জঙ্গলের পশুর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন।

জগনপুরের দীপালি রায় গল্পের ত্রিকোণ প্রেমের নায়িকা। দীপালি তার চাইতে প্রায় দশ বছরের ছোট স্বাস্থবান এবং উচ্চবিত্ত অনিমেষকে প্রেমের ফাঁদে বন্দী করে তাকে কপর্দকশূণ্য করেছে। পরে ঐ এলাকার অন্য এক বিত্তবান যুবক সোমনাথকে বিয়ে করেছে। অনিমেষের সম্পত্তি হারানোর জন্য কোন ক্ষোভ বা আক্ষেপ নেই। দীপালি সোমনাথকে বিয়ে করাতেও অনিমেষের আপত্তি নেই। কিন্তু যে বিষয়টি তাকে অত্যন্ত মর্মাহত করেছে, তা হলো, অনিমেষ প্রায় দেড় মাস অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে থাকার সময়, বহু অনুরোধেও, দীপালি তাকে একবারও দেখতে যায়নি। যে দীপালিকে ভালবেসে অনিমেষ তার সমস্ত অর্থ ও স্থাবর সম্পত্তি দীপালির মা-বাবার হাতে তুলে দিয়েছে, সেই দীপালীর এ হেন হৃদয়হীনতায় অত্যন্ত মুষড়ে পরেছে অনিমেষ।

মানুষকে পশুর সঙ্গে তুলনা করার জন্য গল্পটিতে পশুরাজ্যে একই রকম একটি ত্রিকোন প্রেমের ছবি এঁকেছেন লেখক। ভেলাডিহির জঙ্গলের ভেতর এক ডাঙা জমির দখল নেবার জন্য লড়ছে, দেশী বাইসন এবং গাউরের দুই দল। উপযুক্ত স্থানে মাচান বেঁধে ক'জন শিকারী, রামতনু, ভান্ডারী পুষ্করবাবু এবং দীপালির পরিত্যক্ত প্রেমিক অনিমেষ দেখছে জঙ্গলের পশুর জমি দখলের লড়াই।

> এর শিং এর উন্মত্ত আঘাতে ওর শিং ভেঙে পড়েছে। ঘায়েল কপালের পাশে ঝুলছে ভাঙা শিং। ডাঙাজমির শুকনো ধুলো রাগী গাউরের ক্ষুরের ঘষা খেয়ে ছোট-ছোট ঘূর্ণির মতো উড়ছে আর ঘুরছে।...[১৭৯]

একটি গাউর দলের বিতাড়িত দলপতি আমলকি ঝোপের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে সেই যুদ্ধের ভয়ানক দৃশ্য। তার এক পা খোঁড়া, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। একটা চোখও গলে গিয়েছে। নড়বড় করছে করছে মাথার শিঙ দুটো। তার পিঠের ওপর এক দগদগে ঘা, যন্ত্রণায় কেঁপে কেঁপে উঠছে

মন্দা গাউরের মস্ত, দুর্বল দেহ। বিতাড়িত এই গাউর দলপতি যেন অনিমেষেরই প্রতীক। নতুন দলপতি এই বিতাড়িত দলপতির সঙ্গিনীকেও অধিকার করে নিয়েছে। হঠাৎ দেখা গেল সেই সঙ্গিনী আস্তে আস্তে দল থেকে বেড়িয়ে এসে আমলকি ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা সেই বিতাড়িত, অসুস্থ এবং পূর্বসঙ্গী গাউরের কাছে এসে গভীর মমতায় তার গলার কাদার দাগ চেটেপুটে পরিস্কার পরে দিল। 'বিশ্বাস করলে বোধ হয় ভুল হবে না গাউর সঙ্গিনী যেন তার পুরনো সঙ্গীর অসহায় একলা ও দু:খী জীবনটাকে সান্তনা দিচ্ছে।' হঠাৎ গাঁ-গাঁ-গাঁ ডাক ছাড়ে নতুন দলপতি। 'চমকে উঠল গোপনচারী মাদি গাউর, তারপর দুরন্ত বেগে দৌড় দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।'

অনিমেষ উপলব্ধি করে, তার অসুস্থতার খবর শুনে, দশ-দশটি চিঠি পেয়েও দীপালি একবারও দেখতে আসেনি তাকে। অথচ অসহায় এই গাউরের পুরনো সঙ্গিনী তার পুরনো সঙ্গীকে কী চমৎকার স্বান্তনা দিয়ে চলে গেল। যে অনিমেষ জঙ্গলে থাকার জন্য বহুবার রামতনুকে কটাক্ষ করেছে, লোকালয় বর্জিত হয়ে বেঁচে থাকাটাকে দুর্বিসহ মনে করেছে, সেই অনিমেষই গল্পের শেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সে তার বাকি জীবন রামতনুদের সঙ্গে জঙ্গলেই কাটিয়ে দেবে। কারণ জঙ্গলের পশুদের মধ্যেও যে মমত্বটুক অবশিষ্ট আছে, তা মানুষের মধ্যে নেই।

মধুগঞ্জের সুমতি গল্পে মানুষ প্রেমের পাঠ নিয়েছে পশুর কাছে। রায়সাহেব মহাদেব চৌধুরীর সুন্দরী মেয়ে সুমতি। সে 'সধবা হয়েও একরকমের বিধবা'। সুমতির স্বামী শশিনাথ মেধাবী, বি এ'র ছাত্র কিন্তু গরীব। মেধাবী শশিনাথকে সুমতির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঘর জামাই করে রেখেছিলেন রায়সাহেব। কিন্তু তার আশায় ছাই ঢেলে শশিনাথ যক্ষা রোগাক্রান্ত হলো। সুন্দরী সুমতি বাবার অনুরোধে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে একবার মাত্র দেখে আসে যক্ষারোগী স্বামীকে। নেহাতই কর্তব্যের খাতিরে। সে যায় রোগীর ঘরের দরজা পর্যন্ত। চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের ভেতর পা দেয় না শশিনাথের শত অনুনয়েও।

পাশাপাশি রয়েছে এক উটের গল্প। উটটির নাম বাহাদুর। রায়সাহেব উটটি কিনেছিলেন জঙ্গলের পথে মালপত্র পরিবহনের জন্য। কিন্তু অদ্ভুত এই বাহাদুরের চরিত্র। সে তার চালক মোহনকে ছাড়া এক পা নড়ে না। রায়সাহেব বাধ্য হয়েই মোহনকেও নিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গেই বাহাদুর কাজে নেমে পড়ে, রায়সাহেবের দু:শ্চিতা দূর হয়।

এদিকে তসীলদার রামতনু সুমতির এক পরিবর্তন লক্ষ করে। রায়সাহেবের বাড়িতে নতুন নিযুক্ত গৃহশিক্ষক জয়দেবের প্রতি সুমতির ভালবাসা প্রগাঢ় হতে থাকে। দীর্ঘদিন পর সুমতির ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে।

একদিন প্রচন্ড ঝড়ে বাহাদুরের চালক মোহন মারা যায়। উট বাহাদুর শোকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে স্থবির হয়ে যায়। কোনভাবেই তাকে নড়ানো সম্ভব হয় না। অনেক ভেবে একটি কুশপুত্তলিকা তৈরী করে, তাকে মোহনের পোষাক পরিয়ে বাহাদুরের কাছে রাখলে, বাহাদুর যেন নতুন করে জেগে উঠে। মোহনের কুশপুত্তলিকায় গলাটাকে শুইয়ে দিয়ে আরামের ঘোরে বাহাদুর অনেকদিন পর জাবর কাটতে থাকে। অবাক হয়ে এ দৃশ্য লক্ষ্য করে সুমতি। প্রতিদিন দু'বেলা অনেকক্ষন ধরে উটঘরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে সুমতি। জয়দেব ক্রমশ: বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সুমতির জীবন থেকে।

একদিন মাঝরাতে এক নেকড়ে এসে খড়ের তৈরী মোহনের দেহটাকে টেনে নেবার চেষ্টা করলে, বাহাদুর সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করে। নেকড়ে মোহনের পুতুলটিকে ছিন্নভিন্ন করে এবং শেষে বাহাদুরের পায়ের থেকে মাংস খুবলে নিয়ে যায়। সুমতি এসে গভীর মমতায় মোহনের পুত্তলিকাটি মেরামত করিয়ে দেয়। বাহাদুর গলা বাড়িয়ে মোহনের পুতুল দেহটিকে আদর করে। মোহনের প্রতি বাহাদুরের এই অকৃত্রিক ভালবাসার প্রকাশে সুমতি যেন আছন্ন হয়ে থাকে।

একদিন সন্ধ্যায় অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে সুমতি লক্ষ্য করে বাহাদুরের মুখ জুড়ে রক্ত। জানতে পারে কাঁটা গাছ চিবিয়ে খাওয়ার ফলেই তার মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। আরো বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে সুমতি, পুতুল মোহনের মুখেও সেই একই রক্ত। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সুমতির মনে হয় এ যেন মোহনের মুখে বাহাদুরের 'রক্তমাখা চুমোর ছাপ'। সুমতি ছুটে যায় যক্ষারোগী শশিনাথের ঘরে। শশিনাথের খাটের কাছে দাঁড়িয়ে সুমতি বলে —

– 'আমি ডোমবুড়ি সিধুয়ার মাকে বলে দিয়েছি, তোমার ঘরের কোন কাজ তাকে আর করতে হবে না।
– কেন ? কেন ?
– এই ঘরের সব কাজ এবার থেকে আমিই করবো।'[১৮০]

শশিনাথের রক্তবমি করা ঠোঁটের ওপর সুমতি এক অনাস্বাদিত তৃপ্তিতে চুমো এঁকে দেয়। ভালবাসার গভীরতার কাছে দেনা-পাওনার হিসেব, প্রেমাস্পদের সুস্থতা অসুস্থতার প্রশ্ন, সক্ষমতা-অক্ষমতার যুক্তি-তর্ক যে একান্তই তুচ্ছ – এই গল্পটিতে সেই শিক্ষাই এক মানবী গ্রহণ করেছে বোবা পশুর কাছ থেকে।

সুবোধ ঘোষ সম্পর্কে এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ রয়েছে যে-তিনি অবশ্যই তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার এমন কিছু প্রেমের ঘটনা দেখেছিলেন, যার অমানবিক দিকগুলো তাঁর অন্তরকে আলোড়িত করেছিল। সেই আলোড়িত হৃদয়ে, আশাহত লেখক প্রকৃত ভালবাসার সন্ধানে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন বনের পশু-পাখির সহজ-সরল জীবনযাত্রার প্রতি। তাঁর সেই সন্ধানী দৃষ্টিতে তিনি পশুদের মাঝেই খুঁজে পেয়েছেন ছল-চাতুরিহীন, নিঃস্বার্থ ভালবাসা। লেখক সমাজবদ্ধ, বুদ্ধিমান মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন তার হৃদয় ধর্মের বিচ্যুতি এবং পরামর্শ দিয়েছেন, প্রয়োজনে পশুর কাছেও শিক্ষা নিতে।

জগমোতির পাহাড়ী ময়না গল্পে লেখক সভ্য ও বিত্তবান মানুষের হিংস্রতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার মুখোশ খুলে দিয়েছেন। বন্ধুত্বের ঢাক পিটিয়ে, সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমান লোপাট করে, একুশ টাকা বেতনের লেবেল-ক্রসিং-এর চৌকিদার বন্ধু কাশীলালকে হত্যা করেছে জমিদারের একমাত্র ছেলে নবল। নবলের বন্ধুপ্রীতির নিখুঁত অভিনয়ে, এই হত্যাকান্ডের জন্য কেউ তাকে সন্দেহ করে নি, এমন কি পুলিশও নয়। কারণ কাশীলালকে হত্যা করার পরও নবল তার বন্ধুপ্রেমের পরাকাষ্ঠা বজায় রেখেছিল। নবলের এই হত্যাকান্ডের সাক্ষী ছিল না কোন মানুষ। কিন্তু সাক্ষী ছিল কাশীলালের স্ত্রী জগমোতির পোষা এক পাহাড়ি ময়না। এক উপযুক্ত মুহূর্তে সেই ময়নার বুলি– 'এ নবল ভাই, মত্ মারো, মত্ মারো', নবলকে খুনী হিসেবে চিহ্নিত করে। নবল গ্রেপ্তার হয়।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, 'পশু-প্রেম-প্রকৃতি' পর্যায়ে প্রকাশিত গল্প দশটিতেই অন্যতম প্রধান চরিত্র রামতনু। এই রামতনু প্রকৃত অর্থে লেখকের প্রতিভূ যার মধ্যে লেখক খুঁজে পেয়েছেন তাঁর প্রথম যৌবনের দিনগুলি। গল্পগুলোতে লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই, যেখানে অন্যায়, অত্যাচার হয়েছে, সেখানেই রামতনু সাধ্যমত প্রতিবাদ করেছে। রামতনু জঙ্গলঘেরা প্রকৃতিকে মন-প্রাণ দিয়ে উপভোগ করেছে, আবার যখনই শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশকে স্বার্থপর মানুষ নষ্ট করতে চেয়েছে, রামতনু ব্যথিত হয়েছে।

লেখক তাঁর জীবন সায়াহ্নে পরিচিত সমাজের গন্ডী ছাড়িয়ে, বন-জঙ্গল, পশু-পাখিদের নিয়ে গল্প লিখেছেন, সম্ভবত: নাগরিক জীবনের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা হারিয়েই। এ সন্দেহ অমূলক মনে হয় না, যখন লেখক এই গল্পে বলেন —

> রামতনুর জীবনটা তার চিরপ্রিয় যে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে, সেই বিশ্বাস পেয়ে এই চৌকিদার কাশীলালের বুকটা ভরাট হয়ে রয়েছে। যে ভয়ানক শিক্ষা পেয়ে গিয়েছে রামতনুর এই বাইশ বছর বয়সের জীবনটা, সেটা এই যে, মানুষ বন্ধুকে বিশ্বাস নেই। বরং জঙ্গল বন্ধুকে, জঙ্গলের পাখি জানোয়ার সাপ আর পোকামাকড়কেও বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু শহর-মার্কা কলেজ-মার্কা ও ভদ্রলোক-মার্কা বন্ধুত্বকে বিশ্বাস করতে নেই।[১৮১]

ডায়েনা ও মালতী গল্পেও নর-নারীর প্রেমে এই বিশ্বাসের সঙ্কট প্রকট হয়ে উঠেছে। ডায়েনা এক পোষা বাঘিনী, মালতী সুশিক্ষিতা এবং একটি স্কুলের শিক্ষিকা। ঝুমরাটি এস্টেটের জঙ্গলে এক মাসের এক বাচ্চা বাঘিনীকে পোষ মানিয়ে বড় করেছেন, প্রাইস সাহেব। ডায়েনা বড় হয়েছে। ঐ জঙ্গলেরই এক বাঘ ডায়নাকে সঙ্গী হিসেবে পেতে চায়। ডায়েনারও তাকে পছন্দ। প্রাইস সাহেব বিষয়টি লক্ষ্য করেন। তিনি ডায়েনার গলায় একছড়া ঘুঙুর বেঁধে ছেড়ে দেন জঙ্গলে। ডায়েনা নিয়মিতভাবে গভীর জঙ্গলে তার সঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। ডায়েনার ঘুঙুরের সুরেলা শব্দে প্রাইস সাহেব তার আসা যাওয়া বুঝতে পারেন। প্রাইস বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেন, ডায়েনা বিশেষ একটি বাঘের প্রতিই আকৃষ্ট। অন্য বাঘেরা তার পাশে ঘুরে বেড়ালেও ডায়েনার প্রণয় তার পছন্দের সঙ্গীটির প্রতিই সীমাবদ্ধ। ডায়েনার একান্ত পছন্দের এই বাঘটি প্রাইসের বাড়ির কাছে প্রায়ই আসা-যাওয়া করে। বাঘটিকে সহজেই চেনা যায়, তার পিঠের একটি বড় কাটা দাগ দেখে।

ডায়েনার নৈশ অভিসারের সময় তার গলার ঘুঙুরের শব্দে ঐ এলাকার মানুষের মনে নানা ধরণের ভয় ও অলৌকিক তত্ত্ব জেগে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে এই ঘুঙুরের শব্দ-রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যই রামতনু ঝুমরাটি তসীল কাছারিতে বদলি হয়ে এসেছে। এদিকে প্রাইস সাহেবের দুই ছেলে, ডায়েনার পাশে ঘুর ঘুর করা দুটি বাঘকে অতি সহজেই শিকার করে মেরেছে। তবে ডায়েনার প্রেমিক বাঘটি এই শিকারীদের পাল্লায় পড়ে নি। জনশ্রুতি, ডায়েনাই হয়ত তার প্রেমিককে সতর্ক করে দিয়েছিল।

ডায়েনার বিষয়টি জ্যুলজির ফাষ্ট ক্লাস এম এ ডেপুটি কমিশনার সাহেবের গোচরে আসে। তিনি কার্যত, প্রাইস সাহেবকে বাধ্য করেন ডায়েনাকে খাঁচাবন্দী করে লন্ডনের চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দিতে। এ সিদ্ধান্তে প্রাইসের বিশেষ আপত্তি ছিল। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, ঝুমরাটি জঙ্গলের তার পছন্দের সঙ্গী ছাড়া ডায়েনা বাঁচবে না, অন্য কোন বাঘকেই সে সঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে না। প্রাইসের আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হল। লন্ডনে ডায়েনার খাঁচায় একটি সুস্থ সবল বাঘকে সঙ্গী হিসেবে ঢুকিয়ে দেবার পরই, ডায়েনা তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে আক্রমণ করল। অপরিচিত পুরুষ সঙ্গীকে মেনে নেবার পরিবর্তে, তার সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়ে ডায়েনা তার প্রেমের নিষ্ঠা প্রমাণ করল।

গল্পটির অন্য অংশ মালতীকে নিয়ে। মালতীর আশৈশব প্রেমের প্রর্থিত পুরুষ জীবনলাল কাকার সম্পত্তি পাবার আশায় ঝুমরাটিতে মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছে, প্রতিনিয়ত জঙ্গলের জীবনকে শাপ-শাপান্ত করে সে। দেহটি ঝুমরাটিতে থাকলেও তার মন পড়ে থাকে শোনপুরের মালতীর কাছে। জীবনলাল রাতনুর কাছে তার ও মালতীর প্রেমের গল্প করে, মালতীর চিঠি পড়ে শোনায়। মালতী নিয়মিত চিঠি লেখে, তাতে থাকে কাব্যিক প্রেমের প্রকাশ, এবং অদূর ভবিষ্যতে জীবনলালের সঙ্গে ঘর বাঁধার প্রতিজ্ঞা। প্রকৃতপক্ষে মালতীর নিয়মিত এ চিঠির মালাই জীবনলালের ঝুমরাটিতে বেঁচে থাকার একমাত্র রসদ। জীবনলাল রামতনুকে বলে — আমার স্বপ্ন হলো মালতী; তেমনই মালতীর স্বপ্ন হলো এই জীবনলাল'। একদিন মালতীর এক চিঠি জীবনলালকে ঠারেঠুরে জানিয়ে দিল মাত্র দু-মাস পরেই বিয়ে। উচ্ছসিত জীবনলাল। তার এই উচ্ছাস বাঁধ ভাঙার রূপ নিল যখন তার কাকাবাবু চিঠি দিয়ে জানালো যে মালতীর বাবাকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে যে বিয়েটা ফাল্গুনেই হয়ে যাক, দেরী করার কোন মানে হয় না।

জীবনলালকেও চিঠিতে বলা হয়েছে যে আর জঙ্গলে পড়ে থাকবার দরকার নেই। কিন্তু ঐ ফাল্গুনেই মালতী সাসারামের কালেক্টর অম্বিকা প্রসাদকে বিয়ে করে বসল। মালতী কেন এমন একটা বিশ্রী কান্ড করে বসল জিজ্ঞাসা করায়, জীবনলাল বলে —

> মালতীতো ডায়েনার মতো ঝুমরাটি জঙ্গলের একটা বাঘের মেয়ে নয়।
> মালতী হলো, শোনপুরের মানুষ রায়বাহাদুর নাগেশ্বর প্রসাদের মেয়ে।[১৮২]

সুবোধ ঘোষ এই গল্পে স্পষ্টতই একজোড়া বাঘ-বাঘিনী এবং এক জোড়া নারী পুরুষের প্রেমের তুলনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রেমের নিষ্ঠার ক্ষেত্রেও মানুষের যে ধরণের বিচ্যুতি ঘটছে, তার ফলে জঙ্গলের পশুর কাছেই মানুষের শিক্ষা নেওয়া শ্রেয়। শিক্ষিত মানুষের চরিত্রের প্রতি লেখকের অনাস্থা প্রকট হয়েছে এই গল্পে।

হরেন বাবুর হরিণী মেয়ে গল্পটিতেও সুবোধ ঘোষ মানুষ ও পশুর তুলনামূলক বিচারে পশুপ্রেমের জয়গান করেছেন। মনোকাকিমা এক সদ্যজাত হরিণী শিশুকে সন্তানস্নেহে প্রতিপালন করেছেন ছোট ছাড়োয়ার জঙ্গলবস্তিতে। হরিণীটির নাম রেখেছিলেন বুড়ি। বুড়ি বড় হয়। মায়ের মন নিয়ে মনোকাকিমা বুঝতে পারেন এবার বুড়ির একটি সঙ্গী প্রয়োজন। পাত্রস্থ করার জন্য পাত্র খুঁজতে তাকে জঙ্গলে যেতে হয়নি। হরেনবাবুর বাড়ির সীমানা ঘেঁসে প্রায়ই একটি হরিণ এসে দাঁড়ায়, আর বুড়িও যেন কেমন উতলা হয়ে ওঠে। কিন্তু দরজা খুলে দিলেও বুড়ি বাড়ীর সীমানা ছাড়িয়ে যায় না। মনোকাকিমার বিশ্বাস জন্মে মানুষের মত আনুষ্ঠানিকভাবে পাত্রস্থ করলেই বুড়ি তার হরিণ সঙ্গীকে নিয়ে বনে যাবে। কাকীমার মনে সর্বদা ভয়, শিকারী সেনবাবুর বন্দুক বুঝিবা গর্জে ওঠে। সেনবাবুকে বন্দুক চালনা থেকে বিরত রাখার উপায় খুঁজতেই কাকিমা খবর দিয়ে তসীলদার রামতনুকে বাড়িতে এনেছেন।

রামতনুর অনুরোধ গ্রাহ্য করেন না সেনবাবু। হরিনীকে মেয়ে বলে বড় করা এবং তাকে পাত্রস্থ করার চিন্তা তার কাছে উদ্ভট বলে মনে হয়। বরং রামতনুকে তিনি শুনিয়ে দেন যে তার মেয়ে, নীতার শিগ্‌গীরই বিয়ে হবে এক লাখপতির ছেলে রতন সামন্তর সঙ্গে। রতন নীতার প্রতি এত মুগ্ধ যে তাকে বিয়ে করার জন্য প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে। সেনবাবু ঠিক করেছেন নীতার বিয়ের দিন বুড়ির প্রেমাস্পদ হরিণটিকে শিকার করে, তার মাংসের নানারকম পদ রান্না করবেন।

হঠাৎ সে রাতেই মনোকাকিমা বুড়িকে আনুষ্ঠানিকভাবে পাত্রস্থ করার সিদ্ধান্ত নেন। রামতনু উপস্থিত থাকে। উঠোনের ওপর বেশ বড় একটা রঙ্গোলি আঁকেন কাকিমা। তার ছেলে মনু নিজ হাতে হরিণী বোনের কপালে লাল চন্দনের টিপ এঁকে দেয়। প্রতিবেশীর ছেলে ভিকু শাঁখ বাজায়। বুড়ির জঙ্গলে যাবার পথ তৈরী করে দেওয়া হয়েছিল। পথের পাশে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে ছিল, পাত্র স্বয়ং, বুড়ির প্রেমিক হরিণ। অনুষ্ঠান শেষে বুড়ি তার সঙ্গীকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় বনে। হরেনবাবু যিনি এতক্ষন একটি কথাও বলেন নি, এবং নীরব থাকার জন্য 'কসাই বাপ' বলে মনোকাকিমার গালমন্দ সহ্য করেছেন, তিনি 'বুকফাঁটা চিৎকারের মত শব্দ করে কেঁদে উঠলেন'।

কিন্তু রামতনু চিন্তিত হয় অন্য কারণে। বুড়ি সঙ্গীকে নিয়ে বনে চলে যাচ্ছে দেখে একরোখা সেনবাবুর বন্দুক যদি গর্জে ওঠে ! কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে খালি হাতে সেনবাবু এলেন হরেনবাবুর উঠোনে। জানতে চাইলেন — 'মেয়েকে বোধহয় বিদায় করা হয়েছে ? তিনি হরেনবাবুর হাত ধরে সান্ত্বনা দিলেন, এবং বললেন — 'আমার খুব শিগগির মেয়ে বিদায়ের কান্না কাঁদবার সৌভাগ্য হবে না'। কারণ হিসেবে জানালেন, কলকাতার এক অ্যাটর্নীর মেয়ের সঙ্গে রতন সামন্তর বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

এই দশটি গল্প ছাড়াও 'বাবু রতন রায়ের ঘোড়া', জঙ্গল প্রেমিক উড সাহেব, বসুবৈধ কুটুম্বকম এবং চেতনপুরার বিশব হ্যাটো গল্পে পশুজগতের সহজ সরল আচরণের পাশাপাশি মানুষের জীবনে

আচরনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসঙ্গতি লেখক তুলে ধরেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই গল্পগুলো যেন মানুষের স্বার্থপরতা ও অনৈতিকতার বিরুদ্ধে লেখকের চরম সতর্কবাণী।

সুবোধ ঘোষের অন্যান্য ছোটগল্পের তুলনায় এই গল্পগুলো অবশ্যই ভিন্নধর্মী এবং একমুখী। অন্যান্য গল্পগুলোতে ছোটগল্প রচনার যে আদর্শ, রীতিকৌশল রয়েছে, পশু সম্পর্কিত এই গল্পগুলোতে সেই বিশেষত্ব অনুপস্থিত। কারণ, মনে হয়, লেখক মানুষের প্রতি, মানুষের আচরণের প্রতি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েই তাঁর বক্তব্য সিদ্ধান্ত এবং জীবনাভিজ্ঞতায় অর্জিত নিজস্ব বিশ্বাস গল্পবন্দী করেছেন মাত্র। পশু-প্রকৃতি-প্রেম পর্যায়ের এই গল্পগুলো রচনার পেছনে সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদ অপেক্ষা তাঁর উপলব্ধ সত্য প্রকাশের তাগিদই প্রাধান্য পেয়েছিল ধরে নিলে, বোধহয় অন্যায় হবে না।

নয়

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে সুবোধ ঘোষের এমন কিছু রচনা আছে যেগুলোকে ঠিক উপন্যাস বলা চলে না আবার ঠিক ছোটগল্পও নয়। তবে রচনাগুলো ছোটগল্পের অনেকটা কাছাকাছি। যদিও এ ধরণের গল্পের এক অস্পষ্ট ইঙ্গিত বঙ্কিমচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রের রচনাতেও লক্ষ্য করা যায়, তবুও এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে বড়োগল্পের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে আধুনিককালের বাংলা সাহিত্যিকদের রচনাতেই। বড়োগল্পের শুরু এবং শেষ ছোটগল্পের মত হলেও, বড়োগল্পে এমন কিছু পার্শ্বচরিত্রের সন্নিবেশ ঘটানো হয়, যে চরিত্রগুলো মূল কাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত না হলেও, প্রয়োগ নৈপুণ্যে, গল্পটির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই মনে হয়। এই প্রসঙ্গেই সৌমেন্দ্রনাথ সরকার বলেছেন —

> বৃক্ষশাখার অগ্রভাগে স্তবকিত পুষ্পসম্ভার তার বৃন্তদেশের পত্রশোভায় যেমন বহুগুণ সৌন্দর্যান্বিত হয়ে ওঠে, অথচ সেই পত্রশোভা পুষ্পস্তবকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়, এই ঘটনা ও চরিত্রগুলিও তেমনি মূলকাহিনীর বিকাশকে ত্বরান্বিত বা বিলম্বিত না করলেও প্রয়োগনৈপুণ্যে কাহিনীর সৌন্দর্যমহিমাকে বহুগুণান্বিত করে তুলেছে।[১৮৩]

সুবোধ ঘোষের 'জিয়া ভরলি' (১৯৬৩) এবং বাসরদত্তা (১৯৭০) এমনই দুটি বড়োগল্প। সুবোধ ঘোষের অকৃত্রিম ভারতীয়তা এবং দেশাত্মবোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'জিয়া ভরলি'। ১৯৬২ সালে চীন ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধের ঠিক পরই সুবোধ ঘোষ উত্তর পূর্ব সীমান্তের নেফা অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। অবহিত হন ঐ অঞ্চলের মানুষ, তাদের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে। নেফা অঞ্চল পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতাতেই পরিপুষ্ট হয়েছে এই গল্পটি।

আসামের 'কদমবাড়ি' চা-বাগানের মালিক গগন বসু অনেক দেখে শুনে তার দুই মেয়ে অঞ্জনা এবং অর্চনার বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মেয়েরা সুখের মুখ দেখতে পায় নি। 'অঞ্জনা এখন মীরাটের এক মেয়ে স্কুলের টীচার, পঁচাশি টাকা মাইনে পায়, মেয়ে স্কুলের হোস্টেলেই থাকে অঞ্জনা। আর অঞ্জনার স্বামী সুকমল থাকে দিল্লীতে, একটি ফিরিঙ্গি নার্স মেয়ে এখন তার ঘরোয়া জীবনের বেআইনী সঙ্গিনী।' অর্চনার অবস্থাও তথৈবচ। 'মাতাল মিল ম্যানেজার প্রভাতের হাতের চাবুকের মারের দাগ কপালে নিয়ে অর্চনা বেঁচেই আছে'। স্বাভাবিকভাবেই গগনবাবু নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ছোট মেয়ে শুক্তির সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়েছেন, শুক্তির মণিমাসি আর বড়োপিসির ওপর।

কলকতার বড়োপিসি শক্তির পাত্র হিসেবে পছন্দ করেন ডাক্তার শ্যামলকে, আর তেজপুরের মণিমাসির পাত্র হিসেবে পছন্দ ইঞ্জিনীয়ার অনিমেষকে। কিন্তু শুক্তি আনমনে কখন যেন ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ারকে বাদ দিয়ে কদমবাড়ি-চা-বাগানের ডাক্তার কুমুদবাবুর নিষ্কর্মা ভাইপো সুজিতকে ভালোবেসে ফেলেছে। শুক্তি উদ্যোগ নিয়ে মেজর প্রণবকাকাকে বলে সুজিতকে একটা হাবিলদারের কাজও জোগাড় করে দিয়েছে। শুক্তি, কাকার সঙ্গে গিয়েছে মাছ ধরার সঙ্গিনী হিসেবে, সুন্দরী পাহাড়ী নদী জিয়া ভরলির তীরে। সেখানে ভালোলাগার এক মুহূর্তে সুজিতকে ভালবেসে ফেলে সমস্ত সামাজিক আভিজাত্যকে দূরে সরিয়ে রেখে। — 'যেন হঠাৎ বিহ্বল এক খুসির গুঞ্জন। আপনমনের একলা ভাষার মতো গুণগুণ করে কথা বলে শুক্তি। সত্যি চমৎকার। জিয়া ভরলি সত্যি জিয়া ভরলি। প্রাণ ভরে গেল'।

অনাস্বাদিত ভালবাসার জোয়ারে ভরা প্রাণ সুক্তির অন্তর চীনা আক্রমণকে কেন্দ্র করে অশান্ত হয়ে উঠল। সুজিত যুদ্ধে যায়। এক একটি ভারতীয় ঘাঁটির পতন হয়, আর সীমান্তবর্তী মানুষ ছুটে পালায় নিরাপদ আশ্রয়ে। 'সামরিক অসামরিক প্রতিরক্ষাব্যবস্থার শূন্যগর্ভ আস্ফালন বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যাচ্ছে আর সারাদেশ জুড়ে সঞ্চারিত হচ্ছে উত্তেজনা, ত্রাস আর ক্ষোভ।' শুক্তির মন হাবিলদার সুজিতের জন্য

আশঙ্কায় ভরে ওঠে।

চীনের একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষনায় যুদ্ধ থামে। সুজিতের সুস্থ থাকার সংবাদও আসে। এই সংবাদে স্বস্তিলাভ করলেও শুক্তির প্রেম ভালবাসা তার প্রার্থিত বৈবাহিক সম্পর্কে পরিণতি লাভ করতে পারেনি। সুজিতের কাকীমা পিতৃমাতৃহীন পূরবীর সঙ্গে শুক্তির পরিচয় করিয়ে দেন সুজিতের ভাবীবধূ হিসেবে। বিহ্বলা শুক্তি নিজের হাতে বোনা সৈনিকদের জন্য তৈরী করা সোয়েটার সুজিতকে দেবার জন্য পূরবীর হাতে তুলে দিয়ে বলে — 'ছুটির সময় দু'জনে মিলে একবার বেড়াতে বের হয়ে জিয়া ভরলি নদীটি দেখে এসো। কী চমৎকার সেই জিয়া ভরলি, দেখলে প্রাণ ভরে যাবে।'

কাহিনীটির মূলভাব অক্ষুন্ন রেখে, লেখক এই গল্পে ছোট ছোট বেশ কয়টি চরিত্র এবং পার্শ্বকাহিনীর সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন, যেই চরিত্র ও ঘটনাগুলো মূল কাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত না হয়েও জিয়া ভরলি নদীর মতই কাহিনীটির সৌন্দর্যবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। তেজপুরের অনিমেষ, তার দিদি অঞ্জলী, বিচারকপুত্র শিশির, এক নেফা তনয়া, অরণ্যবাসী দুলাল দত্ত, মেজর প্রণব বসু ও তার স্ত্রী চরিত্রগুলোই তার প্রমাণ।

বাসরদত্তাতেও বড়োগল্পের লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একদিকে সনাতন ভারতবর্ষের ঐতিহ্য অন্যদিকে বিংশ শতাব্দীর বস্তুকেন্দ্রিক, অহঙ্কারসর্বস্ব অতিআধুনিকতার দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বে অকৃত্রিম ভারতীয়তায় উদ্বুদ্ধ সুবোধ ঘোষ, জিতিয়ে দিয়েছেন সনাতন ভারতবর্ষ এবং ঐতিহ্যবান ভারতবাসীকে। ভারতীয় সভ্যতা তার বিভেদ বৈচিত্র্যের সৌন্দর্যে, নিজ ঐতিহ্যকে অক্ষুন্ন রেখে এগিয়ে গেছে অনন্ত ভবিষ্যতের পথে, অন্যদিকে ভোগসর্বস্ব অতিআধুনিকতা প্রতিপন্ন করেছে তার ক্ষণভঙ্গুরতা।

দেউলবাড়ির ভুবন মজুমদারের ছেলে অজিত, বেহালার সেনবাড়ির মেয়ে বীথি এবং মিত্রানিবাসের হরিনাথ মিত্রের ছেলে সুশান্তর প্রেম, বিবাহ, পুনর্বিবাহ এবং মৃত্যুর ঘটনাগুলোর মধ্য দিয়ে কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে। বীথি সুশান্তকে ভালবেসেও ভুবনবাবুর ছেলে অজিতকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে। দেউলবাড়ির অখন্ড নিস্তব্ধতায় ভুবনবাবু আত্মমগ্ন, অন্যদিকে বীথি দেউলবাড়ির প্রতিটি আনাচে-কানাচে ঐতিহ্যের মহিমা শুনতে শুনতে ক্লান্ত। এ অবস্থায় হঠাৎই মৃত্যু হয় অজিতের। অজিতের মৃত্যু বীথিকে মুক্তি দেয়। বীথি ফিরে পায় সুশান্তকে, দেউলবাড়ি ছেড়ে মিত্রানিবাসে গিয়ে ওঠে। হরিনাথ ঘটনাটিকে এক পরম বিজয় জ্ঞান করে উল্লসিত হয়, তার অহংকারী প্রাণও উদ্দাম হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই মিত্রানিবাসের যান্ত্রিক আধুনিকতায় শান্তি পায় না বীথি। মিত্রানিবাসে সুখ আছে শান্তি নেই। ভোগের উপকরণ আছে কিন্তু ভোগের তৃপ্তি নেই। দ্রুত পট পরিবর্তণ ঘটে। বীথি মিত্রানিবাসের প্রাণহীন যান্ত্রিকতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে জীবনকে খুঁজতে ফিরে এসেছে দেউলবাড়িতে।

> ইউরোপীয় আধুনিকতার অভিশাপ শ্যালট-বন্দিনীকে মৃত্যুর করালগ্রাসে নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু ভারতীয় প্রাণধর্মের অবিনাশী আত্মবিশ্বাস তাকে মরতে দেয়নি, সুশান্তর মাধ্যমেই সার্থক করে তুলেছে দেউলবাড়ির জ্যোৎস্নাবিধৌত প্রণয়স্নিগ্ধতায়।[১৮৪]

হরিনাথ মিত্রের ভোগবাদী আধুনিকতা, ভুবন মজুমদারের সনাতন ভারতের ঐতিহ্যের কাছে পরাজয় বরণ করেছে। জয়ী হয়েছে ভারতআত্মা।

নির্দেশিকা

১।	সুবোধ ঘোষ	—	রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ সুবোধ ঘোষ:প্রবন্ধাবলী-সম্পাদনা নিতাই বসু	পৃ: ৪৬৬
২।	তদেব	—		পৃ: ৪২৫-২৬
৩।	সুবোধ ঘোষ	—	সাহিত্য হিত (প্রবন্ধ) সাহিত্য সাময়িকী (বাংলাদেশ) সম্পাদনা-শিরিন সুলতানা ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৮৮	
৪।	তদেব	—		
৫।	তদেব	—		
৬।	শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	—	বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা	
৭।	ভূদেব চৌধুরী	—	বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার	পৃ: ১৩৪
৮।	ভূদেব চৌধুরী	—	বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার	পৃ: ৮৪
৯।	প্রমথনাথ বিশী	—	রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প	পৃ: ৫১
১০।	প্রমথনাথ বিশী	—	রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প	পৃ: ৫২
১১।	ভূদেব চৌধুরী	—	বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার	পৃ: ৮৭
১২।	তদেব	—		পৃ: ১২১
১৪।	প্রমথনাথ বিশী	—	রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প	পৃ: ৬০
১৫।	ভূদেব চৌধুরী	—	বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার	পৃ: ১৩০
১৬।	গোপিকানাথ রায়চৌধুরী	—	দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য	পৃ: ১০১
১৭।	অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	—	কালের পুত্তলিকা	পৃ: ১৭৬
১৮।	গোপিকানাথ রায়চৌধুরী	—	দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য	পৃ: ১১৪
১৯।	গোপিকানাথ রায়চৌধুরী	—	দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য	পৃ: ১১৫
২০।	অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	—	কালের পুত্তলিকা	পৃ: ১৭৭
২১।	গোপিকানাথ রায়চৌধুরী	—	রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক	পৃ: ১৮৩
২২।	ভবানী ভট্টাচার্য	—	কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী কর্তৃক উদ্ধৃত	পৃ: ১৯৮
২৩।	বুদ্ধদেবব বসু	—	রবীন্দ্রনাথ কথাসাহিত্য	
২৪।	সজনীকান্ত দাস	—	আত্মস্মৃতি (প্রথম খন্ড) (রবীন্দ্রনাথ ও কথাসাহিত্য, গোপিকানাথ রায়চৌধুরী	পৃ: ২০৬
২৫।	গোপিকানাথ রায়চৌধুরী	—	দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য	পৃ:২২৭-২৩১
২৬।	গোপিকানাথ রায়চৌধুরী	—	দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য (উক্তি-প্রমথনাথ বিশী)	পৃ: ২৩১
২৭।	অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	—	কালের পুত্তলিকা	পৃ: ১৯০
২৮।	গোপিকানাথ রায়চৌধুরী	—	দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য	পৃ: ৩২১
২৯।	বুদ্ধদেব বসু	—	An acre of green grass	
৩০।	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	—	কল্লোল যুগ	
৩১।	গোপিকানাথ রায়চৌধুরী	—	দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য	পৃ: ৩৩১
৩২।	উজ্জ্বলকুমার মজুমদার	—	ছোট গল্প-চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-ভরা থাক সুবোধ ঘোষ স্মৃতিকথণ	পৃ: ২৬-২৭

৩৩। সুমিতা চক্রবর্তী — সুবোধ ঘোষের গল্প সমগ্রর রিভিউ (দেশ) ২৫।২।১৯৯৫
৩৪। অরিন্দম গোস্বামী — সুবোধ ঘোষ কথাসাহিত্য পৃঃ ৬২
৩৫। সুবোধ ঘোষ — সুবোধ ঘোষ প্রবন্ধাবলী সম্পাদনা-নিতাই বসু পৃঃ ৭৮-৭৯
৩৬। সুবোধ ঘোষ — অযান্ত্রিক (ভরা থাক) পৃঃ ২
৩৭। তদেব — পৃঃ ২
৩৮। তদেব — পৃঃ ৩
৩৯। তদেব — পৃঃ ৩
৪০। তদেব — পৃঃ ৪
৪১। সমরেশ মজুমদার — ভরা থাক (আমার পূর্বসূরী) পৃঃ ১০২-১০৩
৪২। সুবোধ ঘোষ — অযান্ত্রিক (ভরা থাক) পৃঃ ১
৪৩। তদেব — পৃঃ ৩
৪৪। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার — ভরা থাক (ছোটগল্প:চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য) পৃঃ ২৭
৪৫। জগদীশ ভট্টাচার্য্য — ভরা থাক (রাগ-রাগিণীর মহাদেশ) পৃঃ ৪০
৪৬। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় — ভরা থাক (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধ ঘোষ) পৃঃ ১১
৪৭। সুবোধ ঘোষ — সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (প্রথম খন্ড) পৃঃ ৩৭৬
৪৮। তদেব — পৃঃ ৩৩৯
৪৯। তদেব — পৃঃ ১১৮
৫০। তদেব — পৃঃ ২২৪
৫১। তদেব — পৃঃ ২২৮
৫২। হুমায়ুন কবির — ভরা থাক (রূপদক্ষ শিল্পী) পৃঃ ১২৬
৫৩। সুবোধ ঘোষ — সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (প্রথম খন্ড) পৃঃ ২৩২-২৩৩
৫৪। তদেব — পৃঃ ২৩২
৫৫। তদেব — পৃঃ ২৩১
৫৬। সুবোধ ঘোষ — সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (প্রথম খন্ড) পৃঃ ২৩১
৫৭। তদেব — পৃঃ ২৩৯
৫৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — শেষের কবিতা পৃঃ ১৮০
৫৯। সুবোধ ঘোষ — সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (চতুর্থ খন্ড) পৃঃ ২৮৭
৬০। তদেব — পৃঃ ২৮৭
৬১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় — ভরা থাক (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধ ঘোষ) পৃঃ ১১
৬২। সুবোধ ঘোষ — সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (তৃতীয় খন্ড) পৃঃ ৬৮
৬৩। তদেব — পৃঃ ৬৮
৬৪। তদেব — পৃঃ ৭১
৬৫। তদেব — পৃঃ ৭৫
৬৬। তদেব — পৃঃ ৫৭
৬৭। সুবোধ ঘোষ — সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ (প্রথম খন্ড) পৃঃ ৩৩২
৬৮। তদেব — পৃঃ ১২১
৬৯। তদেব — পৃঃ ১২২
৭০। তদেব — পৃঃ ১২৩
৭১। তদেব — পৃঃ ১২৭
৭২। তদেব — পৃঃ ৬৫
৭৩। তদেব — পৃঃ ৫৫

৭৪। তদেব — পৃঃ ৫৬
৭৫। তদেব — পৃঃ ৬৫
৭৬। তদেব — পৃঃ ৪৯
৭৭। তদেব — পৃঃ ১৫৭
৭৮। তদেব — পৃঃ ১৬৩
৭৯। তদেব — পৃঃ ১৭৩
৮০। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় — ভরা থাক (ফসিল একটি রত্ন) পৃঃ ১২৫
৮১। জগদীশ ভট্টাচার্য্য — ভরা থাক (রাগ-রাগিণীর মহাদেশ) পৃঃ ৪১
৮২। তদেব — পৃঃ ৪১
৮৩। অলোক রায় — প্রবন্ধঃ গোত্রান্তর গল্পকার সুবোধ ঘোষ
বিভাব (সংখ্যা-৩৪), জুলাই সেপ্টেম্বর ১৯৮৬
৮৪। নিতাই বসু — সুবোধ ঘোষ প্রবন্ধাবলী (ভূমিকা) পৃঃ ১০
৮৫। জগদীশ ভট্টাচার্য্য — ভরা থাক (রাগ-রাগিণীর মহাদেশ) পৃঃ ৪১
৮৬। সুবোধ ঘোষ — ঘোষের গল্প সংগ্রহ (দ্বিতীয় খন্ড) পৃঃ ২৫
৮৭। তদেব — পৃঃ ২৭
৮৮। তদেব — পৃঃ ৩৬
৮৯। তদেব — পৃঃ ৩৬
৯০। সৌমেন্দ্রনাথ সরকার — ভরা থাক (বিতর্কিত সাহিত্যিক) পৃঃ ১১৩
৯১। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার — ভরা থাক (ছোটগল্প চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য) পৃঃ ২৭
৯২। সুবোধ ঘোষ — ঘোষের গল্প সংগ্রহ (তৃতীয় খন্ড) পৃঃ ১২
৯৩। তদেব — পৃঃ ১৩
৯৪। তদেব — পৃঃ ১৪
৯৫। তদেব — পৃঃ ১৬
৯৬। জগদীশ ভট্টাচার্য্য — ভরা থাক (রাগ-রাগিণীর মহাদেশ) পৃঃ ৪৫
৯৭। সুবোধ ঘোষ — ঘোষের গল্প সংগ্রহ (তৃতীয় খন্ড) পৃঃ ১৬৭
৯৮। তদেব — পৃঃ ১৭৪
৯৯। তদেব — পৃঃ ১৭৪
১০০। তদেব — পৃঃ ১৭৫
১০১। তদেব — পৃঃ ১৭৫
১০২। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — ভরা থাক (সৃষ্টির মৌলিকতা, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী) পৃঃ ৯১
১০৩। অলোক রায় — প্রবন্ধ : গোত্রান্তরের গল্পকার সুবোধ ঘোষ-বিভাব
(সংখ্যা-৩৪), জুলাই-সেপ্টেম্বর - ১৯৮৬
১০৪। সুবোধ ঘোষ — ঘোষের গল্প সংগ্রহ (তৃতীয় খন্ড) পৃঃ ১৩৭
১০৫। তদেব — পৃঃ ১৩৮
১০৬। তদেব — পৃঃ ১৪১
১০৭। তদেব — পৃঃ ১৪৩
১০৮। তদেব — পৃঃ ১৪২
১০৯। তদেব — পৃঃ ১৪৪
১১০। তদেব — পৃঃ ১৪৫
১১১। তদেব — পৃঃ ১৪৬
১১২। তদেব — পৃঃ ১৪৭

১১৩।	অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	—	ভরা থাক (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধ ঘোষ)	পৃ:	৮
১১৪।	জগদীশ ভট্টাচার্য্য	—	ভরা থাক (রাগ-রাগিণীর মহাদেশ)	পৃ:	৪৩
১১৫।	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	—	মানিক গ্রন্থাবলী (ষষ্ঠ খন্ড)	পৃ:	৪৪৭
১১৬।	তদেব	—		পৃ:	৪৫০
১১৭।	তদেব	—		পৃ:	৪৫০
১১৮।	তদেব	—		পৃ:	৩৮৪-৮৫
১১৯।	তদেব	—		পৃ:	৩৮৫
১২০।	তদেব	—		পৃ:	৩৮৬
১২১।	তদেব	—		পৃ:	৩৮৭
১২২।	সুবোধ ঘোষ	—	ঘোষের গল্প সংগ্রহ (তৃতীয় খন্ড)	পৃ:	২৩২
১২৩।	তদেব	—		পৃ:	২৩৩
১২৪।	তদেব	—		পৃ:	২৩৭
১২৫।	তদেব	—		পৃ:	২৩৮
১২৬।	জগদীশ ভট্টাচার্য্য	—	ভরা থাক (রাগ-রাগিণীর মহাদেশ)	পৃ:	৪২
১২৭।	সুবোধ ঘোষ	—	ঘোষের গল্প সংগ্রহ (প্রথম খন্ড)	পৃ:	৮৫
১২৮।	তদেব	—		পৃ:	৮৫
১২৯।	জগদীশ ভট্টাচার্য্য	—	ভরা থাক (রাগ-রাগিনীর মহাদেশ)	পৃ:	৪২
১৩০।	সুবোধ ঘোষ	—	ঘোষের গল্প সংগ্রহ (তৃতীয় খন্ড)	পৃ:	২৪০
১৩১।	তদেব	—		পৃ:	২৪৭
১৩২।	তদেব	—		পৃ:	২৫৩
১৩৩।	তদেব	—		পৃ:	২৫৬
১৩৪।	সুবোধ ঘোষ	—	ঘোষের গল্প সংগ্রহ (প্রথম অধ্যায়)	পৃ:	৩০৯
১৩৫।	তদেব	—		পৃ:	৩১১
১৩৬।	তদেব	—		পৃ:	৩১১
১৩৭।	তদেব	—		পৃ:	৩১২
১৩৮।	তদেব	—		পৃ:	৩১২
১৩৯।	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	—	ভরা থাক (সুবোধ ঘোষ, সুবোধদা)	পৃ:	৫৩
১৪০।	জগদীশ ভট্টাচার্য্য	—	ভরা থাক (রাগ-রাগিণীর মহাদেশ)	পৃ:	৪৩
১৪১।	সুবোধ ঘোষ	—	ঘোষের গল্প সংগ্রহ (তৃতীয় খন্ড)	পৃ:	১৯২-১৯৩
১৪২।	তদেব	—		পৃ:	১৯৫
১৪৩।	সুবোধ ঘোষ	—	অকাজের কাজ (প্রবন্ধ) সুবোধ ঘোষ প্রবন্ধাবলী সম্পাদনা নিতাই বসু	পৃ:	১৯৫
১৪৪।	সুবোধ ঘোষ	—	ঘোষের গল্প সংগ্রহ (পঞ্চম খন্ড)	পৃ:	১৫
১৪৫।	সুবোধ ঘোষ	—	ঘোষের গল্প সংগ্রহ (প্রথম খন্ড)	পৃ:	৩৫৩
১৪৬।	তদেব	—		পৃ:	৩৬৪
১৪৭।	তদেব	—		পৃ:	৩৬৫
১৪৮।	সুবোধ ঘোষ	—	সুবোধ ঘোষ প্রবন্ধাবলী-সম্পাদনা (নিতাই) - প্রবন্ধ সমন্বয়ের ভাবভূমি	পৃ:	৩৮১-৩৮২
১৪৯।	তদেব	—	প্রবন্ধ-এ যুগের ভারতবর্ষ	পৃ:	৩৫৬
১৫০।	তদেব	—	প্রবন্ধ-ভারতীয় ফৌজের রূপান্তর	পৃ:	৩৩৬
১৫১।	সুবোধ ঘোষ	—	ঘোষের গল্প সংগ্রহ (পঞ্চম খন্ড)	পৃ:	৩৭৮

১৫২। সুবোধ ঘোষ — ঘোষের গল্প সংগ্রহ (তৃতীয় খন্ড) পৃ: ৩১৫-৩১৬
১৫৩। তদেব — পৃ: ৩১৬
১৫৪। সুবোধ ঘোষ — ঘোষের গল্প সংগ্রহ (চতুর্থ খন্ড) পৃ: ২৯৮
১৫৫। অশোক রায় — ভরা থাক (হিউম্যানিস্ট কথাশিল্পী) পৃ: ১৫
১৫৬। জগদীশ ভট্টাচার্য্য — ভরা থাক (রাগ-রাগিনীর মহাদেশ) পৃ: ৪৪
১৫৭। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — ভরা থাক (সৃষ্টির মৌলিকতা, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী) পৃ: ৮৯
১৫৮। সুবোধ ঘোষ — ঘোষের গল্প সংগ্রহ (তৃতীয় খন্ড) পৃ: ২০৭
১৫৯। তদেব — পৃ: ২০৭
১৬০। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — ভরা থকা (সৃষ্টির ভৌলিকতা, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী) পৃ: ৯০
১৬১। মানিক বন্দোপাধ্যায় — মানিক গ্রন্থাবলী (ষষ্ঠ খন্ড) পৃ: ৩৭১
১৬২। সুবোধ ঘোষ — সুবোধ ঘোষের গল্প সংগ্রহ
১৬৩। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় — মানিক গ্রন্থাবলী (ষষ্ঠ খন্ড) পৃ: ৩৭৮
১৬৪। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় — ভরা থাক (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধ ঘোষ) পৃ: ৬
১৬৫। সুবোধ ঘোষ — ভারত প্রেমকথা (মুখবন্ধ) নতুন করে পাব বলে
১৬৬। তদেব —
১৬৭। সুবোধ ঘোষ — ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো (সেদিনের আলোছায়া) পৃ: ১৬
১৬৮। সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলক) — পৌরানিক অভিধান পৃ: ৫৫২
১৬৯। তদেব — পৃ: ৬৩
১৭০। সুবোধ ঘোষ — ভারত প্রেমকথা পৃ: ১৬৩
১৭১। তদেব — পৃ: ২৯৫
১৭২। প্রমথনাথ বিশী — ভরা থাক (ভাষার মৃদঙ্গ) পৃ: ৫৯
১৭৩। তদেব — পৃ: ৬০-৬১
১৭৪। সুবোধ ঘোষ — ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো (সেদিনের আলোছায়া) পৃ: ১৭
১৭৫। তদেব — পৃ: ২২
১৭৬। লতিকা সাহা — ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো, 'এই রচনা প্রসঙ্গে' (মুখবন্ধ)
১৭৭। সুবোধ ঘোষ — ঝিনুক কুড়িয়ে মুক্তো – পশু:প্রকৃতি:প্রেম পৃ: ৯১
১৭৮। তদেব — পৃ: ১০০
১৭৯। তদেব — পৃ: ১৭৯-৮০
১৮০। তদেব — পৃ: ১৪৪-৪৫
১৮১। তদেব — পৃ: ১৫৩
১৮২। তদেব — পৃ: ১৯৮
১৮৩। সৌমেন্দ্রনাথ সরকার — সাহিত্য সংস্কৃতি
শ্রাবণ–আশ্বিন সংখ্যা ১৩৭৭বং পৃ: ১৯৩
১৮৪। তদেব — পৃ: ১৯৪